এই মায়া

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৫২

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স এবং প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসসি অফসেট ৩০/২ হরমোহন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৭০০০৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

উ ৎ স র্গ

পূজনীয় বড়মামা
শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বাগচীকে

সূচীপত্র

এই মায়া

টান

বাজার হাতে থমকে দাঁড়ালেন সুখময়। তাঁর সযত্নে সাজানো একতলার ড্রয়িংরুমে উদ্দাম লাফালাফি করছে দুই শিশু। জুতো পায়ে দামী সোফায় উঠছে, ঝাঁপ কাটছে নকশাদার গালিচায়। তকতকে মোজাইক মেঝেতে এলোমেলো ছড়ানো গোটা দু-তিন কিটসব্যাগ, প্লাস্টিকের থলি, সস্তাদামের ওয়াটার-বটল।

সুখময়ের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল।—তুই কোত্থেকে?

—এই এলাম। সুখময়ের প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিল না অমল। দাঁত ছড়িয়ে হাসল।—ধরো তোমাদের দেখতে। বুড়োবুড়ি একলাটি পড়ে আছ।

সুখময় একটুও প্রীত হলেন না। বাইরে থেকেই এখানকার কলরব কানে বাজছিল। কলরব নয়, যাকে বলে তাণ্ডব। তাঁর তপোবনের মতো প্রশান্ত গৃহ আর্তনাদ করছে শিশুদের হুড়দ্দুমে। তখনও কি ছাই বুঝেছেন, তাঁর অকালকুষ্মাণ্ড ভাগ্নেটিই এসে হাজির হয়েছে সাতসকালে। সেই সিউড়ি থেকে—লটবহর সমেত।

হাতের বাজার রান্নাঘরে নামিয়ে এলেন সুখময়। দুরন্ত শিশু দুটি একটু থমকাল। হাঁ করে দেখছে সুখময়কে। বড়টা বছর পাঁচেকের। ছোটটা বড় জোর তিন।

এক ঝলক ছেলে দুটোকে জরিপ করে সুখময় পাখার নীচে বসলেন, —খবর কি তোদের? মেজদি কেমন আছে? জামাইবাবু?

—মা-বাবা এই বয়সে যেমন থাকে, তেমনই আছে। গেঁটে বাত। অর্শ। বুক-ধড়ফড়। প্রেসার। সুগার। অমল বাবু হয়ে সোফায় বসল,—মামীও তো দেখলাম বেশ কাত হয়ে পড়েছে।

-হুঁ। সুখময় গম্ভীর,—কদিন ধরে শ্বাসকষ্ট চলছে। কাল একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল।

একটু নয়, কাল রাতে বেশ ভালই বাড়াবাড়ি হয়েছিল অনুরূপার। বরাবরই তার সর্দিকাশির ধাত, বছর আষ্টেক হল একটি বিশ্রী টানও উঠছে—হাঁপানির। প্রথম প্রথম টানটা শুধু ঋতু বদলের সময়ে আসত। এখন আর মাস-ঋতু মানে না, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত যখন-তখন হানা দেয়।

কালও কষ্ট দিয়েছিল। সন্ধে থেকে অল্পস্বল্প রুটিনমাফিক চাপ ছিল ফুসফুসে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুম করে বেড়ে গেল কষ্টটা। দু-চারটে বাঁধা ওষুধ ঘরেই থাকে, তাতেও কমল না। রাত বারোটায় ফোন করতে হল ডাক্তারকে। চেনা ডাক্তার, প্রায়ই দেখে অনুরূপাকে, তবু অত রাতে আসতে রাজী হল না সে। টেলিফোনে ওষুধের নাম আউড়েই খালাস। কাছেই সিএ মার্কেট, সেখানে শঙ্কর মেডিকেল সারারাত খোলা থাকে, রাতদুপুরে দোকানে ছুটলেন সুখময়। ক্যাপসুলটা খেয়েও রাতভর বিছানায় ঠায় বসে রইল অনুরূপা। বালিশ বুকে চেপে হাপরের মত হাঁপাচ্ছেন। গলা কাঁপিয়ে উৎকট শব্দ ছিটকে আসছে। দম বুঝি বেরিয়ে যায়-যায়!

আর সুখময়? একবার তখন বালিশ দিচ্ছেন স্ত্রীর পিঠে, একবার মুখে ফস্‌ফস ওষুধ স্প্রে দিচ্ছেন আর উদ্বিগ্নমুখে তাকিয়ে আছেন। কীভাবে যে কেটেছে রাতটা!

সুখময় বললেন,—তোর মামীকে নিয়ে চিন্তায় আছি।

অমল দুলছে বসে বসে,—আমরা এসে তোমাদের অসুবিধে হল তো?

সুখময় বলতে যাচ্ছিলেন, তা হল। বললেন না। তেতো গেলা মুখে হাসলেন, —অসুবিধে আর কি। মামার বাড়ি, এখানে আসবি না তো কোথায় আসবি?

—কারেক্ট। আমি তো মঞ্জুকে সে কথাই বলছিলাম। মঞ্জু মামীকে দেখে একেবারে ঘাবড়ে একসা।

—মঞ্জু, মানে তোর বউ? কোথায় সে?

—মামীর ঘরে। এসে ইস্তক ওপরে সেঁটে আছে। বলেই অমল হাঁক পাড়ল, — মঞ্জু-উ-উ, মঞ্জু-উ-উ, নীচে এসো। মামাকে প্রণাম করে যাও। ডাকতে ডাকতে ঝপ করে গলা নামাল,—আসলে তোমার ভাগ্নেবউ মামীকে দেখে যত না ঘাবড়েছে, তার থেকে বেশি ব্যোমকেছে তোমার এই বাড়ি দেখে। আরে বাবা, মামা আমার লর্ড। সল্টলেকে প্যালেসে থাকে। বুঝলে মামা, মঞ্জু ভাবে আমার সব আত্মীয়ই বুঝি তার শ্বশুর-শাশুড়ির মতো নেই-নেই পার্টি। এবার দ্যাখ নিজের চোখে। এমন ঝিকঝ্যাক বাড়ি, এমন চাম্পুস সাজানো-গোছানো। বাপের জন্মে দেখেছিস কোনদিন? ছিলি তো ন্যাংটো মাস্টারের মেয়ে।

দুই শিশু বাবার বকবক গিলছিল, হঠাৎ বডটা হাততালি দিয়ে উঠল,—দাঁড়াও, মাকে বলে দেব!

অমল খিকখিক হাসল,—কি বলবি?

—তুমি দাদুকে ন্যাংটো বলেছ!

—বলিস। নেচে নেচে বলিস। যা ভাগ এখান থেকে। পাঁচ বছরেই পেকে বোঁদে হয়ে গেছে। খালি বড়দের কথার মধ্যে কথা। মারব টেনে তিন লাথ।

ধমক খেয়ে ছেলেটা গা মোচড়াচ্ছে।

সুখময় বেশ বিরক্ত হলেন। অমলটা চিরকালই বড় অমার্জিত। জংলি। হ্যা-হ্যা করে হাসে। গাঁক গাঁক চেঁচায়। মুখের মাত্রা নেই। লেখাপড়াতেও অগা। কোনক্রমে ঘষ্টে ঘষ্টে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে সরস্বতীকে বিদায় দিয়েছে। মেজদির কম জ্বালা গেছে এই ছেলে নিয়ে। এখন কোন এক কোল্ডস্টোরেজে চাকরি করছে। কি কাজ যে করে, ভগবান জানে। শুধু মেজদির চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় রোজগারপাতি তেমন ভাল নয়। তার মধ্যেও কী দুঃসাহস! বাবু বিয়ে করে ফেলেছেন! প্রেমের বিয়ে। বোঝার ওপর শাকের আঁটি ছ'বছরেই তিন-তিনটে অ্যাণ্ডাবাচ্চা। একটা তো একেবারেই কোলের। সবে পুজোর সময় হয়েছে। মেজদির বিজয়ার চিঠি থেকে জেনেছে সুখময়।

ড্রয়িংরুম থেকে কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সেই সিঁড়ি দিয়ে নামছে অমলের বউ। আড়ষ্ট পায়ে। কাছে এসে খোঁপায় আঁচল তুলল। টিপ করে প্রণাম সারল একটা।

সুখময় মেয়েটিকে আগে দেখেননি। অমল ন'মাসে ছ'মাসে আসে এ বাড়িতে। একাই আসে। এক-আধ বেলা থেকে চলে যায়। সুখময় নিজে কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যান না। যাওয়া পছন্দও করেন না। বিয়ে অন্নপ্রাশনেও নয়। কোথাওই সম্পর্ক

রাখেন না বেশি। মাঝেমধ্যে টুকটাক চিঠিপত্র, ব্যস।

সম্পর্ক রাখার অর্থ জানেন সুখময়। দায়—অজস্র দায়। এর মেয়ের বিয়েতে দাঁড়াও, ওর ছেলের চাকরি করে দাও। একে খয়রাতি কবো, ওকে ধার দাও। কেন রে বাবা? লিলিপুটদের বংশে তালগাছ হওয়াটা কি অপরাধ? তাছাড়া আত্মীয়স্বজন মানেই কূটকচালি, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি। এসব সুখময়ের ঘোরতর অপছন্দ।

তা মঞ্জুকে অবশ্য প্রথম দর্শনে মন্দ লাগল না সুখময়ের। শান্ত চেহারা, বিনীত হাবভাব। রঙ চাপা হলেও আলগা একটা শ্রী আছে। তবে রোগা বড্ড। ডিগডিগে, ক্ষয়াটে। কোলের কন্যাসন্তানটিও খুবই শীর্ণ। অপুষ্টির শিকার।

মঞ্জু নতমুখেই বলল,—আপনাকে মামীমা একবার ওপরে ডাকছেন।

সুখময় গলা ঝাড়লেন,—তোমার মামীমা কি শুয়েছেন একটু, না এখনও বসে?

মঞ্জু একদিকে ঘাড় নাড়ল। উত্তরটা ঠিক ধরতে পারলেন না সুখময়। সিঁড়ি অবধি গিয়েও ঘুরলেন মঞ্জুর দিকে,—তোমার বাচ্চারা কিছু খেয়েছে?

অমলই আগবাড়িয়ে উত্তর দিল,—তুমি ভেবো না মামা, ওরা ঠিক খেয়ে নেবে।

—তোরাও তো এতটা পথ এলি... তোদেরও খিদে পেয়েছে... দ্যাখ না, পুষ্পর জলখাবার তৈরি কত দূর এগোল?

হা হা কবে হাসল অমল,—আমাদের পেট হল বাবণের চিতা। সারাদিন জ্বলছে। ও নিয়ে ভাবতে গেলে তোমার ভাঁড়ার ফাঁক হয়ে যাবে। তুমি যাও, মামী কি বলছে দ্যাখো।

মঞ্জুর দিকে চোখ চলে গেল সুখময়ের। স্বামীর বসিকতায় মুখে আঁচল চেপে ফিক ফিক হাসছে।

ঘড়িতে সাড়ে নটা। চৈত্রের সকাল তেতে উঠছে ক্রমশ। এলোমেলো বাতাস তপ্ত। আচম্বিতে ছোট ছোট হাওয়ার ঘূর্ণি বাইরে। দক্ষিণের জানলার ঠিক গায়েই একটা বেঁটে নারকেল গাছ। চোদ্দ বছর বয়সের। গৃহপ্রবেশের দিন গাছটা লাগিয়েছিলেন অনুরূপা। সেই গাছের চওড়া পাতায় শেষ বসন্তের হাওয়া বাজছিল সরসর।

হাওয়া কি অতীতের কথা বলে? হয়ত বলে, হয়ত বলে না, হয়ত নিজের মনেই দোল খায় জানলায়—গাছে, সুখময়ের মনে।

পঁচিশ বছর আগে সুখময় এখানে চার কাঠার প্লটটা কিনেছিলেন। তখন এ অঞ্চলে গাছগাছড়া বিশেষ ছিল না। প্রায় ধূ ধূ। বিশাল বিশাল মেছো ভেড়ি বোজানো হয়ে সবে তখন শহর এদিকে গায়ে-গতরে বাড়ছে। মাটিতে চিকচিক করে বালি। লোকবসতি খুব কম। কলকাতার সঙ্গে সুতোর যোগ রাখে একটা দুটো বাস। এত ফাঁকা চারদিক যে লোকজন সহজে বাড়িঘর বানাতে সাহস পায় না।

সেটা অবশ্য শাপে বরই হয়েছিল। এখনকার হিসেবে জলের দরে জুটে গিয়েছিল জমিটা। তবে সুখময়ও তক্ষুণি বাড়ি করেননি। করলেন অনেক পরে। সাউথ ইস্টার্ণ রেলের জেনারেল ম্যানেজার হয়ে রিটায়ার করার ছ'বছর আগে—রামপুরহাটের জমি-বাড়ির নিজের অংশ বেচে দিয়ে। এই উপনগরী তখন অনেক জমজমাট। ছবির মতো

সুন্দর সুন্দর বাড়িতে ভরে যাচ্ছে চারদিক। চওড়া চওড়া পথঘাট। সবুজ বুলেভার্ড। গাড়ি-ঘোড়াও চলছে অনেক। তবু এখানকার একটা আলাদা নির্জনতা আছে। এক ধরনের আলাদা শান্তি। নিস্তরঙ্গ সুখ।

সেই সুখের আদলে তৈরি হল সুখময়ের বাড়ি। একতলায় অতিকায় ড্রয়িংরুম—রান্নাঘর। ভাঁড়ার, কাজের লোকেদের থাকার ঘর। বিশাল খাওয়াব জায়গা। ছোট্ট একটা স্টাডিরুম কাম পারিবারিক লাইব্রেরি। ওপরে তিনটে পৃথক পৃথক ব্লক। প্রতিটি ব্লক এক-একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ওয়ান-রুম ফ্ল্যাট—সুখময়দের, বাবিনের, ছোট্টুব, এছাড়া মনভোলানো এক পূর্ব-দক্ষিণ-খোলা বাবান্দা।

বাড়ির নাম হল স্বপ্নাতীত।

বাড়ি দেখে খুশিতে পাগল হলেন অনুরূপা। দুই ছেলেও। বাবিন তখন আই আই টিতে ইঞ্জিনিয়াবিং পড়ছে। ছোট্টুর ক্লাস নাইন। বিপুল উৎসাহে দুই ভাই ছুটে ছুটে এখান ওখান থেকে ফুলগাছ এনে লাগাচ্ছে। অনুরূপা সামনেব লনটার পরিচর্যা কবছেন সারাদিন। বাবির আব ছোট্টুব ঘর পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেল। বাবিনের দেওয়ালে ফিল্মস্টার। শুধুই অমিতাভ বচ্চন, বিভিন্ন ভঙ্গিতে, বিভিন্ন মেজাজে। ছোট্টুর দেওয়াল জুড়ে খেলোয়াড়দেব মিছিল—গাভাস্কার, বিশ্বনাথ, ইমবান, কপিলদেব, ম্যাকেনরো, বর্গ, ঝাঁকড়াচুলো মারিও কেম্পেস। তার সঙ্গে বাবা-মার দেওয়ালও পরিপূর্ণ। আশায়, সুখে। উষ্ণতায়। মায়াবী নিশ্চিন্ত বার্ধক্যের অলস স্বপ্নে।

বাবিনের আমেবিকায় এখন মধ্যরাত।

ছোট্টুর লণ্ডনে এখনও ভোব হয়নি।

এই উপনগবী এখন রোদ্দুবে ঝলসাচ্ছে।

—কি ভাবছ জানলায় দাঁড়িয়ে?

সুখময় ফিরলেন। খাটেব প্রান্তে এসে আধশোয়া স্ত্রীর কপালে হাত ছোঁয়ালেন,
—কিছু না।

—আমাকে ডাকোনি কেন?

—ভাবলাম ঘুমোচ্ছ, ঘুমোও।

—দূব, ঘুম কি আর আসে। অনুরূপা ক্লান্তভাবে চোখ বুজলেন।

—সকালেব ক্যাপসুলটা খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—ডাক পাঠিয়েছিলে কেন?

—বাজার থেকে কি আনলে? রোজকার সেই চারাপোনা?

—না। বাটা মাছ, কেন?

—কেন কিগো? ভাগ্নে-ভাগ্নেবউ এল, মেয়েটা আমাদের বাড়িতে এই প্রথম, ওদের শুধু বাটা মাছের ঝোল খাওয়াবে? অনুরূপা এখনও হাঁপাচ্ছেন একটু একটু,
—বাচ্চাদের জন্য মাংস আনলে হত না?

—বাচ্চারা থোড়াই খাবে। খাবে তো ওই গণ্ডারটা। হাসতে হাসতে বললেন সুখময়,
—ও ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও তো। চুপটি করে আজ সারাদিন বিশ্রাম

নাও। বিছানা থেকে একদম উঠবে না।

অনুরূপা বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসলেন,—অমলের বউটা কিন্তু বেশ হয়েছে। একটু বোকা ধরনের, কিন্তু বেশ কাজের। কথা শুনে মনে হল, মেজদি-জামাইবাবুর খুব দেখাশুনো করে।

—বোকা না হলে ওই ছেলের প্রেমে পড়ে!

—শুধু প্রেম নয় গো, অমলকে খুব ভয়-ভক্তিও করে।

—বাবাহ! আধঘণ্টা কথা বলেই তুমি অনেক কিছু বুঝে ফেলেছ দেখছি। সুখময় বাঁকা হাসলেন,—সদলবলে এখানে হঠাৎ কেন উদয় হল তা কিছু বলল?

—নিজে থেকে না বললে জিজ্ঞেস করা যায় নাকি?

সুখময় কিছু বললেন না। আলমারি খুলে কয়েকটা কাগজ বার করলেন। ইলেকট্রিক বিল, প্রেসক্রিপশন—কিছু টাকাও।

অনুরূপা ঠাট্টার ছলে বললেন,—একদিক দিয়ে ভালই হল। তোমারও ক'দিন নাতি-নাতনি নিয়ে জমিয়ে কাটবে। ও সুখ তো তোমার ভাগ্যে বড় একটা জোটে না!

বাবিন গতবছর এসেছিল। জাস্ট বড় ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল সুখময়ের। দাদুন, আমি তোমার সঙ্গে খেলব! দাদুন, আমি তোমার সঙ্গে শোব! দাদুন, আমি তোমার সঙ্গে লাঞ্চ করব—এক প্লেটে! দাদুন, চলো না আমরা ওয়াকে যাই।

সুখময় ঝট করে মুখ ফেরালেন,— বাচ্চাগুলোর চেহারা দেখেছ? কী চাষাড়ে! শ্যাবি!

—ছি, বাচ্চাদের ওরকম বলতে নেই। ওরাও তো সম্পর্কে নাতি-নাতনি, নয়?

পুষ্প ঘরে এসেছে। হাতের ট্রেতে সুখময়ের জন্য চা-টোস্ট, অনুরূপার হরলিক্স, বিস্কুট কয়েকটা। খাটের লাগোয়া টেবিলে ট্রে নামিয়ে বলল,—মা, আপনি লুচি খাবেন দু'চারটে? এনে দেব?

—ওদের দিয়েছিস?

—দেওয়ার দরকার হয়নি। নিজেরাই তার আগে হামলে পড়ে খেয়ে নিল।

চকিত অতিথি-সমাগমে পুষ্পর মুখও বেশ অপ্রসন্ন। সে এ বাড়ির রাতদিনের কাজের লোক। বহুকাল আছে। সুখময়-অনুরূপার কাছে সে এখন অন্ধের যষ্ঠি। তবু তার বাচনভঙ্গিটা এ মুহূর্তে সুখময়েরও অভব্য লাগল।

গম্ভীর মুখে বললেন,— তুই এখন একবার বাজারে যা। ওদের জন্য দুটো মুর্গি নিয়ে আয় বড় দেখে। আর আন্দাজ মতন দই মিষ্টি। বাচ্চা দুটোকে একটু দুধ দিয়েছিস?

পুষ্পর মুখ আরও ভারী,—বউটা নিজেই নিয়ে খাইয়ে দিয়েছে। দুই ছেলেকে বড় বড় দু-গ্লাস। খাবলা খাবলা চিনি মিশিয়ে, এক থালা করে লুচি তরকারি খাওয়ানোর পর।

—দিক না। তুই এত খেপে যাচ্ছিস কেন? অনুরূপা হাসছেন মিটিমিটি—বউ নয়, বৌদি বল। ওরা আমাদের আত্মীয়।

—সে আমি জানি। পুষ্প খরখর করে উঠল,—নীচে গিয়ে দ্যাখো না, দুই ছেলেতে কল খুলে কিরকম বাথরুম ভাসাচ্ছে!

পুষ্প টাকা নিয়ে চলে গেল।

অনুরূপা হরলিক্সে চুমুক দিলেন,—তুমি নিজে বাজার গেলে পারতে। সব কাজ কি কাজের লোকদের দিয়ে হয়!

—আমার এখন সময় নেই। তোমার মাউথ-স্প্রে ফুরিয়ে এসেছে, শঙ্কর মেডিকেলে নেই—দেখি একবার বিডি মার্কেট যেতে হবে। ইলেকট্রিক বিলেরও আজ লাস্ট ডেট। সুখময় বিরস মুখে টোস্টে কামড় বসালেন,—পোস্ট অফিসও যাব। বাড়িতে এয়ারমেল নেই, আনতে হবে।

—তুমি এখনও ছোট্টুকে উত্তর দাওনি! সেই কবে ওর চিঠি এসেছে!

—কবে কোথায়, পরশুই তো এল। তাও আমরা চিঠি দেওয়ার আড়াই মাস পর।

—ওদের নতুন সংসার। নতুন দেশ। নতুন কাজ। তাও আবার যে সে কাজ নয়, অসুখ নিয়ে রিসার্চ। সব সামলে চিঠি লিখতে বসা... সময় তো লাগবেই।

—নতুন কোথায়, দেখতে দেখতে তো আট মাস হয়ে গেল।

—আট মাস আর কি এমন সময়? ওদিকে তোমার বাবিনের যে আট বছর হয়ে গেল। সে কটা চিঠি লেখে বছরে? গুনে গুনে চারটে কি পাঁচটা। তাও বউ লেখে, নিজে তার সঙ্গে নীচে দু'লাইন।

সুখময় চকিতে উদাস। সোঁ সোঁ করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে বুকে,—ওদের সবই নতুন। সব সময়ে। শুধু বাবা-মা দুটো ছাড়া।

—ও আবার কি কথা! হরলিক্স শেষ করে অনুরূপা শুচ্ছেন ধীরে ধীরে,—চা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎই দরজার দিকে নজর গেল সুখময়ের। অমলের বড় ছেলেটা পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছে ঘরে।

অনুরূপাও দেখেছেন। কোমল গলায় ডাকলেন,—আয় দাদু।

ছেলেটা দু'দিকে মাথা দোলালো। এল না।

অনুরূপার স্বর আরও নরম,— তোর চোখ ছলছল করছে কেন রে? মা বকেছে? ওমা এ তো জলও গড়াচ্ছে দেখছি।

দু-হাতের চেটোর উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে নিল ছেলেটা, মুখে স্বর ফুটেছে, —তোমাদের ছাদটা কি বড় গো! আমি আর ভাই চুপি চুপি গিয়ে দেখে এসেছি।

—তাই? আর কি দেখলি? ছাদের ফুলগাছগুলো দেখেছিস্?

—হ্যাঁ। অ্যা, ভাই না একটা ফুল ছিঁড়েছে। লাল ফুল। পর্দা সরিয়ে দু-পা এগোল ছেলেটা,—আমরা কোন্ ঘরে থাকব গো ঠাম্মা? মা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলল। বনু ঘুমিয়ে পড়েছে তো।

—এমা ছি ছি, তুমি কি যে করো না। অনুরূপা অপ্রস্তুত মুখে স্বামীর দিকে তাকালেন,—যাও ওদের জন্য বাবিনের ঘরটা খুলে দাও। বাবিনের খাট বড় আছে।

বাবিন-ছোট্টুর ঘর তালাবন্ধই থাকে সারা বছর। সপ্তাহে একদিন ঝাড়াঝুড়ি হয়। আগে অনুরূপা নিজের হাতেই করতেন। ধুলো নাকে গেলে কষ্ট বাড়ে বলে নিজে আর ঢোকেন না, পুষ্পই সাফসুতরো করে রাখে যতটা সম্ভব।

সুখময়ের কণ্ঠে শ্লেষ ফুটল,—বাবিনের খাটেও পাঁচজন ধরবে না। ছোট্টুর ঘরও লাগবে।

—লাগলে লাগবে, খুলে দাও। ও তো এখন ভূতের ঘর।

ড্রয়ার থেকে দুপদাপ চাবির গোছা বার করে সুখময় বিছানায় ছুঁড়ে দিলেন। অনুরূপার পলকা আদিখ্যেতা তাঁর মোটেই মনঃপূত নয়। ওফ, ওই মায়াবী ঘর দুটো এখন তছনছ করবে অমল! গ্রাম্য গন্ধ ছড়িয়ে দেবে চারদিকে!

সুখময় দরজার দিকে এগোলেন,— পুষ্প ফিরুক, ওকে দিয়েই খুলিয়ে নিও। আমি বেরোচ্ছি।

দুপুরে অমলদের আসার প্রকৃত কারণটা জানা গেল। অমলই বলল খাওয়ার সময়ে। অমলের বড় ছেলেটার চোখে কি সব গণ্ডগোল হয়েছে, ছেলেকে বড় ডাক্তার দেখাতে এনেছে কলকাতায়। সারাক্ষণই নাকি চোখ ছলছল করে, জল পড়ে, মাঝে মাঝে যন্ত্রণাও হয়। সিউড়িতে দু-তিনজন ডাক্তারকে দেখিয়েছিল, তাদের এক একজনের এক এক মত। কেউ বলে গ্ল্যাণ্ডের গণ্ডগোল, কেউ বলে নার্ভের, কেউ বলে কর্নিয়ার। ওখান থেকে এক ডাক্তার চিঠি দিয়ে দিয়েছে, তার সুপারিশেই দেখাবে বড় ডাক্তারকে। ডাক্তারটির নাম সুবেন সরকার। পিজির প্রফেসার। শোনা-শোনা নাম, ছোট্টুর মুখেই সুখময় শুনেছেন বোধহয়।

স্টাডিরুমে এসে সুখময় একটা সিগারেট ধরালেন। খাওয়া-দাওয়ার পর এ ঘরে বসে মৌজ করে একটু সিগারেট খান। আগে দিনে কুড়ি-পঁচিশটা হয়ে যেত। এখন নেশাটা অনেক কমিয়ে এনেছেন। দুপুরে রাতে খাওয়ার পর একটা করে, আর সারা দিনে বড়জোর দু-তিনটে। এবার ভাবছেন ছেড়েই দেবেন অভ্যাসটা। একটু জোরে হাঁটলেই আজকাল একটা চিনচিনে হাল্কা ব্যথা হয় বুকে, হাঁপিয়েও যান বড় তাড়াতাড়ি। ব্যথার কথাটা অনুরূপাকে বলেননি। মিছিমিছি মানুষের উদ্বেগ বাড়িয়ে কি লাভ। একেই তো নিজের জ্বালায় জ্বলে মরছে বেচারা।

দুপুরের বাতাস বাইরে থম মেরে ছিল অনেকক্ষণ, হঠাৎই একটা ঝাপটা দিল যেন। খোলা জানলা দিয়ে কিছু ধুলোবালি উড়ে এল। শুকনো পাতারা ছুটছে রাস্তায়। সুখময় উঠে জানলাটা টেনে দিলেন। পুষ্পকে কতবার করে বলেছেন বেলা বাড়লে সব জানলা বন্ধ করে দিতে, এ সময়ে ধুলো ঢুকে ঘরদোর বড় নোংরা হয়, তা কথাটা যদি খেয়াল থাকে মেয়েটার! আজ অবশ্য খেয়াল না থাকলেও বলার নেই কিছু। সিউড়ি থেকে আসা উটকো ধুলো সামলাতেই যা হিমশিম খাচ্ছে।

অমলটা সত্যিই যাচ্ছেতাই। যেমন নোংরা, তেমন বেআক্কেলে। শিক্ষাদীক্ষা না থাকলে যা হয়। অতটুকু ছেলে চোখ নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে, অথচ বাপকে দ্যাখো দিব্যি মাংসের হাড় চুষতে চুষতে ব্যাখ্যান করে চলেছে ডাক্তারদের। ভাষাই বা কী। ওখানকার

ডাক্তারটা লেবঞ্চুস! বেঁড়ে পাকামি করছিল! চেম্বারে ঢুকে দিয়েছি ব্যাটাকে আচ্ছা করে কড়কে! বসার ভঙ্গিটাও কী অশালীন! এক-পা চেয়ারে তুলে, এক পা নাচাতে নাচাতে খাওয়া! লোমশ খালি গা! পরনে উৎকট চেক লুঙ্গি! শব্দ করে করে কুলকুচি করা! অসহ্য! অসহ্য!

সুখময় চেপে চেপে সিগারেট নিবিয়ে ওপরে এলেন। আঃ, ঠিক যা ভয় পেয়েছিলেন তাই। অনুরূপার সামনে মোড়া টেনে বসে আগড়ুম বাগড়ুম গল্প করে চলেছে অমল। সাধারণ বুদ্ধিটুকুরও এত অভাব? শুনলি মামী সারারাত ঘুমোতে পারেনি—এখন কষ্ট কম, একটু শুয়ে নিতে দে, তা নয়... ! অনুরূপাও কেন যে এত লাই দেয় ছেলেটাকে! নির্ঘাত এখন আত্মীয়স্বজনদেব ঠিকুজি কুষ্ঠির তালাশ চলছে —কার বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না, কার মেয়ে বাপকে লুকিয়ে বিয়ে করার মতলব ভাঁজছে, রামপুরহাটের কোন দেওর কাব জমি হাতাল, এসব শুনে অনুরূপার কী যে মোক্ষ লাভ হয়! নিজে তিনি কোনদিন প্রশ্রয় দেননি অমলকে। এসেছ এসো, দু-চার ঘণ্টা থাকো, খাও দাও, বিদায় নাও। শুধু অমল নয়, সব আত্মীয়ের জন্যই সুখময়েব এক বিধান।

ঘবে না গিয়ে সুখময় সামনের প্যাসেজটার দিকে গেলেন। দু'ধাবে বাবিন আর ছোট্টুর ঘর। দুটোই হাট করে খোলা। ছোট্টুর খাটে বিশ্রীভাবে ছড়ানো রয়েছে অমলদের মালপত্র, জামাকাপড়। বাবিনের বিছানায় মঞ্জু কোলের মেয়েটাকে নিয়ে পাশ ফিরে শুযে। বড় ছেলেটি মেঝেয় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। ছোটটি খাটেব প্রান্তে গুটিযে গুটিয়ে জড়সড়ো।

সুখময সবে এলেন। পূব-দক্ষিণ-খোলা গোল বারান্দা থেকে দুপুর হলেই রোদ সবে যায়। একটা ইজিচেযাব আর গোটা দু-তিন মোড়া সব সময় ছড়ানো থাকে এখানে। সুখময় ইজিচেয়ারে শরীর ছেড়ে দিলেন। বাবিন আর ছোট্টুর ঘর দুটি তাঁর বড় প্রিয়। নির্জনতার সঙ্গীও বটে। অনুরূপাকে লুকিযে মাঝে মাঝেই ঘর দুটোর তালা খোলেন সুখময়। চেয়ার টেবিল খাট আলমারি বিছানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেন। পোস্টারগুলো কবেই আর নেই, তবু ফিকে রঙিন দেওয়ালে এখনও অনেক ছবি দেখতে পান তিনি। বাবিন জন্মাল। হাঁটছে। কথা ফুটল মুখে। স্কুলে যাচ্ছে। রাত্তিরবেলা অনুরূপাকে আবার রেখে আসতে হল রেলের হাসপাতালে। ছোট্টু এল। পিঠোপিঠি বড় হচ্ছে দুই ভাই। ছবি আর ছবি। পব পর অজস্র ছবির মিছিলে দেওয়াল পূর্ণ হয়ে যায়। বাবিন আমেরিকা থেকে বিয়ে করতে এল। বউ নিয়ে চলে যাচ্ছে। ছোট্টুর লণ্ডনে রিসার্চ করতে যাওয়ার সুযোগ এসে গেছে। নিজের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করে সে-ও চলে গেল বাইরে। কখনও এয়ারপোর্টে গিয়ে হাত নাড়ছেন সুখময়। কখনও হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরছেন ছেলেদের, নাতিকে। সব—সব মুহূর্ত এই দুটো ঘরে যেন বন্দী হয়ে আছে।

চাবি খুলে শুধু তাদের দেখা বারবার, প্রাণভরে।

—ঘুমোচ্ছ নাকি?

সুখময় চোখ খুললেন, উত্তর দিলেন না।

অমল মোড়া টেনে বসল। সুখময়কে বিস্মিত করে চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ।

যেন উষ্ণ দুপুরের ছায়া আবিষ্ট করেছে তাকেও। হঠাৎই বলল,—তুমি কেমন বুড়োটে হয়ে গেছ মামা!

সুখময়ের ছোট্ট শ্বাস পড়ল.—বয়স তো হচ্ছে।

—বয়স কিসের? এখনও তো সত্তর ছোঁওনি। কত চলছে? আটষট্টি? উনসত্তর?

—সেটা কি কম হল?

—কম নয়, বেশিও নয়। আমার বড় জ্যাঠাকে দ্যাখো, এইট্টি ওয়ান। এখনও বাচ্চাদের ফুটবলে রেফারিং করতে নামে। এদিকে আমার বাবা ছিয়াত্তরেই কুপোকাত! অলটাইম বিছানায়!

সুখময় অন্যমনস্কভাবে বললেন,—জামাইবাবু বরাবরই বোগাভোগা।

—ওটা বাজে কথা। আসল ব্যাপারটা কি জানো? যাদের ওপর টান খুব বেশি, তাদের কাছ থেকে ল্যাং খেলে শরীর ভেতর থেকে ধসে যায়।

—কে তোর বাবাকে ল্যাং মারল? তুই রয়েছিস, বউমা রয়েছে...

—আমরা কি বাবার ভালবাসার জন নাকি। ভালবাসার ছেলে হল দাদা। বাবার ভাল ছেলে। লেখাপড়ায় ভাল, বাবিন ছোট্টুর মতো না হলেও দু-তিনখানা ডিগ্রি আছে। তাকে নিয়ে বাবার অত সাধ-আহ্লাদ, অথচ তিনি তো পুরো কাট্টি করে দিয়েছেন! আমি চিরকালের লাথখোর ছেলে, বাবা আমাকে হারামজাদা না বলে কোনওদিন জল খায়নি, সেই আমার মুখ চব্বিশ ঘণ্টা দেখতে বাবার ভাল লাগে?

মেজদির চিঠিতেই কথাটা জেনেছিলেন সুখময়, তবু প্রশ্ন করলেন,—নির্মল কি পার্টিশান করে নিয়েছে?

—পার্টিশান মানে? পুরো পাঁচিল গেঁথে ফেলেছ। দশ ইঞ্চির দেওয়াল। একেবারে বউ-এর ভেড়া হয়ে গেছে। বাবার একটা হার্ট-অ্যাটাকের মতো হল, রাস্তায় ডেকে বললাম, একবার চোখের দেখাও দেখতে এল না। এলে যদি মাল্লু ছাড়তে হয়! পুজোর সময় মাকে হাতে করে একটা কাপড় পর্যন্ত দেয় না!

সুখময় হাল্কা চালে বললেন,—ভালই তো, তুই বাবা-মাকে দেখছিস, তোর পুণ্যি বাড়ছে।

—পাপ-পুণ্য বুঝি না মামা। আমার মোটা বুদ্ধি বলে যে বাপ-মা খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছে তারা বুড়ো হলে আমাদেরকেই তাদের দেখতে হবে। এ কোন দয়া-ফয়ার ব্যাপার নয়, পুরো হিসেবের কড়ি। জুতো-ঝাঁটা যাই মারুক, খেতে পরতে তো দিয়েছিল! সেই লোনটা শোধ করতে হবে না!

কথাটা সামান্য বিঁধল সুখময়কে। কোথায় যে ঠিক বিঁধল, বুঝতে পারলেন না।

অমল দুম করে প্রশ্ন করে বসল,—বাবিন শুনলাম আর নাকি ফিরছে না! মামী বলছিল, কিসব গ্রিন কার্ড-মার্ড পেয়ে গেছে?

—তা পেয়েছে। তবে ফিরবে না এমন কথা তো বলেনি! বলতে গিয়েও ঠিক ঠিক জোর ফুটল না সুখময়ের গলায়। স্ত্রীর ওপর মনে মনে বিরক্তই হলেন তিনি। অমলকে এত কথা বলার কি দরকার ছিল।

অমলের কৌতূহলের শেষ নেই, সে আবার খোঁচা দিল,—তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো

মামা, ছোট্টু বিদেশে পড়ে থাকতে পারবে না, ও যা মামীর কোলঘেঁষা।

সুখময় শক্ত হলেন,—ওদের যদি বিদেশে ভাল লাগে, নিশ্চয়ই থাকবে। এ দেশে তেমন স্কোপই বা কোথায় ওদের জন্য?

—তা ঠিক। না ফেরাই উচিত। এত ভাল ছেলে ওরা। অমল বিজ্ঞের মতো রায় দিল,— আমি তো মঞ্জুকে বলি, তুমি শুধু আমাদের ফ্যামিলির দুটো স্যাম্পেল দেখলে! এক আমি, ডিগবাজি খেয়ে খেয়ে ধপাস পার্টি। আর এক আমার বউ-এর পাশে লেজ নাড়ানো দিগগজ দাদা, মাদুর পাতা মাস্টার। যদি খাঁটি জুয়েল দেখতে চাও, আমার মামার ছেলেদের দেখো। কী ভদ্র! কী অমায়িক ব্যবহার! কোনও পরীক্ষায় কখনও ফার্স্ট ছাড়া সেকেণ্ড হয়নি।

কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও কথাটা খুব মিথ্যে নয়। বাবিন হায়ার সেকেণ্ডারিতে থার্ড হয়েছিল, ছোট্টু মেডিকেলের জয়েণ্ট এণ্ট্রান্সে সেকেণ্ড। দুই ছেলের পিছনে কম পরিশ্রম কম অর্থব্যয় করেননি সুখময়। তাঁর সব চেষ্টা আজ সার্থক। ছোটবেলা থেকে ছেলেদের নিখুঁতভাবে পথ দেখাতে পেরেছেন বলেই না তিনি আজ এক সফল পিতা। দুই পুত্রবধূও তাঁর শিক্ষিত। মার্জিত। বাবিনের বউ ওখানে একটা স্কুলে চাকরি করছে, ছোট্টুর বউ তো ছোট্টুর মতই ডাক্তার।

সুখে প্রাচুর্যে সাফল্যে সব দিক দিয়েই পরিতৃপ্ত সুখময়, তবু কেন যে বুকটা চিনচিন করে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ, এই নির্জন অপরাহ্ণবেলায়?

—কি লিখলাম শুনবে না?

অনুরূপা রাতের খাওয়া সারছিলেন। দুটো রুটি, অল্প মুর্গির মাংস। তাঁর জন্য স্টুয়ের মতো করে আলাদা মাংস রেঁধেছে পুষ্প। এমনিতে অনুরূপা পাতলা রান্না ভালইবাসেন, কিন্তু আজ ঠিক গলা দিয়ে নামছিল না তাঁর। একটা চোরা ভয় শিরদাঁড়া ছুঁয়ে যাচ্ছে। আবার যে কখন কালকের মত এসে পড়ে কষ্টটা!

সুখময় অসহিষ্ণুভাবে বললেন,—কি হল শুনবে? পড়ব না মুখ বন্ধ করে দেব?

অনুরূপা ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন—কি আব শুনব? লিখেছ তো সেই বাঁধা গৎ—আমরা ভাল আছি, তোমরা কেমন আছ? মাঝে তোমার মায়ের শরীর খারাপ হয়েছিল—সেই হাঁপের টান। এখন মোটামুটি আছে। তোমরা আমাদের জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না।

সুখময় ঈষৎ ক্ষুণ্ন হলেন,—আর কিছু লিখি না আমি?

—বলো, আর কি লেখো?

সুখময় তীব্র চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন,—লিখে দেব তোমার জন্য সারারাত জেগে বসে থাকতে হয়? তোমার চোখ মুখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে?

—আমি কি বলেছি, ওসব লিখতে?

—তাহলে কি লিখব? লিখব, স্নেহের ছোট্টু, তুমি একদা গেটের সামনে যে কৃষ্ণচূড়া গাছটি পুঁতিয়াছিলে তাহাতে ফুল আসিয়াছে, তোমার দাদার পোঁতা পলাশ গাছেও। দুটি গাছের ফুলে আমাদের গেটের সম্মুখভাগ লাল হইয়া থাকে।

অনুরূপা খাওয়া বন্ধ করে স্বামীর দিকে তাকালেন,— সত্যি কথা স্বীকার করতে এত ভয় পাও কেন তুমি? যা লিখেছ, এ ছাড়া সত্যিই কি কিছু লেখার আছে? চিঠি লেখা মানে তো এখনও জ্যান্ত আছি সেটা জানানো, আর কি?

সুখময় নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। এয়ারমেলের মুখ জুড়লেন ধীরে ধীরে। ঘরের উজ্জ্বল আলোটাকে বড় নিষ্প্রভ লাগছিল তাঁর। শুধু নিষ্প্রভ নয়, ঝাপসাও।

নিম্নস্বরে বললেন সুখময়,—তুমি বড় নিষ্ঠুর অনু।

—নিষ্ঠুর নয়, যা দেখি যা বুঝি তাই বলছি। তুমি যা সত্যি সত্যি লিখতে চাও, তা তোমার কলমের ডগায় আসবে? আমি চাইলেও আমাকে লিখতে দেবে সে কথা?

—কেন লিখব আমরা? সুখময়ের গলা ফ্যাসফ্যাসে শোনাচ্ছিল।

—লিখো না। যক্ষ হয়ে কুবেরপুরী আগলাও।

একতলা থেকে টিভির শব্দ ভেসে আসছিল। সিনেমার গান হচ্ছে। পুরনো দিনের গান। অমল খুব জোরে চালিয়েছে টিভিটা।

কান পেতে গানটা শোনার চেষ্টা করলেন অনুরূপা। কি গান বোঝা যাচ্ছে না। থালায় হাত ধুতে ধুতে বললেন,—তুমি আজকাল বড় অবুঝ হয়ে যাও। ওইটুকু বাচ্চাকে তখন ওইভাবে ধমকালে। কোন মানে হয়?

—বেশ করেছি। খবর শোনার সময়ে অত চেঁচাবে কেন? বউটারও বলিহারি! তিন-তিনটের মা হয়েছে, একটাকেও সামলাতে পারে না। সুখময় প্রায় ভেংচে উঠলেন, —কোলের মেয়েটা সোফাতে পেচ্ছাপ করে দিল, মায়ের হিলদোল নেই, একটু কাঁচিয়ে ফেলে দিল শুধু। ছোট ছেলেটা শোকেসের কাচ ভটাং করে টানছে বন্ধ করছে, মায়ের ভ্রূক্ষেপ নেই। একদিনেই বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে দিল।

—দিক গে, অত পিটপিট কোরো না তো! দুটো দিনের জন্য এসেছে... আর ওই সোফা-শোকেস নিয়ে কি আমরা স্বর্গে যাব? তোমার ওই মর্নিং ওয়াকের মিলিটারি বন্ধু বলে না, এর পর সব বাড়ি সার সার ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে, ঠিকই বলে।

সুখময় চশমা খাপে ভরলেন। অনুরূপার কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেললেন তিনি, —আর আমি হব যক্ষ, তাই তো? এ পাড়ায় সার সার যক্ষ!

—তাই তো হবে। অনুরূপাও হাসছেন, অনেক বকেছ, এবার আমার ক্যাপসুলটা দাও।

ওষুধের সঙ্গে বেশ খানিকটা জল খেলেন অনুরূপা, তারপর বললেন,—দশটা তো বাজে, তোমরা খেতে বসবে না?

—বসব। তোমার পুষ্পরাণীর টিভি দেখা শেষ হোক। সকালে অমলের বউটাকে সহ্য করতে পারছিল না, এখন তো তার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব।

—অমলের বউটা সত্যিই ভাল গো। বড় দুঃখী। অনুরূপা সামান্য ইতস্তত করে বললেন,—তোমার মেজদিও নাকি ওর ওপর খুব অত্যাচার করে।

—কেন?

—কেন আবার কি? বিয়েতে তেমন কিছু পায়নি, প্রায় এক বস্ত্রেই চলে এসেছে, মেয়েটা, তাই নিয়ে দিবারাত্র নাকি গঞ্জনা দেয়। বলতে বলতে কেঁদে ফেলছিল বেচারা।

—অমলের তো খুব হাঁকডাক, ও কেন প্রোটেস্ট করে না?

—মুরোদ কোথায়? মাইনে তো পায় হাজার টাকা। তোমার জামাইবাবুর পেনশানের টাকা আছে, ফিক্সড ডিপোজিটের ইন্টারেস্ট আছে—তাই দিয়েই চলে সংসারটা।

সুখময় থমকে গেলেন। বিড়বিড় করে বললেন.—তবে যে ছেলেটা বড় মুখ করে বলছিল বাবা-মাকে দেখছি! অন্নের ঋণ শোধ করছি।

—বাজে কথা। মেয়েটা আলাদা থাকতে চায়. তোমার ভাগ্নে নিরুপায়। আলাদা হলে খাবে কি? নেহাত অন্ন জুটবে না বলেই বাবা-মার কাছে পড়ে আছে। বাপ-মার ওপর ভক্তি নয় গো. একে বলে দায়ে পড়ে রায়মশাই। তোমার জামাইবাবু নাকি নাতির চোখের চিকিৎসার জন্যও ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে দিয়েছে ছেলেকে।

পুষ্প ঘরে এসে এঁটো থালাবাসন গোছাচ্ছে. যাওয়ার সময় সুখময়কে খেতে ডেকে গেল।

সুখময় খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরলেন। সিগারেট ধরিয়ে গোল বারান্দায় পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। শুয়ে পড়লেন।

সারাদিনের তপ্ত ভাব আর নেই। একটা নরম মিঠে বাতাস জানলা বেয়ে ঘরে ঢুকছে। স্পর্শ করছে ঘরের আসবাবপত্র। মানুষদেরও। নারকেল গাছের ওপারে পিছনের রাস্তার টিউবলাইটটা জ্বলছে নিবছে বার বার।

রাত বাড়ছিল।

মাঝরাত অবধি ঘুম এল না সুখময়ের। প্রতি পলে কাল রাতের বিপন্নতার স্মৃতি কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছিল তাঁকে। পাশের ঘরের কলকাকলি স্তব্ধ হওয়ার পরও চোখের পাতা এক হল না কিছুতেই।

হঠাৎই সুখময় একটা শব্দ শুনলেন। শব্দটা প্রথমে একটু শুরু হয়েই থেমে গেল। তারপর আবার শুরু হল। বাড়ছে। কমছে। থামছে। বাড়ছে।

বেশ খানিকক্ষণ মন দিয়ে শোনার পর শব্দের উৎসটা খুঁজে পেলেন সুখময়। অমল নাক ডাকছে।

রাগতে গিয়েও সুখময়ের রাগ এল না। স্নায়ু কেমন ঝিমিয়ে এল। অন্ধকার বাড়িতে শব্দটা পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। মথের মতো। একটা প্রাণের অস্তিত্ব হয়ে।

অনুরূপার টান উঠল না। সুখময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

টানটা পরদিন উঠল না—পরদিনও না। দু'দিন ধরে গোটা বাড়ি জুড়ে দক্ষযজ্ঞ করল অমলের দলবল—ছড়ালো. লাফালো, নোংরা করল, ছাদের টব প্রায় নির্মূল করে ফেলল শিশুরা। ছেলেকে ডাক্তার দেখাল অমল। তেমন বিপদের কিছু নেই। গ্ল্যাণ্ডেরই গোলমাল। ওষুধ চলবে এখন। এক মাস পরে আবার দেখাতে হবে ছেলেকে। মনের আনন্দে অমল কলকাতা ঘোরালো বউ-বাচ্চাদের। পাতালরেল. দ্বিতীয় হুগলি সেতু,—কিছুই বাদ পড়ল না। আজ তার লটবহর নিয়ে ফেরার পালা।

দুপুর দুটোয় বাস। ধর্মতলা থেকে। পথে খাওয়ার জন্য কোঁচড় বেঁধে টিফিন দিয়ে দিলেন অনুরূপা নিজের হাতে তৈরি করে। লুচি তরকারি হালুয়া। একটা ভাল

শাড়িও দিলেন মঞ্জুকে। বাচ্চাদের এক সেট করে জামাকাপড়।

মঞ্জু খানিকটা কাঁদল। অমল হাসল হা হা করে। বাচ্চাগুলো খুশি না ব্যথিত বোঝা গেল না।

অমল চলে গেল, ঝাঁ ঝাঁ রোদে।

•

বাবিন আর ছোট্টুর ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে পুষ্প। সাজিয়ে-গুছিয়ে ঘর আবার পুরনো চেহারায়।

সুখময় ঘর দুটোতে তালা দিতে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। দুটো খোলা দরজার মাঝখানে, ছায়া ছায়া প্যাসেজে, নিঝুম দাঁড়িয়ে আছেন অনুকণা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কী নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে বাবিন-ছোট্টুর গরবিনী মাকে। শুধু একা নয়, শূন্য। কাঙাল।

বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল সুখময়ের। তার একটা ছেলেও যদি অশিক্ষিত, বেরোজগেরে হত ওই অমলটার মতো।

সাত বছর এগারো মাস আট দিন

শব্দগুলো যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেঁথে যাচ্ছে যন্ত্রটার গায়ে। টকটক...টকটক...টকটক... টক। পাশে বসা যুবকটি কী অবলীলায় খেলা করে চলেছে প্রতিটি কথাকে নিয়ে? বাজাচ্ছে—নাচাচ্ছে. আঙুলের মৃদু চাপে দ্রুত তাদের বসিয়ে দিচ্ছে যন্ত্র-অক্ষরগুলোর বুকে।

ভদ্রলোক ভরাট গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যাব। চাবিতে আঙুল রেখেই যুবক মুখ তুলল—পড়ব?

—পড়ো।

টাইপ রাইটারেব রোলার পাক খেল কয়েকবার। যুবক ঝুঁকল যন্ত্রস্থ কাগজটাব দিকে—টু দা কোর্ট অফ দা ডিসট্রিক্ট জাজ. আলিপুর, চব্বিশ পরগণা সাউথ। ম্যাট্রিমোনিয়াল স্যুট নাম্বার নশো পঁয়ত্রিশ অফ নাইনটিন এইট্টিনাইন।

—হুঁ। ভদ্রলোক বিভলভিং চেয়ার ঘোরালেন। গর্বিত মোবগের মত ঘাড় ফুলে উঠল সামান্য—বুঝলেন. এ বছর এই নশো পঁযত্রিশটা কেসেব একশ বাইশটা আমিই করলাম। হা হা! বাবে আজকাল আমার নামই হয়ে গেছে বিচ্ছেদ উকিল।

নিজের রসিকতায় একাই হাসছেন ভদ্রলোক। চন্দন নকল হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল ঠোঁটে। হাসি ঠিক ফুটল না। সিগারেটে বড় টান দিয়ে মাথা রাখল চেয়ারের পিঠে। ভুল করে একবার তাকিয়েও ফেলল সুদেষ্ণার দিকে। টেবিলের কাচে একভাবে আঙুল বুলিয়ে চলেছে, কোন টেনশন চাপার চেষ্টা করলে চিরকালই আঙুলগুলোকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায না সুদেষ্ণা। ফর্সা চঞ্চল আঙুলগুলোর ওপর থেকে জোর করে চোখ সরিয়ে নিল চন্দন। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জরিপ করছেন দুজনকেই। চন্দনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চালশে চশমাখানা এঁটে নিলেন চোখে। যুবকের দিকে ফিরলেন—এবার তাহলে পিটিশনারদের ডিটেইলস টাইপ করে ফেল। ওকে?

—করে ফেলেছি স্যার। যুবকটির গলায় চোরা উৎসাহ যেন। উৎসাহ, না কৌতূহল? আড়চোখে একবার দেখেও নিল সুদেষ্ণাকে,—এই যে স্যার। পিটিশনার নাম্বার ওয়ান শ্রীচন্দন মুখার্জি, বাবা লেট হরশংকর মুখার্জি. বাই ফেথ হিন্দু, বর্তমান ঠিকানা আটত্রিশ-জে মহাবাজা ঠাকুর রোড, পি-এস—যাদবপুর, কলকাতা সাত লক্ষ একত্রিশ। পিটিশনার নাম্বার টু শ্রীমতী সুদেষ্ণা মুখার্জি, স্বামী শ্রীচন্দন মুখার্জি, বাবা লেট আনন্দমোহন চ্যাটার্জি, বাই ফেথ হিন্দু. বর্তমান ঠিকানা একুশের দুই লেক প্লেস, পি-এস টালিগঞ্জ কলকাতা, সাত লক্ষ উনত্রিশ।

—রাইট। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। আরাম করে শরীরটাকে ছড়িয়ে দিলেন দশাসই চেয়ারটায়। দু আঙুলে ডট পেন ঘোরাতে লাগলেন বনবন—এবার তাহলে হেডিং লিখে ফেল। লেখো অ্যাপ্লিকেশন ফর ডিভোর্স অন মিউচুয়াল কনসেণ্ট আণ্ডার সেকশন তেরোর বি অফ হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, উনিশশো ছাপ্পান্ন।...হয়েছে? পরের লাইন—, দি হাম্বল পিটিশন অফ পিটিশনার নাম্বার ওয়ান অ্যাণ্ড পিটিশনার নাম্বার টু...।

তীব্র শব্দ তুলে যান্ত্রিক গতিতে বাক্যরা পরপর দাঁড়িয়ে পড়ছে স্ট্যাম্প পেপারের গায়ে। টাইপ রাইটারের চাবি নয়, যেন বৃদ্ধ বিধাতার শীর্ণ আঙুল বিধিলিপি লিখে চলেছে। সুদেষ্ণা চোখ বুজে ফেলল। আহ্। কেন এ সময়ে ওই ছবিটাই বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে! একটা পরিপূর্ণ আলোকময় সন্ধ্যা। চারদিকে উজ্জ্বল মানুষের মুখ, হাসি, কোলাহল আর সানাইয়ের বুক তোলপাড় করা সুর। অমন একটা খুশির ছবিতে কে ওই মেয়েটা রাজেন্দ্রাণী হয়ে বসে? চোখভর্তি লজ্জা! বুক জুড়ে তিরতির সুখ। সে কি এই সুদেষ্ণাই!

পুরুতমশাই বললেন—কন্যাকে পশ্চিমমুখে বসান। জামাইকে পুবমুখে।

বেনারসি আর গয়নায় জরদগব সুদেষ্ণাকে দুই বৌদি চন্দনের মুখোমুখি বসিয়ে দিল।

পুরুতমশাই বাবার দিকে তাকালেন—এবার আপনি কন্যা ও বরের পরস্পরের মুখ অবলোকন করান।

শাঁখ বেজে উঠল। উলুধ্বনিতে কান তোলপাড়। বাবা চন্দনের হাঁটুতে হাত রেখেছেন। সারাদিনের উপোস করা চোখেমুখে একটু শুকনো ভাব। তবু গরদের কাপড়ে কী যে সৌম্য সেদিন! খালি গায়ে ধবধবে সাদা পৈতে। হাতের কোশে তিল, কুশ, যব। ...ভরদ্বাজ গোত্রস্য স্বর্গীয় হরশংকর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, ভরদ্বাজ গোত্রায় চন্দন দেবশর্ম্মণে...কাশ্যপ গোত্রস্য আনন্দমোহন দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, কাশ্যপ গোত্রাং সুদেষ্ণা দেবীং এনাং—সবস্ত্রাচ্ছাদিতালঙ্কৃতাং কন্যাং...

গাঁটছড়া বাঁধার আগে কে যেন বলে উঠল,—এ হল জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন, বুঝলি।

মিথ্যে। সব ভাঁওতা। ভাবের ঘরে চুরি। মনকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা। বন্ধন কোথাওই কোনদিন তৈরি হয় না। কারুর সঙ্গেই না। যা হয় সবটাই এক ধরনের মায়া মাত্র।

সুদেষ্ণা চোখ খুলল। চন্দন ঠিক কোন দিকে মুখ করে বসে এই মুহূর্তে? সেই বা কোন মুখে? জীবনের মুখ কখন যে কোথায় কিভাবে বদলে যায়! এই ঘরের ভেতরে বসে দিকনির্ণয় করা এখন অসম্ভব। গেট ঠেলে, উঠোন মাড়িয়ে, লম্বা একটা করিডোর পেরিয়ে এ ঘরে এসেছে। এসেছে বললে ভুল হয়। তাকে নিয়ে এসেছে। চন্দনই।

কাল সন্ধেবেলা হঠাৎই চন্দনের ফোন। লেক প্লেসে।

—কাল একবার সময় করতে পারবে? দশটা নাগাদ?

—কেন?

—ল-ইয়ার কাল সকালে বাড়িতে ড্রাফটটা ফাইনাল করে ফেলতে চাইছেন। তুমি এলে সুবিধে হয়।

এক পলকের জন্যও হলেও কেঁপে উঠেছিল সুদেষ্ণা। কেন যে কেঁপেছিল! কি হতে চলেছে, কি হবে, সবই তো জানা। জানা শুধু নয়, পূর্ণ সম্মতিও রয়েছে তার। তবুও...

চন্দন ওপ্রান্ত থেকে বলেছিল,—তুমি যদি বলো তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারি।

—জায়গাটা কোথায়?

—ভবানীপুরে। ভারতী সিনেমার পেছনে।

—ঠিক আছে। আমি ভবানীপুর থানাব সামনে থাকব। ঠিক দশটায়।

সুদেষ্ণা আলগোছে চোখ বোলাল ঘরের চারদিকে। চতুর্দিকের দেওয়াল জুড়ে কাচেব আলমারিতে শুধু মোটা মোটা আইনের বই। একটুও ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ভদ্রলোকের মাথার পেছনদিকে একটা শুধু খোলা জানলা। এমন একটা বদ্ধ ঘরে মানুষ ঘন্টার পর ঘণ্টা নিশ্বাস নেয় কিভাবে। সুদেষ্ণা মুখ ওপরে তুলে ফ্যানেব হাওয়া থেকে কিছু বাতাস টেনে নিল বুকে।

—আমার একটা কথা বলাব ছিল।

—বলুন। সবিনয়ে ঝুঁকলেন ভদ্রলোক।

—আমার নাম ঠিকানা মেনশন করাব সময়ে প্রথমেই মেনশন কবলেন আমি কাব স্ত্রী। ইজ ইট নেসেসারি? বাবার নামই কি যথেষ্ট নয়?

—না ম্যাডাম, ইট ইজ কাস্টমাবি। খুব কায়দা করে চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তব দিচ্ছেন ভদ্রলোক—দেখুন, আপনাদেব মিউচুয়াল পিটিশনের বেসিসে এখন ছ মাসের জন্য জুডিশিয়াল সেপারেশন পাবেন আপনারা। রাইট? এব মধ্যে আপনাদের ভেতরে রিকনসিলিএশনও হয়ে যেতে পারে। বাইট? আই মীন মিটমাট—যদি না হয় তবে ছমাস পরে আপনাবা জয়েন্টলি কোর্টে যেতে পাবেন টু গেট এ ডিক্রি অফ ডিভোর্স। ওকে? ভদ্রলোক এবাব চোখ ফেললেন চন্দনের দিকে—টিল দেন মিস্টার মুখার্জিই কিন্তু আপনার লিগাল হাজব্যাণ্ড। আপনি এটা অস্বীকার করতে পাবেন না। নয় কি? বলতে বলতে এক ছিটে বাঁকা হাসিও যেন ফুটল মুখে—আপনি কি বলেন মিস্টার মুখার্জি?

—আমার কিছু বলার নেই। চন্দন এক ঝটকায় ঘুরে বসেছে সঙ্গে সঙ্গে। গলায় স্পষ্ট ঝাঁঝ। বিরক্তি। পোড়া সিগাবেটের টুকরো অকারণে বেশি চেপে নেভাচ্ছে অ্যাশট্রেতে—আমার মনে হয় এখন কাজেব কথাগুলো শুরু করা উচিত।

—বেশ। ভদ্রলোক ঘূরণ-চেয়ারে পুরো এক পাক ঘুরে নিলেন। বিজ্ঞ মুখে চাপা কৌতুক,—আমি বরং ফাইনাল টাইপিং-এর আগে আরেকবার পয়েন্টগুলো শুনিয়ে দিই, কেমন? কারুর যদি কোন অবজেকশন থাকে এখনও ক্লিয়ার কবে নেওয়া যাবে। বাইট?

ভদ্রলোক 'রাইট' শব্দটা বড় বেশি ব্যবহার করেন। সবসময় 'রং' নিয়ে কাববার করেন বলে কি? কথাটা এমনি এমনি মনে হল সুদেষ্ণার। শেষ 'রাইটে'র সঙ্গে সঙ্গে পাশের টেবিলের যুবক পিঠ সোজা করে বসেছে। হাত বাড়িয়ে ব্রীফটাকে এগিয়েও দিয়েছে প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলে। ভদ্রলোক নতুন করে চশমা এঁটেছেন নাকে।

...পয়েন্ট নম্বর দুই। বিগত উনিশশো আশি সালের পনেরোই জুলাই পিটিশনাব নাম্বার ওয়ান, যিনি তখনও অবিবাহিত ছিলেন, তিনি তখনও অবিবাহিতা পিটিশনার নাম্বার টুকে একুশের দুই লেক প্লেস, থানা টালিগঞ্জ, কলকাতা সাত লক্ষ উনত্রিশ, থেকে হিন্দুমতে বিবাহ করেন।

সুদেষ্ণা কপাল থেকে ঝুরো চুল সরাল। চন্দন তাকিয়ে আছে কাচের গায়ে পড়া নিজেরই আবছা ছায়ার দিকে। ভদ্রলোক দুজনের মুখের ওপরই কয়েক পলক দৃষ্টি ফেলে চোখ রাখলেন কাগজে।

—পয়েন্ট তিন। সেই বিবাহের পর থেকে দুই পার্টি একত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে আটত্রিশ-জে মহারাজা ঠাকুর রোড, থানা যাদবপুর, কলকাতা সাত লক্ষ একত্রিশে বসবাস করে আসছেন। এবং এই ঠিকানায়...

এতবার করে থানা আর পিন কোড আবৃত্তি করছেন কেন ভদ্রলোক? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে প্রমাণ করার জন্য এগুলো কি এতই বেশি জরুরী? কে জানে!

সুদেষ্ণার দুই ভুরু যখন জড়ো পলকা চিন্তায়, ঠিক তখনই চন্দনের প্রতিবাদ শোনা গেল—তিন নম্বর পয়েন্টে ওটা বোধ হয় ঠিক বলা হল না। বসবাস করে আসছেন সেন্টেন্সটা ভুল। কারণ ও আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে লাস্ট ইয়ারের জুনে।

—আহা! ইমপেশেণ্ট হচ্ছেন কেন? সে পয়েন্টও আছে। ভদ্রলোক বরাভয়ের হাসি হাসলেন—চার নম্বরটা শুনুন। এই তো! ...দুজন পিটিশনারই মানসিক অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাবের দরুন গত চব্বিশে জুন উনিশশো অষ্টআশি সাল থেকে আর একত্রে বসবাস করতে পারেননি। তাঁরা শেষ দাম্পত্যজীবন যাপন করেছিলেন উনিশশো অষ্টআশি সালের তেইশে জুন।

ব্যস, এই টুকুনই! বলতে গিয়েও শব্দ দুটোকে গিলে নিল সুদেষ্ণা। আশি থেকে অষ্টআশির জুন, ঠিক ঠিক হিসেব করলে পুরো সাত বছর এগারো মাস আট দিন। এতখানি লম্বা সময়টাকে কি নিপুণ দক্ষতায় দুটো মাত্র লাইনে বেঁধে ফেলল আইন! যেন এতগুলো বছর ছিল শুধুই একত্রে বসবাস করা, আর কিছুই না। কোন ঘটনা নেই, অঘটনও নেই কোন! অথচ ওই বছরগুলোর প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা, পল, অনুপল এখনও পর পর ধরা আছে স্মৃতির পর্দায়। ঘটনাময় দীর্ঘ ভিডিও ক্যাসেট যেমন। পর পর দৃশ্যগুলো যেখানে মধুর থেকে বীভৎস, আরও বীভৎস, আরও বীভৎস। অথচ তাদেরও কি সুন্দর একটা ছোট্ট বাক্যে বন্দী করে ফেলা গেল—মানসিক অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাব! সুদেষ্ণা বাঁ হাতে কপাল চেপে ধরল। উকিল ভদ্রলোক পরিষ্কার উচ্চারণে পাঁচ নম্বর পড়ে চলেছেন—এই বিবাহের ফলস্বরূপ সায়ন্তনী মুখার্জি নামে একটি কন্যাসন্তান জন্মলাভ করে আঠাশে ডিসেম্বর উনিশশো একাশি সালে। রাইট?

রাইট! রাইট! দৃশ্যটা আজও অমলিন যে। একটুও রঙ জ্বলেনি কোথাও। সুদেষ্ণা নিজের মনে মাথা নাড়ল। মনে আছে। সব স্পষ্ট মনে আছে। ওই তো নার্সিংহোমের দরজা ধরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চন্দন। মুখ জুড়ে আনন্দ, লজ্জা আর নতুন পিতৃত্বের গৌরবমাখা এক অপূর্ব নির্মল হাসি।

—থ্যাংকস সুদেষ্ণা। মেনি থ্যাংকস।

বুকের গভীরে জ্যান্ত পুতুলটার শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে তখন কেমন যেন

লজ্জা পাচ্ছে সুদেষ্ণাও। চোখ ছাপিয়ে থিরথির খুশি,—কিসের ধন্যবাদ?

—থ্যাংকস্ ফর দা সুইট ডটার।

—তবে তো ধন্যবাদ তোমারও প্রাপ্য। আমার তরফ থেকে। মেয়ে তোমারই।

দৃশ্য বদল হয়ে যাচ্ছে হু-হু করে। রঙ পাল্টে গেল। চন্দনের স্বর এখন রুক্ষ, কঠিন।

—তুমি আজ মেয়ে ফেলে কিছুতেই কাজে যেতে পারবে না।

—কেন? ঝিমলি তো আজ ভালই আছে। বেশ খেলা করছে।

—তবু তুমি বেরোবে না।

—অসম্ভব। আমাকে আজ একবার যেতেই হবে। তুমি তো জানো আমার কনফার্মেশন হয়নি এখনও।

—চুলোয় যাক তোমার চাকরি। মেয়ে ফেলে...

—আশ্চর্য! বাড়িতে এতগুলো লোক রয়েছে—তোমার মা, তোমার বোন—

—তারা কেউ তোমার মেয়ের আয়া নয়।

—এভাবে বলছ কেন? আমি তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য... বেশ তো, তুমিই তাহলে আজকের দিনটা বাড়িতে থাকো। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি...

—চমৎকার! তোমার জন্য আমি অফিস কামাই করব?

—আমার জন্য কেন? নিজের মেয়ের জন্য করবে। ঝিমলি তোমার মেয়ে নয়? একটা দিন তুমি থাকতে পারো না বাড়িতে? মেয়ের কাছে?

ভিডিও টেপে তুফান গতিতে আবার ফার্স্ট ফরোয়ার্ড। দৃশ্য ছুটে চলেছে পরিণতির দিকে। এবার ছবিতে উদ্দাম চিৎকার। পবস্পরকে আক্রমণ ভয়ংকর ভাবে। সুদেষ্ণা ফুঁসছে রাগী বেড়ালের মত।

—আমি আর এক সেকেণ্ডও তোমাদের বাড়িতে থাকব না। আনকালচারড, অশিক্ষিত ফ্যামিলি একটা। কি ভাবো আমাকে তোমরা? তোমাদের কেনা বাঁদী?

—দ্যাখো, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আমার বাড়ির কাউকে তুলে তুমি কোনরকম...

—বেশ করব বলব। ইতর ছোটলোকের দল সব...

—আর একটা বাজে কথা বললে তোমাকে আমি...

—কি করবে? মারবে?

—ঘাড় ধরে বার করে দেব বাড়ি থেকে।

—তার দরকার নেই। আমি আজই চলে যাচ্ছি। ঝিম—ঝিমলি...

—খবরদার, ঝিমলিকে ডাকবে না।

—ওকে আমি নিয়ে যাব।

প্রচণ্ড শব্দে ঠাস করে গালে চড় পড়ল একটা। ছিটকে গেল সুদেষ্ণা। মুহূর্তে ঘরভর্তি লোকজন। চন্দনের মা, বোন, বাড়ির ঠিকে ঝিটা পর্যন্ত। কী লজ্জা! কী লজ্জা! সবার গলা ছাপিয়ে তখন সাড়ে ছ'বছরের মেয়েটার কান্না ডুকরে ডুকরে উঠছে —ওমা আমি তোমার সঙ্গে যাব। মা আমি তোমার সঙ্গে যাব।

উকিল ভদ্রলোক গলা ঝাড়লেন ভাল করে—এবার ছ নম্বর। কাস্টডির পয়েণ্ট।

সুদেষ্ণা টান টান হয়ে বসল। চন্দন দাঁতে আঙুল কামড়াচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য গোটা ঘর স্তব্ধ যেন। তারপরই ভদ্রলোকের ভারী গলা...

—যদিও আইনের চোখে পিটিশনার নাম্বার ওয়ানই প্রেফারেনশিয়াল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গার্জেন অফ দ্য মাইনর ডটার, তবু তার শিশুবয়স অর্থাৎ বর্তমান টেণ্ডার এজ-এর কথা বিবেচনা করে পিটিশনার নাম্বার টুকেই তার কাস্টডিয়ান ধরা হবে।

এতদিন ধরে জমে ওঠা দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা যেন এক লহমায় উবে যাচ্ছে। বুক কাঁপিয়ে গড়িয়ে এল স্বস্তির নিশ্বাস। সুদেষ্ণা বহুকাল পর চুরি করে তাকিয়ে ফেলল চন্দনেব দিকে। চন্দন তাহলে শেষ পর্যন্ত...। একমনে একটা না-জ্বালানো সিগারেট টেবিলে ঠুকছে চন্দন। মুখটা কি একটু ম্লান? লোকটার ওপর হঠাৎ এত মায়া আসছে কেন? মায়া, না কৃতজ্ঞতা?

উকিল ভদ্রলোক অল্পক্ষণ থেকে আবার পড়ছেন... ছয়-এর বি। যদিও সন্তান পিটিশনার টু-এর কাস্টডিতেই থাকবে তবু পিটিশনার নাম্বার ওয়ানের তার প্রতি ততটাই অধিকার থাকবে, যতটা থাকবে পিটিশনার নাম্বার টু'র। এবং শর্ত মোতাবেক পিটিশনার নাম্বার টু প্রতি সপ্তাহের শনি ও রবিবার পিটিশনার ওয়ানের কাছে কন্যাকে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

না, এটাও তেমন আপত্তিজনক প্রস্তাব নয়। এ শর্ত চন্দন দিতেই পারে। সুদেষ্ণা ঢোঁক গিলল। মেয়ে তার কাছে ঠিকই তবু এখনও তো মাঝে মাঝে তাকে পাঠিয়ে দিতে হয ও-বাড়িতে। মেয়েটারই যে হঠাৎ হঠাৎ এক এক দিন বাবার জন্য খুব মন কেমন করে!

ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন সুদেষ্ণার দিকে। সুদেষ্ণা সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ফেলল। আর তখনই তৃতীয় সাব পয়েণ্টটা এসে গেল।

—ক্লজ ছ'এর এ-তে যে প্রভিশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা কার্যকর থাকবে না, যদি বাচ্চা স্ব-ইচ্ছায় এবং স্ব-বুদ্ধিতে পিটিশনার নাম্বার ওয়ানের কাস্টডিতেই থাকতে চায়। সেক্ষেত্রে বাচ্চার কাস্টডি এক নম্বর পিটিশনারের কাছেই ফিরে যাবে। অর্থাৎ তিনিই লিগাল কাস্টডিয়ান হবেন।

কথাটায় কেমন প্যাঁচ আছে যেন। এ কেমন শর্ত! সুদেষ্ণার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল।

—মানেটা ঠিক পরিষ্কার হল না।

—অপরিষ্কারের কি আছে? চকিতে কথা বলে উঠেছে চন্দন। গলার স্বরে ঝাঁঝ না থাকলেও ঝাঁঝের আভাস,—এখানে তো না বোঝার কিছু নেই। ঝিমলি যদি আমার কাছে থাকতে চায়, আমার কাছেই থাকবে।

—ইমপসিবল। সুদেষ্ণা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে—আমি কোন শর্তেই ঝিমলির কাস্টডি ছাড়ব না।

—তাহলে তো তোমার সঙ্গে কোন আপোসই করা যায় না।

—কে করতে বলেছে আপোস? আমি আমার নিজের উকিল কনসাল্ট করব।

দুজনেরই ধ্বনি উঁচুতে উঠছে ক্রমশ। সামনে বসা অন্য দুটো মানুষের উপস্থিতি যেন ধর্তব্যই নয়। সুদেষ্ণার চোয়াল শক্ত হয়েছে—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। তুমি সব পারো। আমার মেয়ের ব্রেনওয়াশ করতে তোমার দুদিনও লাগবে না।

—হোয়াট ডু ইয়ু মীন টু সে?

—যা বলতে চাইছি খুব বুঝতে পারছ। ঝিমলি আমাকে সব কথা বলে। তুমি ওকে ও-বাড়িতে ভি সি আর কিনে দেবে বলেছ। আগে কখনও দাওনি, হঠাৎ সেদিন ওকে টকিং ডল কিনে দিয়েছ। তোমার মা ওকে নানারকম লোভ দেখিয়ে ও-বাড়িতে থেকে যেতে বলেন।

—ওয়েট ওয়েট ওয়েট! বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ শোনার পব উকিল ভদ্রলোক মাথা গলালেন—আপনারা আমার কথা একটু শুনবেন? একটু শান্ত হয়ে বসবেন ম্যাডাম?

সুদেষ্ণা রীতিমত রাগের সঙ্গে বসে পড়ল চেয়ারে।

—গুড! শুনুন তাহলে। আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন। এত কথাব পরও দিব্যি অমায়িক হাসছেন ভদ্রলোক—আমি আইনেব বাইবে গিয়েই বলছি, আপনার মেয়ে যদি প্রলুব্ধ হয়েই তার বাবার কাছে গিয়ে থাকতে চায় তাহলে কিন্তু বুঝে নিতে হবে মেয়ের ওপর আপনার নিজের কোন ইমোশনাল কন্ট্রোলই নেই। আর মেয়েরও আপনাব ওপর টান নেই তেমন।

—মানতে পারলাম না। সুদেষ্ণা সজোরে মাথা ঝাঁকাল—যে কোন শিশুকেই লোভ দেখানো খুব সহজ।

—মানলাম। কিন্তু শিশুরা মাকে ছেড়ে থাকতে পাবে না, এটাও তো সত্যি।

—পারবে না কেন? ওখানে বাবা, ঠাকুমা, পিসি সবাইকে পেয়ে যাবে যে।

—এই, এই তো পয়েন্টে এসে গেলেন। ভদ্রলোক হেসে উঠলেন শব্দ করে, —তাহলে স্বীকার করছেন বাচ্চার জীবনে মা ছাড়াও, বাবা ঠাকুমা পিসিদের কিছু ভূমিকা থাকে! রাইট?

না, এদেব সঙ্গে তর্ক কবে পারা যাবে না। রাগে, কষ্টে চোখে জল এসে যাচ্ছে। নিজেব উকিলের কাছে ডেকে এনে আপোসের নামে, ইচ্ছে করে তাকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছে চন্দন। এ এক ধরনের চক্রান্ত। কিছুতেই ফাঁদে পা দেবে না সে। গুম হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল সুদেষ্ণা। জিজ্ঞাসু মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন ভদ্রলোক। চন্দন ফস করে ধরিয়ে ফেলল হাতের ধরা সিগারেটটাকে। গলায় নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ—ওয়েল! ওর যখন নিজের সন্তানের ভালবাসার ওপরই আস্থা নেই, তখন তো আর কথাই চলে না।

—কেন চলবে না? ভদ্রলোক গলা নরম করে মধ্যস্থতায় নামলেন আবার, আপনি এগ্রি করলে ওই ক্লজটা বদলে ফেলা যায়।

—ঠিক আছে। চন্দন ভেবে নিল একটুখানি—তার বদলে অন্য ক্লজ রাখতে হবে।

—বলুন।

—কাস্টডি ওরই থাকুক। বিজনেস ডিল রদবদল করার সময় যেভাবে কথা বলে

মানুষ, চন্দনের মুখচোখে অবিকল সেই ভঙ্গি,—মেয়ে উইকে দু দিনের জায়গায় অ্যাটলিস্ট তিনদিন আমার কাছে থাকবে। ওর স্কুলের মাইনে আমি দেব। স্কুলের অফিসিয়াল গার্জেন হিসেবেও আমার নাম থাকবে।

উকিল ভদ্রলোক সুদেষ্ণার দিকে তাকালেন,—এনি অবজেকশন ম্যাডাম?

সুদেষ্ণা নীরব। চন্দনের ব্যঙ্গটুকু তীক্ষ্ণ তীর হয়ে বিঁধে গেছে বুকের ঠিক মাঝখানটাতে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঝিমলির ভালবাসার ওপরও কি সত্যি তবে আস্থা নেই তার? কারুর ভালবাসার ওপরই কি আছে? একদিন তো মনে হয়েছিল চন্দনের মতো ভাল আব কেউ তাকে বাসে না। আর আজ...

—কি হল ম্যাডাম? কিছু বলুন?

সুদেষ্ণা লম্বা শ্বাস টানল—আমাকে একটু ভাবতে দিন।

—ভাবুন। ততক্ষণে আমি সাত নাম্বারটা শুনিয়ে দিই।

সুদেষ্ণা শুনেও শুনল না। নিজের মনের সঙ্গে অন্য একটা আপোসের মামলা চলাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে সে।

—সাত নম্বর অনুযায়ী, পিটিশনার নাম্বার টু যেহেতু কর্মবতা. সেহেতু তিনি স্বেচ্ছায় ভরণপোষণের দাবি জানাচ্ছেন না। এবং ভবিষ্যতেও তিনি পিটিশনাব নাম্বার ওয়ানের কাছ থেকে কোনরকম অ্যালিমনি দাবি করবেন না।... কি হল, শুনছেন না?

—উঁ? সুদেষ্ণা চমকাল সামান্য।

—আপনি মন দিয়ে শুনছেন না। খোরপোষ প্রসঙ্গে বলছিলাম। এ ব্যাপারে আপনার কোন দাবি নেই তো?

—নাহ্। ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল সুদেষ্ণা। চন্দন তাব দিকেই সোজাসুজি তাকিয়ে আছে। চোখে তীব্র শ্লেষ। সেই শ্লেষ ক্রমে ছড়িযে পড়ল সুদেষ্ণার ক্লান্ত চোখেও। স্থির তাকিযে আছে দুই পিটিশনার। উকিল ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে পাতা ওল্টাচ্ছেন ড্রাফটের। টাইপিস্ট যুবকটি টাইরাইটার আস্তে সরালেও বেশ জোরে আওয়াজটা বেজে উঠল কানে। মাথার ওপর সিলিং ফ্যানটাও আচমকা মুখর। সেই মুখরতার সঙ্গে তাল রেখে উকিল ভদ্রলোকের গলা গমগম করে উঠল।

. —লাস্ট পয়েন্টটাও শুনে নেবেন নাকি?

এর পরও পয়েন্ট বাকি থাকে!

থাকে। আট নম্বর পয়েন্ট অনুযায়ী পিটিশনার নাম্বার টু, শুধুমাত্র তাঁর পিতৃগৃহ থেকে পাওনা যাবতীয় ফার্নিচার, গহনা এবং পোশাকাদি ইচ্ছে হলে ফেরত নিয়ে নিতে পারেন। এই সমস্ত জিনিস ডিভোর্সের ডিক্রি পাওয়ার পরই ফেরত নেওয়া যাবে।

পিটিশনার নাম্বার টু দুম করে খাপছাড়া প্রশ্ন করে বসল একটা।—ডিভোর্সের ডিক্রি ঠিক ছ' মাস পরেই পাওয়া যাবে তো?

—সারটেনলি। যদি সঙ্গে সঙ্গে আপনারা অ্যাপিয়ার করেন কোর্টে। ভদ্রলোক ফাইল বন্ধ করলেন— এই ছ' মাস কিন্তু আপনারা স্বামী-স্ত্রীই থাকছেন। বলতে বলতে অভিজ্ঞ হাসি হাসছেন ভদ্রলোক,—এর মধ্যে কিন্তু মিটমাটও হয়ে যায় অনেক সময়। হয়ত আপনাদেরও...

—ঠিক আছে। পিটিশনার নাম্বার টু কঠিন মুখে উঠে দাঁড়িয়েছে—কথা যেভাবে হল, ফাইনাল ড্রাফটটা আপনি সেভাবে করে রাখতে পারেন। আমি কাল পরশু এসে...

—এক মিনিট। পিটিশনার নাম্বার ওয়ানও প্রায় একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে—আট নম্বর পয়েন্টটা নিয়ে কিছু বলার আছে। ওই ওর জিনিসপত্র ফেরত নেওয়ার ব্যাপারটা। মানে আমি বলতে চাইছি ওর সব কিছু ও যত তাড়াতাড়ি ফেরত নিয়ে যায়, আমাদের সুবিধে হয়, এই আর কি।

—বেশ। তাই হবে। সুদেষ্ণা দরজার দিকে এগোল। চন্দনও বেরিয়ে আসছে পেছন পেছন। গেট পেরিয়ে, স্বামী-স্ত্রী নয়, দুই পিটিশনার জ্বলন্ত রোদ মাথায় রাস্তার দাঁড়িয়ে এখন।

নিজের নিজের রাস্তা ধরার আগে পরস্পরের চোখে চোখ রেখেছে আরেকবার। হয়ত এই শেষবার। চোখে চোখে ফেরত দেওয়া-নেওয়ার হিসেবটাকে আপ্রাণ শুষে নিতে চাইছে দুজনে। আপোসের শর্তগুলোকে মিলিয়ে নিতে চাইছে।

মিলছে না। কিছুতেই মিলছে না পুরোটা। আগাগোড়া হিসেবটাকে বার বার উল্টেপাল্টে তছনছ করে দিয়ে যাচ্ছে একটা সময়। সাত বছর এগারো মাস আট দিন।

নীল পাখি

বিন্দু থেকে রেখা, রেখা থেকে অবয়ব, ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল পাখিটা। সদাশিব টান টান হয়ে বসলেন,—এসে গেছে! এসে গেছে!

পার্কের বেঞ্চিতে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল কিশলয়ের। সদাশিবের স্বর শুনে ধড়মড় করে তাকালেন—কই? কোথায়?

—আসছে। আমি দেখতে পেয়েছি।

কিশলয় চোখ দিয়ে কুয়াশা হাতড়াচ্ছেন। শীতের ঠিক শুরুতে এ সময়ে চারদিকে বড় ধোঁয়াটে আস্তরণ। একটু দূরের কোনও কিছুই এখন ভাল করে ঠাহর হয় না। সূর্য পুরোপুরি ওঠার আগে পর্যন্ত বৃক্ষের সারি ছায়া ছায়া থাম হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। রহস্যময় আড়ালের মতো। ভারী কুয়াশার চাপে তাদের বিবর্ণ পাতারা আরও মলিন এখন। শান্ত দিঘির বুকেও থম মেরে আছে হিমবাষ্প। পথঘাট ভিজে। স্যাঁতসেঁতে।

সেই ভিজে পথ বেয়ে উড়ে আসছে নীল পাখি। কুহেলি মুছে মুছে।

কিশলয় কিছুতেই দেখতে পাচ্ছিলেন না তাকে। ইদানীং চোখ দুটো তাঁর একদমই গেছে। ছানি।

বিড়বিড় করে কিশলয় প্রশ্ন করলেন,—আপনি ঠিক দেখছেন তো?

সদাশিবের চোখও কুয়াশায় স্থির,—হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ। ওই তো বাঁক নিল এবার।

কিশলয়ের গলায় অভিমান ফুটল,—আজ বড় দেরি করল।

সদাশিব শিশুর মতো ঠোঁট ফোলালেন,—যা বলেছেন। আজ বহুক্ষণ বসিয়ে রেখেছে আমাদের।

—আজ ওর সঙ্গে কথা বলব না।

—আমিও না।

দুই বৃদ্ধের কথার ফাঁকে আরও কাছে এসে গেছে নীল পাখি। রাস্তা টপকে ভিজে ঘাসে স্পোর্টস শু ঘষল,—হাই! গুডমর্নিং। কতক্ষণ?

কিশলয় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। সদাশিব চোখ ফেললেন দিঘির জলে।

নীল পাখি সামনে এসে হাত ঘোরাল,—ব্যাপারটা কি, অ্যাঁ? কী হয়েছে তোমাদের? এরকম শব্দজব্দ মুখে বসে আছ কেন?

মাথার ওপর কর্কশ শব্দ করে একটা কাক শিরীষ গাছ ছাড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকালেন কিশলয়। সদাশিবের চোখ দিঘির পাড়ে।

—আরে তোমরা রাগ করেছ, মনে হচ্ছে?

—করেছিই তো। সদাশিব ফস করে প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেললেন,—এত দেরি করার মানেটা কি?

নীল পাখি ঝিরঝির হাসল,—সরি। এক্সট্রিমলি সরি। কাল লেটনাইট মুভিটা দেখে শুতে শুতে এত রাত হয়ে গেল। দেখেছ বইটা?

—কী বই? সদাশিব কৌতূহল চাপতে পারলেন না।

—ওয়ান ফ্লু ওভার দা কুক্কুজ নেস্ট। মিলোজ ফোরম্যানের। ফ্যান্টাসটিক। দ্যাখোনি তোমরা?

কিশলয় হিংস্র রকমের টিভি-বিদ্বেষী। বাড়িতে টিভি নিয়ে রোজই তাঁর যুদ্ধ চলে। নাতিনাতনির সঙ্গে। ছেলে ছেলের বউ-এর সঙ্গে। গিন্নির সঙ্গেও। তাঁর মতে টিভি এক উদ্দণ্ড বিশৃঙ্খলা। সারা জীবন শৃঙ্খলাকে আদর্শ হিসেবে মেনে এসেছেন তিনি। বেল কোম্পানিতে কাজ করেছেন পঁয়ত্রিশ বছর, একদিনও খাতায় লাল দাগ পড়তে দেননি। কিশলয় মিত্তিরের অফিসে ঢোকা নিয়ে অফিসের ঘড়ি মেলানো হত। চিরটাকাল লাইন দিয়ে বাসে উঠেছেন, নেমেছেন, কেউ কক্ষনো তাঁকে হুড়োহুড়ি ধাক্কাধাক্কি করতে দেখেনি। বাড়িতেও নিয়ম নিয়ে তাঁর কড়া অনুশাসন। রাস্তার আলো জ্বললেই ছেলেমেয়েকে বাড়ি ঢুকতে হবে। সকাল-সন্ধে ঘড়ি ধরে তিন ঘণ্টা বই নিয়ে বসতে হবে। ঠিক সময়ে খাওয়া। ঠিক সময়ে খেলা। ঠিক সময়ে ঘুম। এত নিয়মনিষ্ঠ লোকের সংসারেই এখন শৃঙ্খলা জিরো। ওই টিভিব দৌলতে। ঘরের ভেতরেই এখন দিবারাত্র নাটক-যাত্রার অবিরাম মোচ্ছব। আটষট্টি বছরের বুড়িটা পর্যন্ত নাতিনাতনির গলা জড়িয়ে বসে সকাল-সন্ধে খ্যামটা নাচ দেখছে। কিশলয় এখন নখদন্তহীন সিংহ। সংসারের ফালতু।

তবু কিশলয় সুযোগ পেলেই গজগজ করেন,—চব্বিশ ঘণ্টা ওই ধ্যাতাং ধ্যাতাং বাক্সনাচ তোমাদের ভাল লাগে?

পঞ্চাশ বছর ঘর করা সহধর্মিণী নির্বিকার খোঁচা মেরে যান,—এত হিংসে কেন, অ্যাঁ? নিজে চোখে দ্যাখো না বলে আর কেউ দেখলে বুঝি হাড়ে লঙ্কাবাটা লাগে?

সদাশিব আবার কিশলয়ের ঠিক উল্টোটি। তিনি একদম টিভির পোকা। রঙিন পর্দার সামনে বসলে নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ভুলে যান। স্ত্রী গত হওয়ার পর নেশাটা আরও চড়েছে। নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা, ট্রেন লেটের খবর, কোনও কিছুই তিনি দেখতে ছাড়েন না। একদা পোস্টমাস্টার ছিলেন, অবসর সময়ে তাস দাবা খেলে কাটাতে ভালবাসতেন। খেলার সঙ্গীরা অনেকেই এখন ওপারে পাড়ি দিয়েছেন। ফলত টিভিই এখন তাঁব গয়া কাশী রোম।

সদাশিবের এই নেশা নিয়ে বহুদিন বিদ্রূপ করেছেন কিশলয়, তবু আজ তাঁর মনে কেমন যেন খেদ জাগছিল। সদাশিবটা কি জিতে গেল আজ? ওই অসামাজিক নেশার সুবাদে?

না। সদাশিবও জেতেননি। তিনি মাথা দোলাচ্ছেন,—নাগো, আমার দেখা হয়নি। আজকাল আর মোটে রাত জাগতে পারি না। হজমের গোলমাল হয়।

নীল পাখি খিলখিল হেসে উঠল,—ইশ, তোমরা একেবারে বুডঢা বনে গেছ!

কিশলয় তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—বুড়ো তো হয়েছিই। আমি সেভেনটি সিক্স। অ্যাণ্ড হি ইজ ওয়ান ইয়ার সিনিয়ার টু মি—সাতাত্তর।

—মোটেই না। সদাশিব হাঁ হাঁ করে উঠলেন,—আমি পঁচাত্তর।

—কী করে হয়। আপনি কত সালে রিটায়ার করেছেন?

—সেভেনটি এইটে। আপনার এক বছর পর।

—সে তো আপনি দুবছর এক্সটেনশান ম্যানেজ করেছিলেন।

—ম্যানেজ করেছিলাম মানে? পি এম জি স্পেশালি আমার নাম এক্সটেনশানের জন্য রেকমেণ্ড করেছিল। বাট ফর ইওর কাইণ্ড ইনফরমেশান, আমি এক্সটেনশান নিইনি।

—বললেই হল? হরিসাধন নিজে আমাকে বলেছে আপনি দিনরাত আপনাদের পি এম জির অফিসে গিয়ে ঝুলোঝুলি করতেন!

—বাজে কথা। একদম বাজে কথা। হরিসাধন একেব নম্বরেব মিথ্যোবাদী।

দুই বৃদ্ধের গলা চড়ছে ক্রমশ, নীল পাখি চোখ পাকাল.—অ্যাই অ্যাই, তোমরা থামবে? সামান্য একটা বিষয় নিয়ে শিশুদের মতো ঝগড়া, ছিঃ! ওঠো তো?

—কোথায়?

—আমার সঙ্গে জগিং করবে না? নীল পাখি সদাশিবের দিকে তাকাল,—তোমার ওই ইলডাইজেশান ফিলডাইজেশান সব হাওয়া হয়ে যাবে। শরীরটাকে একটু নাড়াও দেখি। খাচ্ছদাচ্ছ, পড়ে পড়ে ঝিমোচ্ছ, এতে শরীর ফিট থাকে?

সদাশিব মিনমিন করলেন,—আমরা কি পাবব? এই বয়সে?

—খুব পারবে। বয়স আবার একটা ফ্যাক্টর নাকি? আমি তোমাদের বলেছি না নিজেকে বুড়ো ভাবাটা একটা সংস্কার। বয়স ভাবলে আছে, না ভাবলে নেই।

কিশলয় তবু পিছু হটতে চাইছেন,—দৌড়টা কি শুরু না করলেই নয়? আমরা তো এখন আর বেঞ্চিতে এসে চুপচাপ বসে থাকি না ভাই। যতটা পারি হাঁটি, তোমার কথামতো।

—ওই হাঁটা! টিকু টিকু করে সরকারি অফিসের ফাইলের মতো। ফুঃ! ওঠো বলছি। ওঠো। আজ থেকে জগিং স্টার্ট।

নীল পাখির হাতের টানে উঠে দাঁড়িয়েছেন দুই বৃদ্ধ। নবীন ত্বকের ছোঁয়া পেয়ে ধীরে ধীরে রক্তকণিকারা চঞ্চল যেন। শরীর জুড়ে চনমন চনমন।

কিশলয় তোতলা মুখে জিজ্ঞাসা করলেন,—লাঠিটা নিয়ে দৌড়ব?

—আজ্ঞে না। ওটা ওই শিরীষ গাছের ডালে ঝুলিয়ে দাও। আর এই যে মশাই, উল্টোদিকে তাকিয়ে লাভ নেই, তুমিও ওই বাঁদুরে টুপিটা খোলো। এখনই এমন কিছু শীত পড়েনি যে ওরকম সঙ সেজে থাকতে হবে! এসো এসো।

নীল পাখি লঘু ছন্দে দৌড় শুরু করেছে। তার পিছনে টলতে টলতে দৌড়নোর চেষ্টা করছেন দুই বৃদ্ধ। পারছেন না। জীর্ণ হয়ে আসা স্নায়ু অস্থি মজ্জা সব একসঙ্গে বিদ্রোহ করছে। হাত ঝুলে গেল। কোমর বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। হাঁটু ভগ্নপ্রায়। শ্বাস দ্রুত। রুগন শালিকের মতো ঘাস ভাঙছেন ছিয়াত্তর আর সাতাত্তর।

নীল পাখি তাঁদের উড়তে শেখাচ্ছে। নতুন করে।

দুই

সদাশিব আর কিশলয়ের সঙ্গে নীল পাখির আলাপ খুব বেশি দিনের নয়। মাত্র দিন দশেকের।

রোজকার মতোই সেদিনও গাঢ় কুয়াশায় ডুবে ছিল প্রথম সকাল। আধোজাগা পথঘাট নির্জন। নিঝুম। তবু হঠাৎ হঠাৎ কোথথেকে যে ছিটকে আসে এক-একটা গাড়ি। দুর্বার গতিতে ভোরটাকে ছিঁড়ে দিয়ে চলে যায় মুহুর্মুহু।

দুই বৃদ্ধ কিছুতেই রাস্তা পার হতে পারছিলেন না। যতবার ফুটপাথ থেকে পা বাড়ান, ওমনি তুফান গতিতে তেড়ে আসে যন্ত্রযান। ত্রস্ত দুই মানুষ ঝাঁ করে আবার ফুটপাথে।

তখনই যেন কোথথেকে হঠাৎ উড়ে এল পাখিটা। দুই বৃদ্ধের একেবারে গায়ের পাশে। কানেব কাছে রিনরিন সুর বেজে উঠল,—এ মা! তোমরা কুমীর-তোর-জলকে-নেমেছি খেলছ কেন?

সদাশিব বা কিশলয় কিছু বোঝার আগে দুজনকে ডানায় সাপটে ধরে রাস্তা পার হয়েছিল নীল পাখি। তারপর পার্কের বেঞ্চিতে বসে কলকল কলকল। কত গল্প! কত গল্প! তোমরা বুঝি রোজ ভোরবেলা বেড়াতে আসো? ও, বেশিদিন আসছ না? মাত্র মাসখানেক? বাহ। বাহ। ঠিক করেছ। এমন সুন্দর সকাল, চিকচিক করে পাখিরা জেগে উঠছে, কোথথাও একটুও পেট্রল ডিজেলের গন্ধ নেই, চারদিকে শুধু মিস্ট্রি মিস্ট্রি আর মিস্ট্রি, এখন কেউ বাড়িতে বসে থাকতে পারে? দ্যাখো দ্যাখো, আকাশটা কেমন রং বদলাচ্ছে! আমি তো বাবা একদিনও সকালটাকে মিস করি না। রোজ জগিং করতে চলে আসি। বাস্কেটবল খেলি তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভীষণ দম লাগে। ভীষণ —ভীঈঈষণ। পুরো পার্ক চক্কর মেরে তবে থামি। পুরো আট চক্কর। না না, আমাকে আগে দেখবে কী করে? আমরা তো এখানে থামতাম না। বাবা দিল্লি থেকে বদলি হয়ে এল তো, তাই আমরাও...। উঁহু, এখানে বসে নো অফিসের গল্প, নো বাড়ির গল্প। তোমরা জান না এখন ওই সব কথা তুললে নির্মল বাতাসে পল্যুশান এসে যায়। ওমা, তাহলে কী করবে মানে? বসে বসে পাখির ডাক শোনো। জলের শব্দ শোনো। বুক ভরে নিশ্বাস নাও। কোথাও কোনও নতুন ফুল ফুটল কিনা তার তত্ত্বতালাশ করো। বসে থেকো না শুধু। হাঁটো। ছোটো।

সদাশিব আর কিশলয় মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন। শুনছিলেন আর দেখছিলেন। আহা, কী নরম তুলতুলে শরীরটা! কচি আমপাতার মতো। কোমল ত্বকে জীবনের সমস্ত রূপ রং রস গন্ধ যেন জমাট বেঁধে আছে। এর একটু স্পর্শেই বুঝি লোলচর্ম মিলিয়ে গিয়ে ফিরে আসে সুদূর যৌবনের উত্তাপ। তাজা বাতাসের ঝলকে সতেজ হয় হৃৎপিণ্ড। ফুসফুস।

সেই বাতাস বুঝি আচমকাই ফুরিয়ে আসছিল এখন। সদাশিব জিভ বার করে দাঁড়িয়ে পড়লেন, —ওফ্ দম বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি আর পারছি না।

নীল পাখি অনেকটা উড়ে গিয়েছিল, সহসা ফিরে তাকিয়েছে। চেঁচিয়ে উঠল, —কেয়া হো গিয়া ভাই? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

কিশলয় আজ আর দাঁড়াতেও পারছিলেন না। স্থানকালপাত্র ভুলে ভিজে ঘাসে থেবড়ে বসে পড়লেন। তাঁর বুকের শীর্ণ খাঁচা ঠেলে ঠেলে উঠছে—আবার ঢুকে যাচ্ছে। হাপরেব মতো।

নীল পাখি কাছে এসে দুহাতে টেনে তুলল কিশলয়কে। আদর করে সদাশিবের নাক টিপে দিল, —আমার মিষ্টি বন্ধুরা! তোমরা দেখছি শরীরের কলকজ্জাগুলোতে এক্কেবারে জং ধরিয়ে ফেলেছ। বলতে বলতেই নিচু হয়ে বিচিত্র কায়দায় কিশলয়ের হাঁটুতে চাপ মারল বারকয়েক, সদাশিবের কোমরে খ্যাট খ্যাট দু'তিনটে ধাক্কা। দুজনের মুখের খুব কাছে মুখ এনে সুগন্ধী বাতাস ছড়াল কয়েক পল,—ফিলিং ওয়েল? এবারে ওঠো। আজ একটা পুরো বাউণ্ড দিতেই হবে।

সদাশিব অনুনয় জুড়লেন, —আজ তো অনেকটাই এলাম। আজ এটুকুই থাক।

—উঁহু. নো ফাঁকি। গতকালও ঠিক এই কথাই বলেছিলে। তোমরা কিন্তু কথার খেলাপ করছ।

—কাল ঠিক ফুল রাউণ্ড দেব। প্রমিস।

কিশলয় কায়দা করে কাঁধ ঝাঁকানোর চেষ্টা করলেন, —কাল একটা কেন. দুটো চক্কর দিয়ে দেব। ও না পারুক, আমি দেব। ওয়ার্ড অব অনার।

পালক পালক ভুরু তুলে নীল পাখি নিরীক্ষণ করল দুজনকে,— তা তো হবে না। যো কাল করো সো আজ করো, যো আজ করো সো আভি। কেউ কোনওদিন আগামী কাল দেখতে পায়? যদি আজই পৃথিবীটা ধ্বংস হযে যায়, তাহলে তো তোমাদের এই একটা চক্কর বাকিই থেকে যাবে।

কিশলয় হতাশ মুখে শ্বাস ফেললেন। সদাশিব মনে মনে একটু শিউরে উঠলেন যেন।

নীল পাখি দু দিক থেকে দুজনেব হাত চেপে ধরেছে। খুব আস্তে আস্তে শুরু হয়েছে দৌড়। একটু একটু কবে নবীন প্রাণের উল্লাস আবারও ছড়িযে পড়ছে দুই বৃদ্ধশরীরে। দৌড়চ্ছেন সদাশিব। দৌড়চ্ছেন কিশলয়। দৌড়চ্ছে নীল পাখি। তাদের দৌড়ের ছন্দে গাছগাছালির ঝিমধরা ভাব কেটে যাচ্ছে ক্রমশ। তীব্র শীতের দাপট ম্লান হয়ে এল। টলটল শব্দে হেসে উঠল স্থির দিঘির জল।

সহসা দুজনকে ছেড়ে দিয়ে প্রভাতী পথচারীদের টপকে নীল পাখি ছুট্রে চলে গেছে বহু দূর। এক জারুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলে-পরানো ধনুকের মতো বেঁকাচ্ছে শরীরটাকে। মিহি সুরে ডেকে উঠল,—সদাআআশিব... কিশঅলয়...

দুই বৃদ্ধের বুক শিরশিরিয়ে উঠল। কে ডাকে তাঁদের নাম ধরে? এত দিন পরে? এভাবে?

বিমোহিত দুই বৃদ্ধ গুটি গুটি পায়ে এগোলেন।

—অ্যাই, তোমার বয়স কত?

—বন্ধুর আবার বয়স কী? আমি এজলেস, জন্মের হিসেবে যদিও আঠেরো।

—তুমি আমাদের নাম ধরে ডাকছ যে! জানো আমরা তোমার থেকে কত বড়? ষাট বছরের!

—হাহ, ষাট বছর! মাত্র? পৃথিবীর বয়স যেখানে কোটি কোটি বছর সেখানে মাত্র ষাট বছরেব তফাতে কি আসে যায়?

—যায় না?

—ভাবলে যায়, না ভাবলে যায় না। এই যে জারুল গাছটা, এর বয়স কিছু না হোক পঞ্চাশ বছব, একে কি আমি কাকু বলে ডাকব নাকি? আর ওই দামড়া মেহগনি গাছটাকে জেঠু? এই পুকুরেব জলটাকে যদি মাসি বলে ডাকি কেমন লাগবে? হিহি। হিহি। বন্ধুদের নাম হল একটা আইডেন্টিফিকেশান। ডাকারই জন্যে. বুঝলে?

দুই বৃদ্ধ দুলে গেলেন খুশিতে। তখনই সূর্য উঠল।

তিন

—একি, আজ আপনি পাজামা যে। তাও আবার বঙিন!

—এটা পাজামা নয়, ট্র্যাকস্যুট। ডোবা দেখে বুঝছেন না।

—নাতির বুঝি? চুরি করে পরলেন?

সদাশিব ধূর্তেব মতো ঠোঁট টিপলেন,—কাল যে আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে বড় নাতনির চকরাবকরা পুলওভারটা পরেছিলেন, তার বেলা? চলুন চলুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সদাশিব প্রায় বাড়ির সামনে থেকে দৌড় শুরু কবতে যাচ্ছিলেন, কিশলয় তাঁকে পিছন থেকে টেনে ধরেছেন,—করছেনটা কি! পাড়ার লোকে দেখলে যে ঢিল ছুঁড়বে!

—ছুঁড়ুক। আমি কেয়ার করি না। কাটিয়ে বেরিয়ে যাব। কাল রাত্তিরে কটা রুটি খেয়েছি জানেন? ছটা। বৌমার তো চোখ কপালে উঠে গেছিল। পাত্তা দিইনি। ঘুম থেকে উঠেই অল ক্লিয়ার। নো ইশবগুল। নাথিং। বেরোনোর সময় ছেলে প্যাট প্যাট করে দেখছিল, কোনও দিকে না তাকিয়ে বেরিগে এলাম।

—ঠিক করেছেন। পাত্তা দিলেই পেয়ে বসে। কিশলয সদাশিবকে ধরার জন্য হনহন করে রাস্তা পার হলেন, —আমারও বুঝলেন, ক্ষিধেটা খুব বেড়ে গেছে। গিন্নি বিশ্বাস করতে চায় না। বলে এটা নাকি পেটের ক্ষিধে নয়, চোখের ক্ষিধে। ছেলে আবার মায়ের ওপর আরেক কাঠি। বলে বাবাকে জোর করে ডাক্তার দেখাও। এই ক্ষিধে নাকি জিয়ার্ডিয়ার কেস। শাকসব্জি ফলমূল কোনও কিছুই নাকি আমি খাচ্ছি না। খাচ্ছে আমার পেটের পোকারা। খেয়ে খেয়ে তারাই নাকি আমার পেটের ভেতর কেঁদো হচ্ছে! কাল ছেলেকে এমন দাবড়ানি দিয়েছি।

কথায় কথায় দুই বৃদ্ধ পৌঁছে গেছেন পার্কে। শীত কমে এসেছে। শেষ মাঘের হাওয়ায় তার অন্তিম কামড়টুকু লেগে আছে শুধু। এবারে ঠাণ্ডা খুব জাঁকিয়ে এসেছিল।

শৈত্যপ্রবাহে লোকও মরেছে কিছু। শুধু এই দুই বৃদ্ধ তুড়ি মেরে পার করে দিয়েছেন হিমেল দিনগুলোকে। হাঁপানি নেই, জ্বরজারি নেই, সর্দিকাশি নেই, দুজনেই এবার ফুরফুরে। নির্ভার। দ্বিতীয় যৌবনের সুরায় বেসামাল।

বেঞ্চির কাছে এসে থমকে গেলেন কিশলয়,—নীল পাখি তো আসেনি দেখছি!

সদাশিব টুক করে বসে পড়লেন,—হয়ত এসেছে। রাউণ্ড মারছে।

কিশলয় সদাশিবকে ঠেললেন,—বসলেন যে বড়!

—আপনিও বসুন না। ও আসুক, তিনজনে একসঙ্গেই দৌড়ব।

—ওই ছুতোয় দম নিচ্ছেন? এটুকু এসেই টায়ার্ড!

—টায়ার্ড? আমি? তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠলেন সদাশিব,—চলুন তো, দেখি কে আগে হাঁপায়।

শরীরে দু'তিনটে মোচড় দিয়ে জগিং শুরু করলেন দুজনে। দুটো শরীর দুলে দুলে চলেছে পাশাপাশি। মুঠো করা হাত চক্রাকারে ঘুরছে। দিঘিটাকে বাঁয়ে রেখে একটার পর একটা গাছ পার হচ্ছেন ছিয়াত্তর আর সাতাত্তর।

চলন্ত সদাশিব ঘাড় ঘোরালেন,—আপনি আবার গিন্নির কাছে ব্যাক-ব্যাক করে সব বলে ফেলেননি তো?

—মাথা খারাপ!

—কী জানি, কাল আপনার গিন্নি যেরকম সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আমি ভাবলাম হয়ত বা আপনি প্রেমের ঝোঁকে...

—ক্রস করছে না তা নয়, করছে। নিজে বুড়ি হয়ে গেছে তো, তাই আমাকে এত ফ্রেশ দেখে জ্বলেপুড়ে মরছে। আমি সেদিন শুনিয়ে দিয়েছি, তোমাদের টিভির ওই কোমরদোলানি নাচ আমিও নাচতে পারি।

—শুনে কী বললেন?

—বলবে আবার কী। চোখ ট্যারা। জগিং করতে করতেই কিশলয় একটু ঝাঁকিয়ে নিলেন নিজেকে,—যাই বলুন, আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো কিন্তু বেড়ে নাচে।

হা হা করে হাসতে হাসতে এক পাক পুরো করলেন দুই বৃদ্ধ। ফাঁকা বেঞ্চির ধারে এসে মাথার ক্রিকেট ক্যাপটা খুলে ফেললেন কিশলয়, —একি! এখনও আসেনি!

সদাশিবের কপালেও চিন্তার ভাঁজ, —ব্যাপারটা কি বলুন তো? এত দেরি তো করে না বড় একটা।

—কাল বলছিল না, ওর দাদার কোন বন্ধু নাকি আসছে দিল্লি থেকে?

—বলেছিল নাকি? আমার মনে নেই।

—আমার মনে হচ্ছে যেন বলেছিল। কিশলয়ের ছানি ধরা চোখে চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল,—সে ছোকরা ওর প্রেমিকটেমিক নয় তো?

সদাশিব পলকের জন্য গম্ভীর, পরক্ষণের বাঁধানো দাঁত ছড়িয়ে হাসছেন,—বাহ, লাভার টাভার থাকলে কি আমাদের বলত না? আর সেরকম কেউ থাকলে আমাদের পাত্তা দিত নাকি?

উত্তরটা বেশ মনে ধরল কিশলয়ের। দু হাতের আঙুল চালিয়ে ঠিকঠাক সাজিয়ে নিলেন পাতলা চুলগুলোকে।

টাকমাথা সদাশিবের নজর এড়াল না দৃশ্যটা, খানিকটা ব্যঙ্গের সঙ্গেই বললেন, —আপনার চুলগুলো তো সব আবার সাদা হয়ে গেল মশাই! আরেকবার কলপ লাগাবেন না?

কিশলয় শুনেও না শোনার ভান করলেন। নীলচে কুয়াশায় তবু ভাসছে শব্দগুলো। কী কুক্ষণেই না সেদিন মাথা কালো করার শখ হয়েছিল কিশলয়ের! বাড়িসুদ্ধ লোক হেসে কুটিপাটি। গিন্নি রেগে টং।

কিশলয় বেপরোয়ার মতো বলেছিলেন, —তোমার এত শখ থাকতে পারে, আমার একবার চুলের রং বদলানোর সাধ হতে পারে না?

গিন্নি ঝামটে উঠেছিলেন, —জীবন গেল গামছা পরে, এখন বুড়ো বয়সে খাখরা! একে বলে ভীমরতি—ভীমরতি! তা চুনটাই বা বাকি থাকে কেন? ওটাও দুগালে লাগিয়ে নাও, ষোলকলা পূর্ণ হোক।

তা যার জন্য ওভাবে লাজ মান বিসর্জন দেওয়া সেও বা সেভাবে তারিফ করল কই! তোমাকে সাদা চুলেই বেশি সুন্দর দেখায় কিশলয়! মুখ ফুটে কিশলয় কি তখন বলতে পারেন কোন গোপন ঈর্ষায় পুড়ে তাঁর ওই মতিভ্রম? তাঁর তুলনায় সদাশিবের চেহারাটা অনেক বেশি শক্তপোক্ত। চর্বি বেশি বলে চামড়াও ফুটিফাটা হয়নি কিশলয়ের মতো। তাই না নীল পাখি অত হেসে হেসে ঢলে পড়ে সদাশিবের গায়ে।

সদাশিবও বোঝেন সে কথা। বোঝেন বলেই বুঝি আবাব পিন ফোটাচ্ছেন, —গতবার ডাইটা ভাল হয়নি। এবার বিউটি পার্লার থেকে করে আসুন। দেখবেন নীল পাখি আপনাকে ছেড়ে নড়তেই চাইবে না।

—চাইবে নাই তো! কিশলয় দপ করে জ্বলে উঠলেন, —আমি তো আর আপনার মতো টেকো নই। নিজের মাথার চুল নেই বলে জেলাসি।

—জেলাসি? হোঃ! কঠোর সত্যটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন সদাশিব। দিঘির ওপারে।

গোমড়া মুখে বসে আছেন দুজনে। আপনমনে হামা টানছে শিশুসূর্য। শুকনো পাতা ঝরছে টুপটাপ। দিঘির জল ছেয়ে যাচ্ছে গোলাপী আভায়। বেলা ফুটছিল।

বেশ খানিকক্ষণ পর সদাশিব কথা বললেন,—আরে মশাই, এত রেগে গেলেন কেন? চলুন, আরেকটা চক্কর মেরে আসি।

কিশলয় তবু ঘাড় গোঁজ করে আছেন,—আপনি যান। আমি যাব না।

—আরে চলুন চলুন। সদাশিব টুপিটা এগিয়ে দিলেন,—নীল পাখি যদি এসে দ্যাখে আমরা বসে আছি তাহলে কী ভাববে বলুন তো?

—কী আবার ভাববে। ভাববে ওর জন্য ওয়েট করছি!

—মোটেই না। ভাববে আমরা বুড়ো হয়ে গেছি।

—অসম্ভব। ও যদি আমাদের বুড়ো ভাবে...। কিশলয় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন, —আবার তাহলে শুরু করা যাক।

সূর্য উঠে পুরনো হয়ে গেল। দুই বৃদ্ধ ছোটার ছন্দে উন্মন তখনও। নীল পাখি সেদিন আর এল না।

চার

নীল পাখি আর এল না।

বসন্ত এসে গেল।

গাছে গাছে নতুন পাতারা হাসছে এখন। পুরনো পাতা কখন যে ঝরে গেছে আনমনে। শীত এখন অতীতের স্মৃতি।

নীল পাখি আর এল না কোনওদিনই।

ভোরেব নরম বাতাস দু হাতে সরিয়ে দৌড়চ্ছিলেন দুই বৃদ্ধ। তাঁদের পায়ের চাপে শুকনো পাতারা মড়মড় ভাঙছিল। উঁকি দেওয়া ঘাসফুল সাক্ষী রেখে ধীর লযে ছুটছেন সদাশিব। দিঘির বুকে তিরতির কাঁপন জাগিযে পাশে পাশে ছুটছেন কিশলয়। এক পাক। দু পাক। চার পাক। প্রতিটি পাক শেষ কবে শূন্য বেঞ্চির সামনে এসে থামছেন দুজনে। লম্বা বাতাস ভরে নিচ্ছেন ফুসফুসে। নতুন করে। আবারও।

নীল পাখি আসবে। নীল পাখি আসবে।

কানাকড়ি

—আমরা ঠিক কটায় বার হবো বাবা?

—কোন জামাটা পরবো? পুজোর কেনাটা?

—কিসে যাবো গো আমরা? বাসে? না অটোতে?

—ফেরার সময় কিভাবে...

সকাল থেকেই উত্তেজনায় ছটফট করছে ছেলেমেয়ে দুটো। এভাবেই। বার বার দৌড়ে আসছে সুব্রতর কাছে। হাজার রকম জিজ্ঞাসা তাদের। লক্ষ কৌতূহল।

—আচ্ছা বাবা, সেই মাসিটার বাড়ি কি খুউব বড়? আমাদের মোড়ের মাথার গোলাপী বাড়ির চেয়েও?

—দূর বোকা। মাসি নয়। পিসি বল।

—না। আমি মাসিই বলবো।

—কেন বলবি? মা তখন কী বলে দিলো? মাসি না—পিসি, পিসি।

—আমি মাসি বললে তোর কী?

মুখ ভেংচে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মুন্নি। পেছনে তাকে তাড়া কবে বাবলা। সুব্রতর হাসি পেয়ে গেল। ওফ, স্বপ্না পারেও বটে। একেই বলে ছেলেমানুষির একশেষ। যেন ওরা পিসি বলে ডাকলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সমস্যা? না সন্দেহ? নাকি আশঙ্কা? হায়রে নারীর মন। গলা চড়িয়ে স্বপ্নাকে ডাকতে গিয়েও সামলে নিলো সুব্রত। থাক বাবা। নতুন করে খ্যাপানোর দরকার কী? বহু সাধ্যসাধনার পর যেতে রাজি হয়েছে। প্রথমদিকে সে কি গোঁ।

—তোমার বড়লোক বান্ধবীর বাড়ি তুমি যাবে যাও; আমি কী করতে যাবো?

—আহা, আমাকে তো একা যেতে বলেনি। তোমাকে অনেক করে নিয়ে যেতে বলেছে।

—ব্যস, ওমনি আমি হ্যালহ্যাল করে ছুটবো? ভাবলে কী করে একথা?

—ওভাবে নিচ্ছো কেন? তুমি গেলে ওদেরও একদিন এখানে আসার জন্য ইনভাইট করা যাবে।

—কোনো দরকার নেই। আমি গরিব মানুষ। দুটো মাত্র ঘরে কোনো রকমে ছেলেপুলে নিয়ে মাথা গুঁজে আছি...

—কী মুশকিল! এর মধ্যে গরিব বড়লোক আনছো কেন? আলাপ করে দ্যাখোই না... মেয়েটা মোটেই...

—থাক। আর মেয়েটা মেয়েটা করে ভদ্রমহিলার গুণ গাইতে হবে না।

বাপরে। সুযোগ পেলেই যা সব চোখা চোখা বাক্যবান ছুঁড়ছিল স্বপ্না। এক সময় তো সুব্রতর মনে হয়েছিল, ধ্যাততোরি মরুকগে যাক। কাউকে নিয়ে যাবে না। একাই চলে যাবে। কথা যখন দিয়ে এসেছে... এর মধ্যে হঠাৎই কী করে যেন মত বদলে ফেললো স্বপ্না। কেন বদলালো। নিছকই কৌতূহল। নাকি জয়তীকে একবার চাক্ষুষ

যাচাই করে নেবার বাসনা! কে জানে!

খবরের কাগজ মুড়ে রেখে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সুব্রত। হাই তুললো বড় করে। বালিশের তলা হাতড়ে বার করলো সিগারেটের প্যাকেটটা। ধুস শালা। খালি। এখন আর উঠে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না। ছুটির সকালগুলোয় এমন আলস্য আসে। নড়াচড়া করতেও ভালো লাগে না। কপালটাও এখনও অবধি ভালোই। এখনও তিনি মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে হাওয়া বিলিয়ে চলেছেন। কখন তিন ঠ্যাং ছড়িয়ে স্ট্যাচু হবেন ঠিক কী! এই সুন্দর মুহূর্তে আরেক কাপ চা পেলে মন্দ হতো না। চাইলে কি স্বপ্না খুব বিরক্ত হবে? থাক গিয়ে। কাল থেকে বেচারার যথেষ্ট পরিশ্রম যাচ্ছে। অ্যাজ ইউজুয়াল ঠিকে ঝি ডুব। সকালবেলা বাসন মেজে, ছেলেমেয়েকে খাইয়ে, ঘরটর ঝেড়ে রান্নায় বসেছে। ঘটাং ঘটাং মশলা বাটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট। তার থেকে বরং নিজেই একটু পরে উঠে গিয়ে দুকাপ বানিয়ে ফেলবে। স্বপ্না হয়তো তোষামোদ ভাবতে পাবে। ভাবলে কী আর করা।

সুব্রত শরীরটাকে বারকয়েক উল্টেপাল্টে নিলো বিছানায়। মাথার মধ্যে ভাবনাগুলোও তাল বেতাল। এত বছর পর জয়তীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে কে জানতো! সেএ এএই জয়তী। সেএ এএই। ক্যান্টিনের পেছনে বসে, ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফুক ফুক গাঁজায় টান দিতো। হাসতে হাসতে যাসব খিস্তি দিতে পারতো, শুনলে কান লাল হয়ে যাবে লোকের। কফি হাউসের বেয়ারাদের অবলীলায় শিস দিয়ে ডাকতো। কিছু বললেই চোখ পাকাতো গোল করে।

—এসব করার তোরাই কি একচেটিয়া ইজারা নিয়ে রেখেছিস নাকি?

শৈবাল বলতো,—তা না। সুন্দরী মেয়েদের ঠিক এসব করলে মানায় না।

—সুন্দর ছেলেদের বুঝি মানায়? রাখ তো যতসব শভিনিস্ট কথা!

সেই মেয়ের দুম করে বিয়ে হয়ে গেল একদিন। ফাইনাল ইয়ারে পড়ার সময়। তার কয়েক মাস পরে নাটকীয় প্রস্থান। আমেরিকায়। ডাক্তার বরের হাত ধরে। শৈবাল ঠাট্টা করে বলতো,—হাত ধরে নয়, স্টেথো ধরে। তারপর... তারপর... তারপর আবার এতদিন পর দেখা। একেবারে ফিল্মি টেকনিকে।

বাস স্টপে তখন অফিস ছুটির পর দাঁড়িয়ে সুব্রত। কিছুটা ক্লান্ত, কিছুটা বিরক্তও। এসপ্লানেড ইস্টে দুপুরে কাদের ডেপুটেশন ছিল, চারদিক তখনও জ্যাম। বহুক্ষণ গড়িয়ার বাস আসছে না। ঠিক তখনই হুবহু হিন্দি ফিল্মের স্টাইলে গায়ের ধারে ইয়া এক কনটেসা। রাজহাঁসের মতো। ভেতর থেকে মহিলাকণ্ঠ,—আরে এই... এই যে আপনি... মানে এই তুই সুব্রত না!

মেয়েরা পারে। হ্যাঁ, মেয়েরাই বোধহয় পারে এভাবে চিনে নিতে। কিম্বা শুধু জয়তীরাই। স্বপ্না অবশ্য মুখ বেঁকিয়ে ছিল খানিকটা। তারপরই কঠিন জেরা। জেরার পর জেরা। দুঁদে ব্যারিস্টারের মতো।

—কই, এর কথা তো কোনোদিন বলোনি আগে?

—বলবো কী করে? যোগাযোগ কোনো থাকলে তো। আজ প্রায় কুড়ি বছর পর...

—তুমিও সঙ্গে সঙ্গে হ্যাংলার মতো তার বাড়িতে চলে গেলে?

—দূর! ও-ই জোর করে নিয়ে গেল আমাকে। বাপ, কিছু বড়লোক হয়েছে এখন। দেখে একেবারে চক্ষু চড়ক গাছ।

—দেখতে কেমন? সুন্দরী নিশ্চয়ই?

—বলতে পারো। এক সময় সত্যি দারুণ অ্যাট্রাকটিভ ছিল। কত ছেলে যে লাইন মারার চেষ্টা করেছে। ...এখন কেমন গোলগাল হয়ে গেছে। তবে ওর মেয়েটাকে দেখলে, তখন কেমন ছিল, কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে।

—তুমি লাইন মারোনি?

—কী যে বলো! ও আমাদের খুব বন্ধু ছিল। আমার। শৈবালের। ওর সঙ্গে প্রেম করার কথা... আমরা কোনোদিন...

—অত ও-ও করছো কেন? নাম নেই মহিলার? হুঁহ।

শেষ জেরাটা করার সময় এমন একটা মুখ করেছিল স্বপ্না, যেন সেইমাত্র তার স্বামীটি হাইজ্যাকড হয়ে গেল।

সুব্রত আরেক দফা হেসে নিলো। একা ঘরে বিছানা ছেড়ে পাশের ঘরে উঁকি দিলো। ছোট্ট ফালি ঘরে মাদুর বিছিয়ে বাবলা মুন্নি হোমটাস্ক করছে। তাই সাড়াশব্দ নেই এতক্ষণ। নির্ঘাৎ স্বপ্না বিকেলে না নিয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়েছে। ওদের পেরিয়ে অন্য দরজাটা দিয়ে ভেতরের ঘেরা বারান্দায় এলো। এক কোণে উনুন জ্বালিয়ে রান্না সারছে স্বপ্না। মাথা নিচু করে রুটি বেলছে। রাত্রের জন্য। চারদিকে ছড়ানো হাঁড়ি কড়া থালা বাটি শিলনোড়া প্রেসারকুকার। পাম্প দেওয়া কেরোসিন স্টোভখানা একবারে শুকনো পড়ে। মাসখানেক ধরে কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না। লম্বা লাইনে দীর্ঘ সময় দিতে পারলে যাও বা দু'চার ফোঁটা পাওয়া যায়...। দূর, এভাবে আর চলতে পারে না! এবার একটা গ্যাসের দরখাস্ত করতেই হবে। প্রথমটা খরচ একটু বেশি... তা হোক... সুব্রত মোড়া টেনে বউয়ের সামনে বসে পড়লো।

—এত রুটি করছো কেন? বিকেলে তো ওখানে...

স্বপ্না মাথা তুললো না। কপাল, পিঠ, গলা সব ঘামে ভিজে জবজবে।

সুব্রত ঢোক গিললো,—কয়েকটা অবশ্য করে রাখা ভালো... বিকেলে যখন যাবো বলেছি...

এবার চোখ দুটো সামান্য উঠলো মাত্র।—ওখানে শুধুহাতে যাবে?

—কেন?

—একেই বলে পুরুষের বুদ্ধি। স্বপ্নার ঠোঁটে বাঁকা হাসি,—পুরনো বান্ধবীর বাড়ি বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে চলেছো, কিছু নিয়ে যেতে হবে না?

—কী নিয়ে যাওয়া যায় বলো তো?

—সে তুমি জানো।

সুব্রত পিঠ সোজা করলো,—সত্যি তো, কিছু একটা হাতে করে নিয়ে যাওয়া উচিত। আচ্ছা ওর মেয়ের জন্য ক্যাডবেরি-ট্যাডবেরি...

—মেয়ে তো বেশ বড় বললে। স্বপ্না পুরোপুরি মুখ তুললো এতক্ষণে,—সতেরো, আঠারো বছরের ধাড়ি মেয়ের জন্য কেউ চকোলেট নিয়ে যায় নাকি?

—তাহলে?

—তোমার বান্ধবী কী পছন্দ করে?

—কী করে বলবো? সুব্রতকে রীতিমত চিন্তিত দেখালো,—ওরা এত বেশি বড়লোক... যাই নিয়ে যাবো—

—বড়লোক তো কী আছে? স্বপ্না চাটু বসালো উনুনে,—আমাদের যা ক্ষমতা...

—তা ঠিক। এক বাক্স মিস্টি নিয়ে গেলেই হবে।

—শুধু মিষ্টি?

—তাছাড়া কী? পনেরো বিশ টাকার মিষ্টিই যথেষ্ট। সুব্রত মাথা ঝাঁকালো—তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে। এখন এক কাপ চা হবে?

ফিক করে হেসে ফেললো স্বপ্না.—কেন, বন্ধুর কথা এত ভেবেও তেষ্টা মিটছে না?

শব্দ করে হেসে উঠলো সুব্রত, আলগা একটা রসিকতা করতে গিয়েও সামলে নিলো নিজেকে। মুন্নি বাবলা উঁকি মারছে ঘর থেকে।

দুই

বড়লোক ভেবেছিল। এত বড়লোক কে জানতো! টানা উঁচু হলুদ পাঁচিলের দুপ্রান্তে দুটো বিশাল বাদামি গেট। ভেতরের লাল রাস্তা অর্ধচন্দ্রকারে এক গেট থেকে অন্য গেটের দিকে চলে গেছে। ফাঁকা জায়গা জুড়ে মনোরম বাগান। বাগান নয়, যেন সবুজ পারস্য গালিচা। লাল হলুদ বেগুনি ফুলের নক্সা তোলা। পাঁচিলের গা ঘেঁষে ভেতরে ছোট বড় বৃক্ষের সারি। দেবদারু, পাইন, কাঁঠালি চাঁপা, বকুল, কদম। গেটের এপাশে আসার পর থেকেই কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল স্বপ্না। ঘোর ঘোর লাগছিল সব কিছু। সুব্রত দিব্যি নির্বিকার। মুন্নি বাবলার হাত ধরে বেশ স্বচ্ছন্দে আগে আগে হাঁটছে। গাড়িবারান্দা থেকে ওপরে ওঠার জন্য আট-দশটা শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। সিঁড়ির দুধারে বাহারি গাছের টব। শৌখিন গুল্মলতা। ঝকঝকে সাদা ঢাকা বারান্দাটা এত মসৃণ যে মনে হয় পা পিছলে যাবে। ডিম্বাকৃতি কাচের দরজা ঠেলে ভেতরের হলঘরে ঢোকার আগে চটি খুলতে যাচ্ছিল স্বপ্না. জয়তী হাঁ হাঁ করে উঠলো।

—না না, চটি খুলতে হবে না।

বন্ধু এসেছে খবর পেয়েই একেবারে গেটের কাছে ছুটে এসেছিল। সেই থেকে স্বপ্নার হাত যে ধরেছে, ধরেই আছে। চল্লিশ ছোঁয়া শরীর একটু ভারির দিকে হলেও এখনও যৌবন সতেজ, দেখে স্বপ্নার ছোট বৈ বড় মনে হয় না। চওড়াপাড় টাঙ্গাইল শাড়ি আর একঢাল খোলা চুলে অনেকটা দেবীপ্রতিমার ভাব। গা থেকে খুব হাল্কা একটা মিষ্টি গন্ধ উঠছে। বেশি বড়লোকেরা বোধহয় বাড়িতেও দামী পারফিউম মাখে। নাকি ঐশ্বর্যের আলাদা সৌরভ থাকে! কে জানে? জড়সড় স্বপ্না আঁচল টানলো পিঠে।

সাউথ ইণ্ডিয়ান সিল্ক বার বার বড় খসে পড়ে গা থেকে। এর থেকে সুতি পরে এলেই ভালো হতো।

স্বপ্নাকে একেবারে সোফায় এনে বসিয়ে দেবার পর হাত ছেড়েছে জয়তী,—তোমাকে কিন্তু তুমিই বলছি ভাই। কিছু মনে করছো না তো?

—না. না। স্বপ্না আড়ষ্ট হাসি হাসলো, —আপনি ওর বন্ধু...

—রাইট। তুমি আমাদেব সেই দি গ্রেট সুব্রতর বউ। সেই বিচ্ছু সুব্রত। জয়তীর ভবাট গালে ছোট্ট ছোট্ট দুটো টোল পডলো। ঘুরে তাকালো সুব্রতর দিকে,—তুই দাঁডিযে বইলি কেন? বোস।

—তুই তো আমাকে আর পাত্তাই দিচ্ছিস না। সুব্রত কাঁধ ঝাঁকালো—আমার বউকেই আদর কবতে ব্যস্ত।

—না তো কী তোকে আদর কববো?

খিলখিল হেসে উঠলো জযতী। হাসতে হাসতে দেওযালের দিকে গিযে পুট পুট—গোটা দুয়েক ফ্যান চালিযে দিলো।

প্রকাণ্ড হলঘরটাব সাইজ স্বপ্নার গোটা বাড়িটাব সমান প্রায়। এত বড় একটা ঘব শুধুই নিচেব ড্রযিংরুম। চারদিকের দেওয়াল দামী ওয়ালপেপাবে মোড়া। মাঝখানটা জুড়ে পুরু কার্পেট। গাঢ় মেরুন কার্পেটে কাশ্মীবি কারুকাজ। রাজকীয় সোফাগুলো দূরে দূরে হলেও সংঘবদ্ধ সাজানো। একটা গোটা দেওযাল-জোড়া সুদৃশ্য ক্যাবিনেটে টিভি. স্টিরিও. আরও আবও কত বকম যে শো-পিস। দু'কোণে মিনে করা দুটো পেতলের ফুলদানি। পট হোল্ডাবে পাতাবাহাব। না. শুধু পয়সা থাকলেই হয় না! এমন সুন্দর করে ঘর সাজানোব জন্য রুচি থাকাবও প্রয়োজন। কিম্বা প্রচুর টাকা থাকলে তবেই সাজানো যায় এভাবে। দুই বন্ধুব কথাব ফাঁকে চারদিকে আলগোছে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল স্বপ্না। বেশি নরম সোফায় নড়তেও অস্বস্তি। সব সময় কেমন ডুব ডুব ভাব। মুন্নি-বাবলারও এক দশা। অনভ্যস্ত গদিতে ভাইবোন কাঠ-কাঠ। একটু কুঁজোও যেন।

বন্ধ জানলাব কাচ সব খুলে দিযে ওদেব দুজনেব মধ্যিখানে গিয়ে বসে পড়েছে জযতী। বাবলাব গাল টিপে মুন্নিকে কোলেব কাছে টানলো।

—কি মিষ্টি হযেছে বে তোব ছেলেমেয়ে দুটো... কী নাম তোমাদের?

সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নাব দুই ছেলেমেয়ে লজ্জায অধোবদন।

—কিগো. আমাব সঙ্গে ভাব করবে না? জযতী মুন্নির থুতনি ধরে মুখটাকে ওঠানোব চেষ্টা কবলো.—তাকাবে না আমার দিকে?

মুন্নিব ঘাড় আবও ঝুলে গেল।

এবাব বাবলাব কাঁধে হাত বেখেছে জয়তী,—তোমার নামই শুনি তবে।

অদ্ভুত বোকা বোকা হাসি হাসছে বাবলা। মুখ অল্প হাঁ।

ইস। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করলো স্বপ্না। ছেলেমেয়ে দুটো জাযগা বিশেষে এমন ক্যাবলা হয়ে যায়। এমনিতে সাবাক্ষণ তো খই ফুটছে মুখে। স্বপ্নার গলায় হালকা ধমক এলো—কী হলো? নাম বলো তোমাদের? কথা বলতে জানো না?

সুব্রত হ্যা হ্যা করে হেসে উঠলো.—মাসিকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে। সরি। মাসি না তো পিসি।

মুহূর্তে স্বপ্নার স্বর আরও কঠিন—কী হলো বাবলা? শুনতে পাচ্ছো না?

বাবলা বারকয়েক মোচড় দিলো শরীরে। আড়চোখে কয়েক পলক দেখলো বাবা মা'কে।

জয়তী কপট অভিমান ফোটালো ঠোঁটে, —থাক. ওরা যখন নিজেদের পরিচয় দেবেই না তখন না হয়...

—ছিঃ বাবলা. তুই এত বোকা? নিজের পরিচয় দিতেও জানিস না?

এবার কাজ হলো। নিশ্বাস বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো বাবলা. বড় করে ঢোক গিলে অবিকল পড়া মুখস্থ বলার ভঙ্গিতে বলে উঠলো।—আমার নাম শ্রীমান অনিলকান্তি মজুমদার। বাবার নাম শ্রীসুব্রতকুমার মজুমদার।

—ও মাগো। কী সুন্দর করে বলছে... জয়তী হেসে লুটিয়ে পড়লো. —ও বাবারে কী সুইট... কোন ক্লাসে পড়ো তুমি?

—ক্লাস থ্রি বি।

—স্কুলের নাম?

—স্বামী বিবেকানন্দ পাঠভবন।

—বোনের পরিচয়?

—বোনের নাম কুমারী স্বাগতা মজুমদার। ও ক্লাস ওয়ান...

বাবলা গড়গড় করে বলেই চলেছে। জয়তী হেসে কুটিপাটি। যেন সার্কাসের জোকার দেখে মজা পাচ্ছে। স্বপ্না মুখ ঘুরিয়ে নিলো। ছেলেটাকে ব্যাগি স্যুটটা না পরালেই হতো। ঢলঢলে পোশাকে বিশ্রী গেঁয়ো ভূতের মতো লাগছে। মেয়েটাকেও লাল ঘাগরা না পরিয়ে স্মার্ট কোনো ফ্রক পরানো উচিত ছিল। সুব্রতর ওপর রাগ হলো মনে মনে। আগে একটু লক্ষ করে বলতে পারতো তো? নিজেও একটা পাজামা-পাঞ্জাবি পরেছে দ্যাখো! আধ-ময়লা। আত্মসম্মানবোধ বলে কিছু যদি থাকে। আয়েস করে বসে আবার টান দিচ্ছে সিগারেটে। অসহ্য। ভেতরকার রাগটাকে তাড়াতে আচমকা উঠে দাঁড়ালো স্বপ্না। চকিতে জয়তীর হাসিখুশি চোখ তার দিকে।

—কী হলো গো? গরম লাগছে খুব, তাই না? দাঁড়াও এসিটা চালিয়ে দিতে বলি। বলেই গলা ওঠালো,— সুকুমার... এই সুকুমার...

—না, না। গরম লাগছে না। স্বপ্না তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিলো নিজেকে। —এমনিই একটু... বলতে বলতে বসলো আবার,— আপনার মেয়েকে দেখছি না?

—ওর কথা আর বোলো না ভাই। কলেজের তিনটে বন্ধু এসেছে, তাদের সঙ্গে ওপরে ভিডিও দেখতে বসেছে। দাঁড়াও ডাকছি।

—থাক না, পরে ডাকিস। সুব্রত ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে বসলো.—তোর কর্তা আজ বাড়ি আছে তো? নাকি রোববারেও...

—দুপুরেও ছিল, জানিস! এই একটু আগে নার্সিংহোম থেকে এমার্জেন্সি কল এলো একটা। হুড়মুড় করে...

—কোথায় যেন বলেছিলি নার্সিংহোমটা?

—ওর নিজেরটা কাছেই। বালিগঞ্জে। তবে এখন গেছে সেই পি জি হসপিটালের'

কাছে। ওখানে ওদের কয়েকজন বন্ধুর একটা পলিক্লিনিক মতন আছে।

—আজও তাহলে দেখা হবে না বলছিস? তোর স্পেশাল... থুড়ি... স্পেশালিস্ট বরের সঙ্গে?

—কী জানি। জয়তী উদাস সামান্য, দ্যাখ হয়তো এসে যেতেও পারে। আর ভাল্লাগে না, জানিস! চব্বিশ ঘণ্টা শুধু হসপিটাল, নার্সিংহোম আর চেম্বার। আজই বোধহয় অনেকদিন পর বাড়িতে টানা কয়েক ঘণ্টা ছিল...

—ইস, আপনাকে তাহলে সারাদিনই একাই থাকতে হয়? ফস কবে বলে বসলো স্বপ্না। বলেই এক ধরনের চোরা তৃপ্তি পেল মনে.—আমার তো বাবা, ও সন্ধের পর আধ ঘণ্টা দেবি করলে মেজাজ খাবাপ হয়ে যায়।

—কী করবো বলো। কপাল। জয়তীব হাসি ম্লান।

স্বপ্না সোজা হয়ে বসলো—সত্যি। এ ভারি অন্যায়। ওর একবার একটা খুব বড় চাকরির অফাব এসেছিল, জানেন! বাঙ্গালোরে। বিরাট ফার্নিশড কোয়ার্টাব। গাড়িটাড়ি সব দিতো। আমি রাজি হলাম না। ওখানে গেলে সারাক্ষণ শুধু ফ্যাক্টরি আর লেবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। মাঝখান থেকে বিদেশ-বিভূঁয়ে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে একা একা...

নির্দ্বিধায় মিথ্যে কথা বলে চলেছে স্বপ্না। সুব্রত যে হতচকিত চোখে তাকিয়ে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কোনো। বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত ভাব নেই আর।

—ঠিক করিনি, বলুন?

—বেশ করেছো। জয়তীর গালে আবার দুটো টিপটিপ টোল, —কখখনো অ্যালাও কববে না। বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে,—তোমরা একটু বোসো. কেমন? আমি এক্ষুণি আসছি।

জয়তী কি মিথ্যেটা ধরতে পেরেছে! স্বপ্নার কথাগুলোকে তেমন পাত্তা দিলো না যেন! নাকি মনে মনে হিংসে...! স্বপ্না একটুও তাকালো না সুব্রতর দিকে। গোল কাচের টেবিলের তলা থেকে ম্যাগাজিন টানলো একটা। পরিষ্কার টের পাচ্ছে সুব্রত এখনও অবাক চোখে তাকিয়ে। থাকগে যাক. সুব্রতর প্রাসঙ্গিক কোনো জিজ্ঞাসার আগেই গলাব স্বর সম্পূর্ণ অন্যরকম করে ফেললো। মুন্নির দিকে তাকালো চোখ পাকিয়ে—,—এই, ওকি অসভ্যব মতো বসা? পা নামিয়ে সোজা হয়ে বোসো!

বাবলার মুখে কথা ফুটলো—কী বড়লোক মাসিটা... পিসিটা... তাই না মা?

—চুপ. আস্তে।

—ওই জানলার ধাবটায় একটু যাবে মা? ধীরে ধীরে মুন্নি স্বাভাবিক চঞ্চলতায় ফিরছে, —ওই দ্যাখো মা, ছবিটা কী সুন্দর! ওটা কিসের ছবি গো?

স্বপ্না আড়চোখে সুব্রতর দিকে তাকালো। সোফার পিঠে মাথা ঠেকিয়ে নতুন করে সিগারেট ধরিয়েছে। আচমকা ছেলে-ভোলানোর মতো বলে উঠলো,—তোমার বন্ধু কিন্তু সত্যিই খুব সুন্দর।

—হুঁ...

—ঠিক বলেছো মা, কী চকচকে গা—তাই না?

—আর কী সুন্দর মিষ্টি গন্ধ গায়ে! তাই নারে দাদা? আমাকে যখন আদর করছিল...

সুব্রত ছেলেমেয়েব দিকে একবার তাকিয়েই টেরচা চোখে দেখছে স্বপ্নাকে। স্বপ্না উঠে পেছনের জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। একটা মালিগোছের লোক মোযার দিয়ে ঘাস ছাঁটছে। ওদিকে মনে হয চাকরবাকরদের থাকার জায়গা। লম্বা মতন একাটি হিন্দুস্থানী বউ বাচ্চা কোলে বাঁদিক থেকে ডানদিকে হেঁটে গেল। বোধহয় ড্রাইভার-ট্রাইভারের বউ। দোতলা থেকে হিন্দি গানের সুর ভেসে আসছে। আবছা ভাবে হাসির শব্দও শোনা গেল যেন। এমন একখানা প্রাসাদের মতো বাড়ি করতে নিশ্চযই কয়েক লক্ষ টাকা খরচা হয়েছে! কতগুলো মোট ঘর আছে! এত বড বাডিটাতে তিনটে মাত্র প্রাণী থাকে!

এলোমেলো টুকটাক ভাবনায় স্বপ্না মশগুল যখন. জয়তী ফিরেছে ঘবে—পেছনে কাজেব লোকের হাতে বড এক ট্রে। স্বপ্না মুহূর্তে সপ্রতিভ.—সর্বনাশ! এতসব কী করেছেন? এত কে খাবে?

—মোটেই এত না। জযতী নিজে ট্রে থেকে নামিয়ে প্লেট সাজাচ্ছে টেবিলে, —তোমরা প্রথমদিন আমাব বাড়িতে এসেছো—

—বাপরে, এ তো দেখছি রাজকীয় আয়োজন! সুব্রত কথা বলছে অনেকক্ষণ পব,—প্রথমদিন আমাকে তো এত কিছু খাওয়াসনি। সেদিন তো শুধু...

—সেইজন্যই তো তোর জন্য আজ স্পেশাল ব্যবস্থা। জয়তী ঠোঁট টিপলো, —মনে আছে, কলেজ ক্যান্টিনে মাংসর চপ খাওয়ানোর জন্য কী রকম ঝুলোঝুলি করতিস! এই নে তোর চপ।

জযতী প্লেটভর্তি খাবার তুলে বন্ধুব দিকে বাড়ালো,—দ্যাখ তো, কেমন হয়েছে? আমি নিজে করেছি।

—ক্যান্টিনের সেই স্বাদ কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে রে? তবে তুই যখন নিজে হাতে বানিয়েছিস—সুব্রত হ্যাংলার মতো কামড় বসালো চপে,—আহ, ডিলিশাস! এগুলো সব কি তোর নিজের হাতে বানানো—এই কেক, রসমালাই, বাটারফ্রাই সব?

—উহু। চপটা শুধু আমি করেছি। আর সব কাজের লোকেরা। জয়তী ছোট ছোট দুটো সাইড টেবিল রাখলো মুন্নি বাবলার সামনে,—কি গো অনিন্দ্য? স্বাগতা তোমরা আগে আইসক্রিমটা খাবে, না আগে খাবার?

—আইসক্রিম! মুন্নি তড়াক করে সোফা থেকে নেমে টেবিলের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখাদেখি বাবলাও। ছি ছি, কী লোভী লোভী চোখে তাকিয়ে আছে দ্যাখো খাবারের দিকে! ছি! স্বপ্নার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করলো। এত করে শিখিয়ে নিয়ে এসেছিল...। বিরক্ত মুখে ঝুঁকলো ছেলেমেয়েদের দিকে। গলায় কঠিন শাসন,—না মুন্নি, তুমি একদম আইসক্রিম খাবে না। কদিন আগেই গলা-ব্যথা হয়েছিল, ভুলে গেছো?

—তাই নাকি। জয়তী চোখ ঘুরিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে—না না, তাহলে তো আইসক্রিম বাদ। ঠিক আছে, তার বদলে ক্যাডবেরি. কেমন?

মুন্নি বাবলা দুজনেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। সুব্রতও। মুন্নির গলা-ব্যথা হয়েছিল বটে—সে প্রায় মাস দুয়েক আগে। কথাটা বলে ফেলে স্বপ্নার নিজেরই খারাপ লাগছে। ছেলেমেয়ে দুটো এত আইসক্রিম খেতে ভালোবাসে। ঠিক আছে, সে না হয় বলতে হয় তাই বলে ফেলেছে. সুব্রত তো ইচ্ছে করলেই ব্যাপারটা সামলে দিতে পারে। কেন দিচ্ছে না?

জয়তী এবার অ্যানব্রেকেবল প্লেট ধরেছে স্বপ্নার সামনে,—চা করতে বলবো? না কফি? কী পছন্দ করো?

—আমি কিন্তু এত কিছু খাবো না। স্বপ্না দু'হাত নাড়লো জোরে জোবে,—অনেক বেলায় খেয়েছি।

একথাটা অসত্য নয়। সব কাজ সেরে খেয়ে উঠতে দুটো বেজেছে আজ। রান্নাঘর ধুয়ে, বাসনকোসন মেজে উঠতে উঠতে তিনটে। তারপরই তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়া। একটুও বিশ্রাম পাওয়া যায়নি। অন্যমনস্কতার ভান করে ঘড়ি দেখে নিলো স্বপ্না। সাড়ে ছটা প্রায় বাজতে যায়। গ্রীষ্মের বিকেল বলে বেলা বোঝা যাচ্ছে না। গরম গরম খাবারের গন্ধে ক্ষিধেও যেন পাচ্ছে অল্পস্বল্প।

—ঠিক আছে। তোমার যা ইচ্ছে হবে, তাই খাও।

জয়তীর ইশারায় কাজের লোকটা একটা খালি প্লেট রেখে দিলো বড় টেবিলে। সুব্রত গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে। বাবলা-মুন্নিও ট্রেতে সাজানো কাঁটা চামচের ধার ধারছে না কেউ। স্বপ্না ছুরি কাঁটা দিয়ে বাটারফ্রাই তুলতে গিয়েও তুললো না। থাক, কোনো কারণে হাত স্লিপ করে না উঠলে চূড়ান্ত লজ্জা। তার থেকে ববং...ইচ্ছেকে সংযত করে আলাতোভাবে একটা কেক তুলে নিলো মাত্র। পুরো প্লেটটা নামিয়ে দিলো সামনে।

—ব্যস।

—সে কী? আব কিছু নেবে না? রসমালাই একটু খাও?

—না ভাই, একদম পারবো না। বিশ্বাস করুন। ঢক ঢক করে পর পর দু'গ্লাস জল খেয়ে ফেললো স্বপ্না। মুখখানা এমন করলো, যেন জল দিয়ে ধুয়ে ফেলছে ভেতরকাব সব লজ্জা, সঙ্কোচ, হ্যাংলামি—কিম্বা সমস্ত রকমের হীনমন্যতা, জড়তা, গ্লানি।

জয়তী তবু অনুরোধ করে চলেছে। সুব্রত, বাবলা, মুন্নি তিনজনেই হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার দিকে। স্বপ্না দেখেও দেখলো না। কাউকেই।

তিন

কনটেসার বিলাসী আসনে বসে মুন্নি-বাবলা যেন উড়ে যাচ্ছে স্বর্গরাজ্যের দিকে। দুজনেরই চোখে ঝিকমিক খুশির আলো। দুরন্ত বাতাসে চুল উড়ছে ক্ষুদে পাখিদের ডানার মতো।

—গাড়িটা ঠিক পক্ষীরাজের মতো, তাই নারে দাদা?

—যাহ, পক্ষীরাজ কেন হতে যাবে? এই গাড়িটার নাম কনটেসা। তাই না বাবা?

সামনেব সিট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে সুব্রত ছেলেমেয়েদের দেখলো। মাঝখানে স্থির বসে থাকা স্বপ্নাকেও। গাড়ি চলতে শুরু করার পর থেকে এখনও পর্যন্ত একটাও শব্দ উচ্চারণ করেনি। কেমন যেন নিথর বসে আছে। কী যে হয় মাঝে মাঝে! ওখানে তো বেশ কথা বলছিল। একটু বেশিই বলছিল বলা যায়। বানিয়ে বানিয়ে যতসব উল্টোপাল্টা কথা কেনই বা বলছিল।! কমপ্লেক্স। এখনও কি জয়তীর সম্পর্কে সন্দেহ রয়ে গেছে আগের মতো! মেয়েদের মন কখন যে কোন স্রোতে যায়! নাহ, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না সুব্রত। জিজ্ঞাসাও করতে পারছে না কিছু। ড্রাইভার শুনে ফেলবে।

জয়তীর গাড়ি নিঃশব্দে তবতব এগিয়ে চলেছে। ছুটির সন্ধেতে রাস্তা আজ অনেক ফাঁকা। অন্যান্য দিনের চেয়ে। গাঙ্গুলিবাগান পেরিয়ে রামগড় টপকে গেল। এখনও অনেকটা পথ। গড়িয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে ডানদিকে ঘুরে বাঁশদ্রোণীর দিকে যেতে হবে। তারপরও বেশ কিছু অলিগলি। এতটা রাস্তা গিয়ে তাদের নামিয়ে ফাঁকা গাড়ি ফিরে আসবে আবার। কোনো মানে হয়? বারবার অনেকবার মানা করেছিল সুব্রত,—ছাড় তো। দরকার নেই। মিছিমিছি গাড়ির কী দরকার?

—ঠিকই তো। আমরা একটা ট্যাক্সি ধরে নেবো। স্বপ্না লাফিয়ে পড়ে লুফে নিয়েছিল কথাটাকে। অথচ স্বপ্নার, হ্যাঁ, এই স্বপ্নারই, যাবার সময় গড়িয়া থেকে ট্যাক্সি ধরতে কী আপত্তি.—কোনো দরকার নেই। অযথা গুচ্ছের মিটার উঠবে। তার থেকে অটোতে শেয়ারে যাওয়া ভালো। মুন্নি-বাবলাকে কোলে বসিয়ে নেবো।

সুব্রত হাওয়া বাঁচিয়ে সিগারেট ধরালো একটা। জয়তীটা ঠিক আগের মতোই আছে। একই রকম হুল্লোড়বাজ। প্রাণখোলা। কিছুতেই কোনো বারণ শুনলো না। ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বললো গ্যারাজ থেকে।

—একেবারে বাড়িতে সাহেবদের নামিয়ে দিয়ে আসবে, বুঝলে?

ছেলেমেয়ে দুটোর তখন কী যে আনন্দ! লাফিয়ে উঠে বসলো গাড়িতে,—আমি এই জানলাটার ধারে বসবো। তুই ওদিকে যা।

—না, আমি বসবো এদিকটায়। তুই ওদিকে যা।

স্বপ্না অযথা রেগে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে বাবলাকে বকে উঠলো—চলো বাড়ি চলো, হচ্ছে তোমাদের।

না। জয়তী বা জয়তীর মেয়ে কেউ দেখতে পায়নি ধমকানোর দৃশ্যটা। জয়তী তখন বাগান থেকে দুটো গোলাপ ছিঁড়ছিল মুন্নি-বাবলার জন্য। জয়তীর মেয়ে গাড়ির দরজা খুলে ঝিরঝির হাসছে।

—অল রাইট। টস হয়ে যাক, কে কোন দিকে বসবে!

জয়তীর মেয়েটাও বেশ হয়েছে। জয়তীর মতোই। শেষের দিকে মুন্নি-বাবলা তো প্রায় ভক্ত হয়ে উঠেছিল ওর। স্বপ্নাই শুধু বড় গম্ভীর গম্ভীর প্রশ্ন করছিল মেয়েটাকে—কী সাবজেক্ট নিয়েছ হায়ার সেকেণ্ডারিতে?

—কেন? সায়েন্স পড়লে না কেন?

সত্যি, স্বপ্নাটা না! সুব্রত জানলার বাইরে তাকিয়ে একটু হেসে নিলো। বাড়ি গিয়ে স্বপ্নাকে প্রচুর খ্যাপানো যাবে। ছেলের দিকে ঘুরে তাকালো। সেই ফাঁকে আলতোভাবে বউয়ের দিকেও।

—কিরে, তোরা এত চুপ মেরে গেছিস যে! মুন্নি কী করছে? মুনমুনিয়া?

—ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবলার আগে স্বপ্নার উত্তর।

—তোমারও কি ঘুম আসছে নাকি?

—কেন?

—সেন্সেবল হবার চেষ্টা করো। স্বপ্না চোখের ইশারায় ড্রাইভারকে দেখাচ্ছে।

এরপর বাকি রাস্তা চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায়ই বা কী! আনসান গল্প কিছু করা যায় অফিসের, বন্ধুবান্ধবদের। থাক—সুব্রত জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো বাইরের হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলো। নরম অন্ধকারটাকেই উপভোগ করা যাক বরং।

অন্ধকারে দেখা যায়নি। তালা খুলে, ঘরের আলো জ্বালানোর পর নজরে পড়লো। স্বপ্নার অতি প্রিয় আটশো টাকা দামের সাউথ ইণ্ডিয়ান সিল্কের কুঁচিতে আঁচলে ছোপ ছোপ ভিজে দাগ। শখ করে কেনা গুজরাটি ভ্যানিটি ব্যাগও ভেজা ভেজা।—একি, তোমার শাড়িতে কী লেগেছে! কিসের দাগ!

স্বপ্না নিরুত্তর। আলগোছে বাসন্তী শাড়ি খুলে ছুঁড়ে দিলো মেঝেতে। ব্যাগটাও।

বিস্মিত সুব্রত নিচু হয়ে তদন্তে নামলো, —মনে হচ্ছে রস পড়েছে! কোত্থেকে লাগলো?

স্বপ্না তবু চুপ। সুব্রতকে কী করে বোঝাবে জয়তীর জন্য কেনা মিষ্টির বাক্সটা ভ্যানিটি ব্যাগেই রয়ে গেছে। দেওয়া হয়নি। দেওয়া যায়ও না। ফেরার পথে সেই বাক্স থেকেই রস পড়েছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। গোটা পথ ব্যাগটাকে কোলে চেপে রেখেছে স্বপ্না প্রাণপণে। এক ফোঁটা রস যেন না লাগে জয়তীর কনটেসার সুখী সিটে। তার, সুব্রতর, তাদের গোটা পরিবারের শেষ অহঙ্কারটুকু জড়িয়ে ছিল ওই দাগ লাগা না লাগায়।

লাগেনি। স্বপ্নার দামী শাড়ি মেখে নিয়েছে সমস্ত দাগ।

আত্মহত্যার পরে

লাঞ্চ সেরে সবে অফিসে ঢুকেছে শ্যামলেন্দু, রিসেপশান কাউন্টার থেকে টেলিফোন অপারেটার মেয়েটি বলে উঠল, 'স্যার, আপনার বাড়ি থেকে তিন-চারবার ফোন এসেছিল।'

'এনি মেসেজ?'

'না স্যার। আপনি ফিরলেই মিসেস সেন সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ধরে দিতে বলেছেন—.

ধরে দেওয়া কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করল মেয়েটা, যেন শ্যামলেন্দু কোনো পলাতক আসামী। কিম্বা বন কি চিড়িয়া।

শ্যামলেন্দু হেসে ফেলল। সকাল থেকে মেজাজটা আজ তার ফুরফুরে হয়ে আছে। তিন সপ্তাহ টালবাহানার পর আজই মালহোত্রাদের ফাইলটা ছেড়েছেন এম. ডি। টেণ্ডার অ্যাকসেপটেড। মাথার কমপিউটারকে আরেকবার অন করে দিল শ্যামলেন্দু। আঠার লাখের ওয়ান পারসেন্ট। মানে আঠারোহাজার। সঙ্গে আজই বিকেলে ডিনার। তাজ বেঙ্গলে। এমন একটা শুভদিনে স্বপ্নার হাতে ধরা পড়াটা মোটেই কাজের কথা হবে না।

স্বপ্নার জরুরি দরকারের রকমফের জানে শ্যামলেন্দু। হয় গাড়ি পাঠিয়ে দাও, বেহালায় অনুরাধাদের বাড়ি যাব, নয় তাড়াতাড়ি চলে এস, মেজমামা এসেছেন অথবা নিউমার্কেট থেকে সাড়ে পাঁচটার সময় পিক-আপ করে নিও লক্ষ্মীটি। পনের বছর বিয়ে করা স্ত্রীর এর বাইরে আর কি-ই বা কথা থাকতে পারে স্বামীর সঙ্গে? একটা সময়ের পর বিবাহিত জীবন শুধুই কতগুলো অভ্যাস আর চাহিদা মাত্র। তবু এই মুহূর্তে সামনে দাঁড়ানো তন্বী মেয়েটির সঙ্গে একটু রঙ্গ রসিকতা করার সুযোগ হাতছাড়া করতেও ইচ্ছা হল না। রিসেপশান কাউন্টারের সামনে গিয়ে গলা নামাল শ্যামলেন্দু, 'ওয়ারেন্টটা কিরকম ছিল বলে মনে হয়েছে ম্যাডাম? বেলেবল? না ননবেলেবল?'

উত্তরে মেয়েটিও এক টুকরো মাপা হাসি উপহার দিল ডেপুটি পারচেজ ম্যানেজার শ্যামলেন্দু সেনকে. 'তা তো বলতে পারব না স্যার। তবে ম্যাডামকে খুব টেন্স মনে হচ্ছিল।'

রসিকতার সুর কেটে গেল। বাড়িতে কোনো বিপদ-আপদ হয়েছে নাকি? কোনো দুর্ঘটনা? বুবলার কিছু হল? নাকি ভবানীপুর থেকে মা-বাবার কোনো খারাপ খবর এসেছে?

অনেক কিছুই হতে পারে। আবার কিছুই না। স্বপ্না সবসময়েই ছোটখাটো ব্যাপারে অকারণে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কাজের লোকের সঙ্গে ঝগড়া হলেও...। অহেতুক উদ্বিগ্ন হওয়াটা মেয়েদের চারিত্রিক ধর্ম, 'ঠিক আছে, ঘরে দিয়ে দিন লাইনটা।'

শ্যামলেন্দু নিজের চেম্বারে ফিরল। প্রখর রোদ থেকে হিমশীতল ঘরে ফিরলে এক ধরনের নরম আরাম শরীরকে আলগাভাবে জড়িয়ে ধরে। চেয়ারে গা ছড়িয়ে আয়েস করে একটা সিগারেট ধরাল। দুটো টান দিয়েছে কি দেয়নি, পিপ পিপ শব্দ বাজিয়ে স্বপ্না এসে গেছে দূরভাষে, 'এই শোন, সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

সর্বনাশ! শ্যামলেন্দু পলকে টান-টান। যে কোনো কথাই স্বরের ব্যঞ্জনায় নিজস্ব গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। স্বপ্নার এখনকার সর্বনাশ মোটেই বুবলার অঙ্কে কম নম্বর পাওয়ার সর্বনাশ নয়। 'কি হয়েছে?'

'মালা সুইসাইড করতে গিয়েছিল। গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়েছে। বাথরুম ভেঙে বার করতে হয়েছে ওকে।'

শ্যামলেন্দু চকিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। নাহ, এই সংবাদের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না সে।

স্বপ্না বলে চলেছে, 'বোধ হয় বাঁচবে না। বিশ্রীভাবে পুড়ে গেছে।... হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ তুমি? হ্যালো-ও?'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য শ্যামলেন্দুর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্বিতে ফিরতে সময় লাগল আরও কয়েক সেকেণ্ড। বহু কষ্টে একটাই স্বর ফোটাতে পারল গলায়, 'কেন?'

'কেন কি করে বলব? ঘন্টাখানেক আগে ওর হোস্টেল থেকে ফোন এসেছিল। আমি সেই থেকে তোমাকে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

স্বপ্নার গলা থরথর করে কাঁপছে। শ্যামলেন্দু চোখ বুঁজে ফেলল।

'ওকে হসপিটালে নিয়ে গেছে। পিজিতে। আমি পাশের ফ্ল্যাটে বুবলার জন্য চাবি রেখে এখুনি বেরিয়ে পড়ছি। তুমিও চলে এসো, যত তাড়াতাড়ি পার।'

টেলিফোন কেটে যাওয়ার পরও শ্যামলেন্দু রিসিভার চেপে রইল কানে। যেন আরও কিছু কথা শোনার আছে। আরও কিছু কথা বাকি রয়ে গেল। অথবা এতক্ষণ ধরে যা শুনেছে তা সত্যি নয়। ভুল খবর দিয়ে স্বপ্না তাকে পরীক্ষা করতে চাইছে না তো?

মালা হঠাৎ এমন কাজ করে বসবে কেন? যথেষ্ট ধীরস্থির বুদ্ধিমতী মেয়ে। ক'দিন আগেই তো চাঁদিপুর বেড়িয়ে এল শ্যামলেন্দুর সঙ্গে। নিজে থেকেই এবার বলেছিল, 'দোলে পরপর তিনদিন ছুটি আছে শ্যামলদা। চল ক'দিন নির্জন সমুদ্রের ধারে ঘুরে আসি। সবসময় হোটেলের বন্ধ ঘর আর ভাল লাগে না।'

'নো প্রবলেম। চল।'

'প্রবলেম আছে মশাই। স্বপ্নাদিকে কি বলবে?'

'যা বলি। অফিস ট্যুর।'

'স্বপ্নাদি যদি আমার হোস্টেলে ফোন করে?'

'করবে না। তোমার খোঁজ নেওয়ার এখন ওর সময় নেই। বুবলার পরীক্ষা নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত। যদি করেও, অসুবিধে কি? হোস্টেলে বলে যাবে বাড়ি যাচ্ছ, মার কাছে। যেমন বল প্রতিবার।'

শেষে মালা গায়ে কেরোসিন ঢেলে! কেন?

টেলিফোন অপারেটার পি বি এক্স বক্স থেকে খুট খুট আও ...শয়. 'স্বপ্নার সঙ্গে

'কি... ...লছেন স্যার?'

...তে রাজী

চমকে উঠে শ্যামলেন্দু রিসিভার নামিয়ে রাখল। আঙুলে ধবে থ... পুড়ে পুড়ে বিশাল লম্বা একটা ছাই তৈরি করেছে। চেপে চেপে অ্যাশট্রেতে আগু নেভাল শ্যামলেন্দু। হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা জলের গ্লাসটাকে খামচে ধরল সজোরে। এক ঢোকে খেয়ে নিল পুরো জলটা।

বিবশ স্নায়ুগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। প্রাথমিক আঘাত কেটে যাওয়ার পর মন চেতনায় ফিরছে। মস্তিষ্কের কমপিউটার আপনা-আপনি অন হয়ে গেল। এবার? এরপর? কি কি ঘটতে পারে এখন? হয় মালা বাঁচবে, নয় মারা যাবে—স্বপ্নার কথা শুনে মনে হল মারা যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যদি মারা যায়, শ্যামলেন্দু কি ধরা পড়ে যাবে?

শ্যামলেন্দুর শিরদাঁড়া বেয়ে সহসা একটা কনকনে স্রোত বয়ে গেল। সুইসাইড কেস যখন, তখন নিশ্চয়ই পুলিশ এনকোয়ারি হবে। হয়তো ইতিমধ্যে শুরুও হয়ে গেছে। মালা কি সুইসাইড নোট রেখে গেছে কোনো? আমার মৃত্যুর জন্য আমার জামাইবাবু শ্যামলেন্দু সেন দায়ী এরকম কোনো? অসম্ভব। মালা তা করতেই পারে না। মালার একটা সরল আনুগত্য আছে তার প্রতি। অন্ধ ভালবাসা। শ্যামলেন্দু জানে।

শ্যামলেন্দু আরেকটা সিগারেট ধরাল। মালা কি এখন সজ্ঞানে আছে! ছিল! কথা বলতে পারছে! মৃত্যুর আগে মানুষ নাকি সবসময় সত্যকে প্রকাশ করে দিয়ে যেতে চায়। ডাইয়িং ডিক্লারেশন না কি যেন বলে। পুলিশ না হোক, ওর হোস্টেলের কাউকে বলে থাকতে পারে কিছু। কিম্বা যে শোরুমে কাজ করে সেখানকার কোনো বন্ধুকে। মারা যাওয়ার আগে স্বপ্নাকেই হয়তো বলে ফেলল সব কথা।

শ্যামলেন্দুর আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট টিপটিপ কেঁপে উঠল। এয়ার কন্ডিশনড ঘরে বসেও ঘামছে প্রচণ্ড। তেমন হলে শ্যামলেন্দুকে অ্যারেস্টও করতে পারে পুলিশ। তারপর? শ্যামলেন্দু মুখ দেখাবে কি করে? আত্মীয়স্বজন বলবে, কি বাবা শ্যামল, তোমাকে আমরা ভাল লোক বলে জানতাম—সেই তুমি একটা বাপমরা অসহায় মেয়ের অভাবের সুযোগ নিয়ে... ছি ছি ছি। বন্ধুরাও টিটকিরি দেবে, আসলের সঙ্গে সুদও জুটিয়েছিলি মাইরি। ফেঁসে গেলি তো। অফিস কলিগরা হাসবে, মিস্টার সেনের পেটে পেটে এত ছিল, অ্যাঁ? আর স্বপ্নার কাছে মুখ দেখানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। তাদের এতদিনকার নিখুঁত নিশ্চিন্ত জীবন...। সব কটা থিয়োরি মেনে চলা সুখের সংসার...। স্বপ্না হয়তো লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে মালার মতোই কিছু করে বসবে। তারপর? বুবলা? বুবলা যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে, বুবলা কি কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে তার বাবাকে?

শ্যামলেন্দুর পায়ের নিচে চাপা ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট। ধকধক ধকধক। কি ভয়ানক প্রতিরোধহীন গতি। ধকধক ধকধক।

শ্যামলেন্দু নিজের দু এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। প্রকৃত সর্বনাশটাকে এক ধরনের নরম আটকাতেই হবে। শ্যামলেন্দু কলিং বেল চেপে ধরল। আয়েস করে এসেছে, 'হাঁ সাব?'
বাজিয়ে স্বপ্না, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, কেউ খুঁজলে বলে দিও আজ আর ফিরব না।'

লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল শ্যামলেন্দু। সোজা গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে বসেছে, 'পিজি হসপিটাল চল। জলদি।'

ডালহাউসি পেরিয়ে বেড রোড ধরে দুরন্ত গতিতে ছুটছে বাদামি মারুতি। চৈত্রের শেষে এ সময় বড় ধুলো ওড়ে। এলোমেলো হাওয়ার সঙ্গে অসংখ্য ধুলোর কুচি দৌড়ে এসে শ্যামলেন্দুর চুল-মুখের দখল নিয়ে নিল। নিজেও জানে না কি ভীষণ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। রেয়ারভিউ মিরারে তাকে দেখে ড্রাইভার পর্যন্ত অবাক হয়েছে, 'আভি, ইস ওয়াক্ত, অসপাতালমে কিউ স্যাব? ঘরমে কুছ হুয়া ক্যা? কৌন হ্যায় অসপাতালমে?'

'কোই হ্যায়।' শ্যামলেন্দু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল। তার ড্রাইভার মালাকে চেনে না এমন নয়, অনেকবারই দেখেছে। তবে মালার সঙ্গে অভিসারে যাওয়ার সময় সে কখনই ড্রাইভার নেয় না। এসব ব্যাপারে সে অত্যন্ত সাবধানী। যদিও লং ড্রাইভে গেলে আজকাল হঠাৎ হঠাৎ বড় ক্লান্ত বোধ করে। গাড়ি চালানোর জন্য বড় বেশি মনঃসংযোগ দরকার। শ্যামলেন্দুর ধৈর্য একটু কম। তার ওপর মধ্য চল্লিশেই দু-একখানা উটকো উপসর্গ এসে গেছে শরীরে। কোলেস্টেরল বাড়ছে। রক্তচাপ কখনও কখনও মাত্রা ছাপিয়ে যায়। ডাক্তাররা বলে ড্রিঙ্ক করা কমাতে—সিগারেটও। শ্যামলেন্দু কোনোটাই মানে না। আরে বাবা, জীবন তো একটাই। মাত্র ক'দিনের। মিছিমিছি ওইটুকু সময়কে অত বাধানিষেধে আটকে ফেলার কোনো মানেই হয় না।

মালা প্রায়ই বলে, 'এভাবে কত দিন চলবে শ্যামলদা?'

'কেন? আটকাচ্ছে কোথায়?'

'আটকাচ্ছে। তুমি বুঝবে না।'

'বোঝালেই বুঝব।'

'সব সম্পর্কেরই একটা পরিণতি থাকে। কোথাও একটা গিয়ে থামতে হয়।'

'তুমি কি চাও বল তো? বিয়ে-থা করবে? ছেলেটেলে দেখব?'

'আমি কি তাই বলেছি? তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। চাকরিটা থেকে শুরু করে যখন যা আমার দরকার হচ্ছে... তুমি না থাকলে আমাদের সংসারটাই তো ভেসে যেত।'

'ব্যস? এটুকুই? তোমাকে আমি ভালবাসি না?'

'বাসো?'

মালা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হোটেলের জানলা দিয়ে দূরে কোনো গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। অথবা আকাশের দিকে। সেই মুহূর্তে মালা ভয়ংকর অচেনা। সেই অচেনা মালা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, 'তুমি স্বপ্নাদিকে আর ভালবাসো না?'

'না, বাসি না। চিরকাল মানুষকে একজনকেই ভালবেসে যেতে হবে তার কোনো

মানে নেই।' শ্যামলেন্দু বিশ্বস্ত প্রেমিকের মতো ঝটপট উত্তর দিয়ে যায়, 'স্বপ্নার সঙ্গে অনেকদিন আগেই একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে।'

ভুল। ভুল। শ্যামলেন্দু সোজা হয়ে বসল। স্বপ্না বা বুবলা কাউকেই হারাতে রাজী নয় সে। নিজেব ভাবমূর্তি কোনো মূল্যেই হারাতে চায় না মানুষ।

হাসপাতালের মেইন গেট দিয়ে ঢুকছে গাড়ি।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, 'কিস তরফ জানা হ্যায স্যার?'

উত্তর দেওয়ার আগেই শ্যামলেন্দুর চোখ পড়ে গেছে এমারজেন্সির সামনে। স্বপ্না দাঁড়িয়ে আছে। পাশে আরো দু'তিনজন মহিলা।

গাড়িটা দেখতে পেযে স্বপ্নাই দৌড়ে আসছে। ফ্যাকাশে নিবক্ত মুখ। শ্যামলেন্দুব একেবাবে সামনে এসে ঝরঝব করে কেঁদে ফেলল. 'নেই। এখানে আনাব কিছুক্ষণ পবেই মাবা গেছে। এমার্বজেন্সিতেই।'

বিকেল মবে আসছে। হাসপাতাল চত্বরেব পুকুরটাব কাছে গিযে একটুক্ষণ একা দাঁডিয়েছিল শ্যামলেন্দু। দুটো বাচ্চা ছেলে পাল্লা দিয়ে পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে চলেছে। ঢিলটা ডোবাব সঙ্গে সঙ্গে জলেব গাযে বৃত্তাকাব কাঁপন। শ্যামলেন্দু এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সেদিকে।

মালার মৃত্যুসংবাদ পলকের জন্য আরেকবার সমস্ত অনুভূতিকে অসাড় করে দিয়েছিল। পলকেব জন্যই। তাবপরই তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বরাভয় দেয় তাকে, যারে শালা, জোর বাঁচা বেঁচে গেলি এযাত্রা। মালা খুব তাডাতাডি মরে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে শ্যামলেন্দুকে।

মালা কোথাও কাউকে কিছুই বলে যায়নি।

শ্যামলেন্দু দ্রুত সামলে নিয়েছিল নিজেকে। এসব সময়ে মাথা খুব ঠাণ্ডা রাখা দরকাব। ঠাণ্ডা মাথাতেই অবশ্য পালনীয কর্তব্যগুলো করে যাচ্ছে একে একে। তবুও ভাবনাবা পথ ছাডে কই। ভাবনা না অস্বস্তি? অস্বস্তি না ভয?

স্বপ্নার ছোট মামা কখন কাছে এসে হাত বেখেছেন শ্যামলেন্দুর পিঠে, 'মায়াদিকে কিভাবে খবর পাঠানো যায় বল তো?'

শ্যামলেন্দু তখনও পুকুবেব জলের দিকে তাকিযে অন্যমনস্কভাবেই প্রশ্ন করে ফেলল. 'কে মায়াদি?... ও হ্যাঁ। ভবানীপুব থানায গিয়েছিলাম। পুলিশকে দিয়ে মেসেজ পাঠিয়ে দিযেছি। আজ বাত্তিবেই ওবা খবর পেয়ে যাবেন।'

'পুলিশ কিছু বলল?'

'যা বলে। চান্স পেয়ে একগাদা ক্রস করে নিল।'

'সত্যি. তোমারই জ্বালা সব থেকে বেশি। আফটার অল তুমিই ওব লোকাল গার্জেন ছিলে তো।'

'আরো প্রচুর হ্যাপা বাকি। বডি না ছাড়া পর্যন্ত...'

বডি' শব্দটা নিজের কানেই লাগল খট করে। বডি! বডিই তো!

বেশ খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে স্বপ্না কথা বলছে মালার হোস্টেলের কয়েকজনের সঙ্গে। শ্যামলেন্দুর দৃষ্টি সেদিকে স্থির হল। ওদের মধ্যে হোস্টেলের ডেপুটি সুপার

মহিলাটি মোটেই সুবিধার নয়। ভদ্রমহিলার মুখে চোখে সব সময় কেমন সন্দেহ লেগে থাকে। বছর পঞ্চাশেক বয়স। বিয়ে-থা করেননি। এই ধরনের মহিলারা সাধারণতঃ পুরুষবিদ্বেষী হন। এমন রুক্ষ ভাবে তখন কথা বলছিলেন শ্যামলেন্দুর সঙ্গে, যেন মালা তাঁকেই সব থেকে বেশি বিপদে ফেলে গেছে, 'আপনার কথাতেই ওকে আমরা থাকতে দিয়েছিলাম। এভাবে ঝামেলায় পড়ে যাব কে জানত।'

শ্যামলেন্দু স্বপ্নাকে কাছে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাও এগিয়ে এসেছেন, 'তা হলে কখন পোস্টমর্টেম হচ্ছে?'

শ্যামলেন্দুর হয়ে স্বপ্নার ছোটমামা উত্তর দিলেন 'মনে হয় সকালের আগে হবে না।'

'কাল বিকেলের আগে তা হলে ছাড়া পাচ্ছে না?'

'কি জানি, পুলিশ আটকালে পরশুও হতে পারে।'

স্বপ্না বলে উঠল, 'তোমার কে এক বন্ধু লালবাজারে আছে না? তাকে বলে দ্যাখো না, যদি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা যায়।'

স্বপ্নার মুখ চোখ ফোলা ফোলা, চুল উস্কখুস্ক। কান্নাকাটিব ছাপ এখনও অত্যন্ত স্পষ্ট। মাসতুতো বোনেব শোকে খুবই কাতর হয়ে পড়েছে।

স্ত্রীর দিকে এক ঝলক তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল শ্যামলেন্দু। স্বপ্নার কি নির্বোধেব মতো আস্থা শ্যামলেন্দুর ওপর। আস্থা কেন, নির্ভরতাও।

শ্যামলেন্দু বলল, 'দেখি কি করা যায়!'

সকলেই হঠাৎ চুপ হয়ে গেছে। হাসপাতালে সান্ধ্য ভিড় আব কোলাহলের মাঝেও প্রত্যেকেই নৈঃশব্দের অস্বস্তিতে ভুগছে যেন। প্রত্যেকেই চায় কেউ কিছু বলুক, যা হোক কিছু। সেটা বুঝতে পেরেই বোধ হয় হোস্টেলের এক মহিলা বলে উঠলেন, 'মেয়েটা যে কেন এভাবে মরল!'

আরেকজন বলল, 'ওকে দেখে কিন্তু কালও বোঝা যায়নি এমন একটা কাজ করে বসবে।'

'কি মিষ্টি স্বভাব ছিল। ধীর, স্থিব। কারুর সঙ্গে কখনও ঝগডাঝাঁটিতে যেত না।'

অল্পবয়সী একটি মেয়ে বলে উঠল, 'ভীষণ চাপাও ছিল। কি জানি চাকরির জায়গায় কোনো গণ্ডগোল হয়েছিল কিনা!'

ডেপুটি সুপার মহিলা বললেন, 'না না, সেসব কিছু না। ওর দু'জন কলিগ তো একটু আগে এসেছিল। ওরাও কেউ কিছু বুঝতে পারেনি।'

'ওর রুমমেট মেয়েটা কিরকম হাসপাতালে একবার মুখ দেখিয়েই চলে গেল দেখলেন? ও হয়তো কিছু জানলেও জানতে পারে।'

'না না, ওর সঙ্গেও তেমন ইনটিমেসি ছিল না।'

'তা ছিল না। তবে গত সপ্তাহেও তো বলছিল...'

স্বপ্না ফ্যাকাসে মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছিল?'

'বলছিল ওকে নাকি মাঝে মাঝেই একটা লোকের সঙ্গে গাড়িতে করে ঘুরতে

দেখেছে। দেশে যাচ্ছি বলে হুটহাট করে যে দু'তিন দিনের জন্য চলে যেত, ওর ধারণা ও নাকি বাড়ি যেত না। ওই লোকটার সঙ্গেই...'

'ও কি করে বুঝল?'

'সে কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাতে উত্তব দিল, মলিনাদি, আমরা মেয়ে, মেয়েদের চোখ দেখেই অনেক কিছু বুঝে ফেলতে পারি।'

'লোকটাকে ধবতে পারলে...। নিশ্চয়ই কোনো বাজে লোকের পাল্লায় পড়েছিল।'

শ্যামলেন্দুব গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রসঙ্গটা কি কোনোভাবেই ঘোরানো যায় না?

ওদেব মধ্যে আবার একজন বলল, 'লোকটাব বর্ণনা কিছু দেযনি?'

'এবকম লোকেদের আব কি বর্ণনা হয়। গাড়ি-টাড়ি আছে যখন, নিশ্চযই ভদ্রলোকেব মতোই। ভদ্রলোকরাই তো এবকম মেয়েদেব ওপব আগে সুযোগ নেয়।'

'আপনারা থামুন তো।' স্বপ্না এতক্ষণে পবিত্রাতাব ভূমিকায এসেছে, 'আমি আমাব বোনকে চিনি, কখখনো কোনো বাজে কাজ করতে পাবে না। তাছাড়া সেরকম কারুর সঙ্গে ভাব হয়ে থাকলে আমাকে নিশ্চযই জানাত। ওর মতো একটা সবল পবিত্র মেয়ে...'

'সবল পবিত্র বলে কি আব ফাঁদে পড়তে পারে না? ববং এইসব মেয়েবাই আগে ফাঁদে পড়ে।'

'ঠিক বলেছেন। প্রাযই তো একটা পুরুষমানুষেব ফোন আসত। তাব সঙ্গে দশ মিনিট ধবে, পনেব মিনিট ধবে, গল্প করছে তো করছেই। জিজ্ঞাসা করলে বলত জামাইবাবুব ফোন...'

শ্যামলেন্দু নিথব হয়ে গেছে। স্বপ্নার হাতের চাপে সাড এল শরীরে। স্বপ্না বিবক্ত মুখে ঠেলছে তাকে, 'এখানে দাঁডিযে ফালতু কথা গিলবে? নাকি ডাক্তারের কাছ থেকে আবেকবাব খবব নিযে আসবে? ছোটমামা, তুমি আরেকবাব ওর সঙ্গে যাও তো, দ্যাখো বলেকয়ে যদি তাডাতাডি...'

শ্যামলেন্দু ছোটমামার সঙ্গে আর এম ও'ব অফিসেব দিকে এগুলো। বুক টিপটিপ কবেই চলেছে। স্বপ্নাকে ওই মহিলাদেব মাঝখানে বেখে আসাটা ঠিক হল কি?

এমারজেন্সিব কাছে পৌঁছে নাকে রুমাল চাপা দিয়েছেন ছোটমামা। একজন ঝাড়ুদার নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ময়লা ঠেলে সরিযে নিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের নিজস্ব উৎকট গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে প্রায়। তিন-চাবটে লোক স্ট্রেচারে করে এক বৃদ্ধকে নিয়ে হৈ-হৈ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তাদের রাস্তা দিতে সরে দাঁড়াল দু'জনে।

'সত্যিই কি মালা কোনো বদমাইশের পাল্লায় পড়েছিল?'

শ্যামলেন্দু উত্তর না দিয়ে হাঁটতে থাকল।

'ওরা বলছে বটে, তবে আমারও বিশ্বাস হয় না। স্বপ্না ঠিকই বলেছে। তেমন কিছু হলে তোমরা কি একটুও আঁচ পেতে না? তোমাদের সঙ্গেই সম্পর্কটা সব থেকে

ডিপ্‌ ছিল। আমাদের কাছে তো আসতই না।'

শ্যামলেন্দুর মুখফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'কেন যাবে? বিপদের দিনে আপনি ভুলেও খোঁজখবর নিয়েছেন ওদের? সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন, যদি সাহায্য চায়। যদি জায়গা চায় বাড়িতে।...'

ভদ্রলোক বলে চলেছেন, 'তবে যাই হয়ে থাক, মেয়েটার এভাবে মরা উচিত হয়নি। বাড়ির একমাত্র আর্নিং মেম্বার। ওদের সংসারটার এবার কি অবস্থা হবে ভাব তো? ভাইটার একটা চাকরির জোগাড় না হলে...'

শ্যামলেন্দু ভেতরে ভেতরে ভয়ানক ছটফট করে উঠল। নিজের অজান্তেই বলে ফেলেছে, 'ও সব কথা থাক না মামা।'

'থাক বললেই কি আর সব থাকে? রইল কি? খাবে কি?'

শ্যামলেন্দু কলের পুতুলের মতো আর এম ও'র ঘরের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। ডাক্তারটির বয়স ত্রিশের বেশি নয়। ঝকঝকে চেহারা।

শ্যামলেন্দু নিচু গলায় বলল, 'আমাদের কেসটা...?'

'ওহ্‌, সেই বার্ন কেস? আপনারটা কাল বিকেলের আগে হবে না।'

'বিকেল কেন?'

'তার আগে আরও চারটে বডি আছে। একটা মার্ডার আফটার রেপিং। ওটা আগে দিতে হবে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে, 'চিন্তা করবেন না, আমাদের এখানে অনর্থক দেরি হবে না। বরং থানাতেই... আপনারা পুলিশের সঙ্গে আগে কথা বলে রাখুন যাতে কাল বিকেলে ক্রিমেট করতে পারেন।'

শ্যামলেন্দুরা বাইরে এসে দেখল স্বপ্নার দুই দাদা পৌঁছে গেছে। দু'জনেই দারুণ উত্তেজিত। শ্যামলেন্দুকে দেখেই দৌড়ে এসেছে, 'কি হয়েছিল শ্যামলদা? মালা সুইসাইড করল কেন?'

কেন যে করল সেটা পুরোপুরি শ্যামলেন্দুই কি ছাই বুঝতে পারছে?

বড়দা বলল, 'শুধুই কি প্রেমঘটিত ব্যাপার?'

ছোড়দা বলল, 'দ্যাখ, মফঃস্বলের বোকা হাবা মেয়ে শহরে এসে কোথায় কোন চক্রে জড়িয়ে পড়েছিল।'

'কিছুই বলা যায় না, কেউ হয়তো এমন অপমান করেছিল...'

'আমার তো মনে হয় না। সেলসগার্লের চাকরি করলে মান-অপমান-বোধ অনেক ভোঁতা হয়ে আসে। একমাত্র প্রেমট্রেম কেসেই...'

শ্যামলেন্দু একটু সরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। ভাল একটা চাকরির জন্য এই দুই দাদার কাছে মালা কম ঘোরেনি। দু'জনেই ইন্‌জিনিয়ার, বড় ফার্মে চাকরি করে। মালা একদিন বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল, 'তুমি জানো, বুবাইদা তপাইদা আমাকে দেখলে কিভাবে আঁতকে ওঠে! বুবাইদার বাড়িতে বসে আছি, ভেতরে বুবাইদা বৌদিকে বলছে, ও কি এখানে সারা দিনের জন্য বডি ফেলল নাকি! ওকে বল আমরা বেরুবো। বৌদি বলছে—তোমার বোন, তুমি বল। বুবাইদা বাইরে আসার আগেই আমি বেরিয়ে এসেছি।'

শ্যামলেন্দু নিজের মনকে বস্তুনিরপেক্ষ করার চেষ্টা করল। একটা মেয়ে কলকাতায় এসে মাসতুতো দিদির বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে, যদিও আপন মাসতুতো দিদি নয়। তার মা দেড়শ কিলোমিটার দূরে এক মফঃস্বল টাউনে থাকে। সংসারে পাকাপাকিভাবে আয়ের সংস্থান নেই, কলকাতার আত্মীয়স্বজনরা নিয়মমাফিক উদাসীন। সেখানে এক জামাইবাবু তাকে একটা ছোট্ট কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, মাসের শেষে দেশে মা ভাই বোনেদের কাছে পাঠানোর মতো টাকাপয়সার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, নিজেও সাহায্য করে যায় সাধ্যমত, সাহিত্যের ভাষায় বলতে গেলে এক নিমজ্জমান সংসারকে উদ্ধার করেছে। মেয়েটির ভাইবোন এখন খেতে পায়, স্কুলে যেতে পারে, মাকে আধা ভিখাবির মতো ঘুরে বেড়াতে হয় না—এর কোনো দাম নেই? আর যদি মূল্য থাকেই সে মূল্য চোকাবে কে? এবং কিভাবে? মূল্য দিতে হলে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত, শ্যামলেন্দুর সঙ্গে মালার সম্পর্ক কি তার থেকে বেশি গভীর ছিল না? বয়সের অনেক তফাত থাকলেও? তাদেব গোপনীয়তা তো ছিল শুধু স্বপ্নার সম্মান রাখার জন্য। আত্মীয়স্বজনরা যাতে মুখ খোলার সুযোগ না পায় তার জন্য।

বুবলা যেন তাকে অশ্রদ্ধার চোখে না দেখে তার জন্য।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? শ্যামলেন্দু নিজের কাছেই নিজে হোঁচট খাচ্ছে বারবার।

একটা মায়াবী বিকেলের কথা মনে পড়ে গেল। ডায়মণ্ডহারবার থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে, রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে হাঁটতে হাঁটতে নদীর দিকে গিয়েছিল তারা। নদীর ধারে সাব সার নারকেল গাছ। একটা গাছে হাত রেখে নদীর দিকে মুখ করে দাঁডিযে ছিল মালা। পিছন থেকে মালার শরীরেব আদলটুকুই দেখা যাচ্ছিল। বেতের মতো ছিপছিপে সতেজ শরীর। শ্যামলেন্দুব বহুবার ব্যবহার করা চেনা শরীর। হঠাৎই কোত্থেকে দুটো ক্ষ্যাপা মোষ দিগভ্রান্তেব মতো দৌড়তে দৌড়তে মালার একদম কাছে এসে পড়ল। শ্যামলেন্দু ছিটকে সরে গিয়েছিল, 'মালা সাবধান। সরে যাও, সরে যাও।'

মালা ঘুরেও তাকায়নি।

শ্যামলেন্দু কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি ভয় পাও নি? সামনে অত বড নদী—পেছনে মোষ!'

মালা সোজাসুজি তাকিয়ে ছিল তার দিকে। মালার চোখে সেই মুহূর্তে হাসি, বিষাদ, আশা, নিরাশা কিছুই ছিল না। সম্পূর্ণ শূন্য দৃষ্টি।

'কি হল, কিছু বলছ না যে? মোষদুটোকে দেখেও তুমি দাঁড়িয়ে রইলে? ভয় পেলে না?'

দৃষ্টি এতটুকু বদলায়নি। কেবল ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটেছিল, 'ভয়? কই না তো!'

সেদিন ওভাবে কেন তাকিয়ে ছিল মালা?

রাত্রে ডাইনিং টেবিলে বসে অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল শ্যামলেন্দু। প্রচণ্ড ক্ষিদেয় নাড়িভুড়ি জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু খাবারের দিকে তাকালেই গা গুলিয়ে বমি উঠে আসছে। স্বপ্নাও স্থিরচোখে সাজানো খাবারের দিয়ে তাকিয়ে।

শ্যামলেন্দু একবাব বুবলার ঘরের দিকে তাকাল। খাওয়াদাওয়া সেরে বুবলা অন্যান্য দিন এ সময় শুয়ে পড়ে। আজ চুপচাপ সেও বসে আছে পড়ার টেবিলে। পর্দার ফাঁক দিয়ে বুবলার শরীরের অংশ দেখতে পাচ্ছে শ্যামলেন্দু। এ বাড়িতে আজ শব্দ নিষেধ।

নিষেধ ভেঙে স্বপ্নাই কথা বলল প্রথম। বহুক্ষণ পর। রুটির একটা কোণ নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে লম্বা শ্বাস ফেলল, 'আমি খালি ভাবছি, মায়া মাসিকে কি করে মুখ দেখাব?'

শ্যামলেন্দু চুপ।

'আমাদেরই উচিত ছিল ওকে হোস্টেল-ফোস্টেলে যেতে না দেওয়া। এখানে থাকলে চোখে চোখে তো থাকত। কোথায় কার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল...।'

শ্যামলেন্দু খাবার টেবিল ছেড়ে ছুটে গেল বেসিনের দিকে। পেট মুচড়ে বমি উঠে আসতে চাইছে। মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে বমি-ভাবটাকে সামলাল কোন রকমে। বাইরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে। রাতের দিকে এসময় রোজ একটা হাওয়া ওঠে। আজ সেই হাওয়াটাও নেই। খোলা ব্যালকনিতে ভ্যাপসা গুমোট।

স্বপ্না পাশে এসে দাঁড়াল। গলার স্বর ঘড়ঘড় করছে, 'প্রেগনেন্ট-টেগনেন্ট কিছু হয়ে গিয়েছিল হয়তো। সেই লজ্জাতেই...'

সামনের রাস্তার সব কটা আলো যেন দপ কবে নিভে গেল চোখের সামনে থেকে। গত মাসেই মালা এরকম একটা কথা বলেছিল না!

'আমার নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয় শ্যামলদা। আমরা বোধহয় ঠিক কাজ করছি না।'

'ও সব কথা এখন বাদ দাও তো।' শ্যামলেন্দু তখন ডুবতে চাইছিল মালার শরীরে।

'না শ্যামলদা, আমার আজকাল কেমন ভয় ভয় করে। খালি মনে হয় স্বপ্নাদির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। তোমাদের বাড়িতে গেলে বুবলার দিকে পর্যন্ত ভাল করে তাকাতে পারি না।'

'এ তোমার ফালতু কমপ্লেক্স।'

'কমপ্লেক্স নয়। আমার সত্যি ভয় করে। ধর যদি কিছু হয়ে যায়? স্বপ্নাদিকে কি বলব?'

'হলে হবে। এটা কোনো প্রবলেম হল? হাজার রকম ওষুধ আছে। লক্ষটা নার্সিংহোম। নার্সিংহোমে এসব তো আজকাল জলভাত।'

'না—'

'কি না?'

'আমি ওসব কিছু করব না।'

'মানে?'

'যদি কেউ আসে তো আসবে।'

'তারপর?'

'তারপর তুমি ভাববে।'

ঝনঝন করে মাথায় হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। গত সপ্তাহে মালা একবার টেলিফোনে বলেছিল না শরীরটা ভাল নেই? তবে কি... তবে কি...। পোস্টমর্টেমে সেরকম কিছু পাওয়া গেলে পুলিশ সহজে ছাড়বে না, প্রচুর খোঁড়াখুঁড়ি করবে।

শ্যামলেন্দু আর ভাবতেই পারল না। মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেছে।

'আপনি মালা রায়ের জামাইবাবু?'

'হ্যাঁ, মাসতুতো দিদিব হাজব্যাণ্ড।'

'আপনি বলছেন আপনিই ওঁব লোকাল গার্জেন ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'হোস্টেলে আসাব আগে উনি তো আপনাদেব বাড়িতেই থাকতেন?'

'হু।'

'হোস্টেলে চলে এলেন কেন?'

'আমাদেব বাড়িতে স্পেস প্রবলেম। বোঝেনই তো, আজকাল একটা এক্সট্রা লোক বাড়িতে থাকলে...'

'সে সময়ও কি ওঁর কোনো পুরুষবন্ধু ছিল?'

'নাহ।'

'না জানেন না?'

'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ওঁব কিরকম সম্পর্ক ছিল?' আবাব প্রশ্ন।

'ভাল। কর্ডিয়াল। বোনে বোনে যেমন থাকে আর কি।'

'আপনার সঙ্গে?'

'বয়স্ক জামাইবাবুর সঙ্গে শালীর যেরকম সম্পর্ক থাকে। আমি ওকে খুবই স্নেহ করতাম।'

'আপনার শ্যালিকার মৃত্যুর পেছনে কোনো একজনের পরোক্ষ হাত আছে। আছেই।'

'আপনারা শিওর?' কমপিউটাবের গলা কেঁপে গেল।

'শিওর।'

'কি করে?'

'ওর হোস্টেলের বোর্ডারদের রিপোর্ট, ওঁর শো-রুমের কলিগদেব কথাবার্তা সেরকমই ইঙ্গিতই দেয়। মে বি হি ইজ এনি বডি। এনি ড্যাম পারসন!'

পুলিশ অফিসার শীতল চোখে তাকিয়ে আছেন, 'অথচ আপনারা কেউ তাকে চেনেন না?'

'রক্তমাংসের কমপিউটার কপাল চেপে ধরল, 'পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কি তেমন কোন...?'

'ও নো। পোস্টমর্টেম বলছে ইটস অ্যা প্লেন কেস অফ সুইসাইড। আপনারা যা ভয় পাচ্ছেন তা নয়। শী ওয়াজ অ্যাবসোলিউটলি ক্লিন।'

'দেন ?'

'সেটাই তো ভাবাচ্ছে। আপনাদের ভাবাচ্ছে না ?'

শ্যামলেন্দু যন্ত্রের মত মাথা নাড়ল।

'লোকটিকে কোনোদিনই ধরা যাবে না। এ সব ক্ষেত্রে ধরা যায়ও না। হি হ্যাজ সাকসেসফুলি এসকেপড। এনি ওয়ে, লাশ আপনারা নিয়ে নিতে পারেন।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল শ্যামলেন্দু।

লাশ ঘব থেকে লাশ বেরিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বহুক্ষণ। আর কোথাও কোনো চিহ্নই নেই। তবু যে কেন ঘুম আসছে না শ্যামলেন্দুর ? খোলা চোখের সামনে শুধুই গাঢ় অন্ধকার। গাঢ় নীল নয়, গাঢ় কালো অন্ধকার। সেই অন্ধকারটাই এখনও হাতড়ে চলেছে শ্যামলেন্দু। এখনও মনে হচ্ছে, আচ্ছা এমনও তো হতে পারে সত্যিই অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল মালার। শ্যামলেন্দু ছাড়াও। হতে পারে —হতেই পারে। মালার সঙ্গে তার দেখা হত আট দশ দিন পরপর। কখনও তারও বেশি। মালা কিভাবে কাটাত মাঝের কটা দিন ? হোস্টেলের মহিলারা বলছিল তাদের কারুর সঙ্গেই তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না মালার। অতএব তাদের সঙ্গে সময় কাটানোর প্রশ্ন ওঠে না। শো-রুমের কলিগরা অবশ্য একটু অন্যরকম বলছিল। মালা নাকি কাজে গিয়ে খুব উচ্ছল থাকত, যেটা একেবারেই মালার স্বভাববিরুদ্ধ। তবে ছুটির পর কখনই এক সেকেণ্ডও কাটাত না তাদের সঙ্গে। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িও যেত খুবই কম। তাহলে সে সব দিন কি করত মালা ? অবশ্যই কারুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। হয়তো যে তাকে ফোন করত, সে সব সময় শ্যামলেন্দুই নয়, হয়তো সে ছাড়াও অন্য কেউ। সেই জন্যই বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে যেত যখন-তখন। বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই। শ্যামলেন্দুর কাছে মালা কৃতজ্ঞ থাকতে পারে কিন্তু তাকে হয়তো সে পুরোপুরি ভালবাসতে পারেনি। ভালবাসা অর্থাৎ পুরুষরা মেয়েদের কাছ থেকে যা চায়। শতকরা একশ ভাগ বিশ্বস্ততা। তাই যদি হয় তবে শ্যামলেন্দুই বা কেন মালার মৃত্যুর জন্য দায়ী ভাববে নিজেকে? মালার মৃত্যুর আড়াই দিন পরেও মালার চিন্তাতে নষ্ট করবে এক রাত্রির নিশ্চিন্ত ঘুম ?

শেষ যুক্তিগুলো প্রাণপণে গ্রহণ করার চেষ্টা করে চলেছে শ্যামলেন্দু। বাইরে কোথাও আচমকা একটা শব্দ বেজে উঠল। শব্দ না পাখির ডাক ?

রাত্রিবেলা কলকাতায় কোন পাখি ডাকে ? শ্যামলেন্দু একা বিছানায় উঠে বসল। স্বপ্না আজ পাশে নেই। পাশের ঘরে মালার মার সঙ্গে শুয়েছে। নিকষ অন্ধকারে হাত বাড়িয়েও শ্যামলেন্দু বেডসুইচ খুঁজে পেল না।

আবার শব্দটা বাজছে। ভীষণ চেনা শব্দ। কোথায় শুনেছে ? গাদিয়াড়ার ট্যুরিস্ট লজে ? কোলাঘাটের ডাকবাংলোয় ? পারমাদানের হোটেলে ? চাঁদিপুরের সি বিচে ? কোথায় ?

শব্দের স্থানটা মনে না পড়লেও রাতটাকে মনে করতে পারছে শ্যামলেন্দু। বিছানায় পাশাপশি শুয়ে কোনো এক নারী-শরীরকে সে বলেছিল, 'আমি তোমাকে

কিছুতেই ভুলতে পারি না। যখনই চোখ বুজি তোমাকে দেখতে পাই।'

নারীশরীর কি ধরে ফেলে শ্যামলেন্দুর ছলনা? তবে কেন হেসে ওঠে অত জোরে? অত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তেও?

'আমি মরে গেলে তিনদিনও আমাকে মনে রাখবে তো।' এই সত্যটা জানার জন্যই কি শুধু মরে যায় মালারা? মরে গেল? আবার শব্দ বাজছে। শ্যামলেন্দু দু'হাতে কান ঢেকে ফেলল।

বাইরে রাস্তা, ভেতরে রাস্তা

রাস্তাটা একেবারে জানলার ধারে। এত ধারে যে মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঘরটাকেই রাস্তা ভেবে ভ্রম হয় তখন। কিম্বা রাস্তাটাকে ঘর। কী যে গা ছমছম করে। গোপন একটা ভয় হিমবাহ হয়ে গড়াতে থাকে তুলিকাব শবীবে। ভয়ঙ্কর শীতলতায় মন অবশ হয়ে আসে। কেন এমন হয়? কেন শুধু তারই এমন হয়? প্রভাতবেলাব সূর্যটা যেই জানলা দিযে গুঁড়ো গুঁড়ো আলো ছড়াতে শুরু করে, ওমনি বাস্তাটা গুটি গুটি সেঁধিয়ে আসে ভেতবে। জোব জোব ধাক্কা দিযে ঘুম ভাঙায়।

—তুলি... অ্যাই তুলি...

তুলি ধড়ফড় কবে উঠে বসে। বুক থেকে খসে যাওযা আঁচলটাকে তাড়াতাড়ি তুলে নিজেকে ঢাকে।

বাস্তা আবার ঠেলা দেয়.—শুনতে পাস না? কিরে? অ্যাই?

কোন কোন দিন তুলিকা সাহস কবে বলে ফেলে.— না, শুনতে পাই না, কি চাই তোমার? কেন আসো?

—কেন আসি জানিস না?

—চলে যাও। এবার আমি কিছুতেই দেব না। তুলিকা প্রাণপণে নিজেব হাঁটু দুটোকে জাপটে ধরে। থুঁতনি গুঁজে দেয দু হাঁটুর মাঝখানে। যেন একমাত্র ওভাবেই গর্ভস্থ ভ্রূণটাকে লুকিয়ে ফেলা যায। সব অঘটনের হাত থেকে। অমঙ্গলের হাত থেকে।

রাস্তা তবু সামনে থেকে যায না। তুলিকা চোখ বুজে ফেলে। বন্ধ চোখেও সে স্পষ্ট দেখতে পায় সমস্ত ঘর জুড়ে নীলচে আবছায়া। সেই আবছাযায় রহস্যেব মতো ফুটে রয়েছে তার ঘরগেবস্থালি। ড্রেসিং টেবিল, আলমারি, শোকেস, আলনা। আলনায বাখা ডুবে শাড়ির গায়ে থোকা থোকা আলো-আঁধার। তারই গায়ে হেলান দিযে দাঁড়িয়ে থাকে শয়তান রাস্তাটা। অসভ্য এক লম্পটের মতো তার চেহারা। বোগা লম্বা শরীব। খসখসে কালো রঙ। গাভর্তি বিশ্রী ক্ষতচিহ্ন। গা ঘিনঘিন করে ওঠে। মাগোঃ. চাউনিটাও কী নোংরা! যেন চোখ দিয়েই চেটেপুটে নেবে সব কিছু। কালো মাড়ি বার করে খ্যাক খ্যাক হাসে আবার। অসহ্য। তুলিকা বন্ধ চোখেই ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর গায়ে।

—এই শুনছ? এই? ওঠো না?

অঞ্জন সাড়া দেয় না। ভোরবেলার ঘুম তার বড় গভীর। তুলিকার ধাক্কায় ঘুমন্ত শরীর সামান্য নড়াচড়া করে মাত্র। পাশ ফিরে শোয়। অস্ফুট শব্দ ওঠে গলা থেকে।

তুলিকা কাতব ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে। শিশুর মতো মুখ গুঁজে দেয় ঘুমের গন্ধমাখা খোলা পিঠটায়। পিঠটা বেশ বড়সড়। অনেকখানি চওড়া। মাঝখানে আলতো খাঁজ। সেই খাঁজে মুখ ডুবিয়ে তুলিকা মানুষটার শরীরে জমা রাতের বাষ্পগুলোকে নিজের নিশ্বাসে ভরে নেয়। ভরসা খোঁজে। যতক্ষণ না আরও আলো আসে ঘরে। যতক্ষণ না রাস্তাটা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

এরকমই হয় প্রতিদিন। নতুন একটা দিন আসার আগে।

নতুন একটা দিন আসার আগে ঘুম ভাঙে শিবদাস পাগলারও। তার ফালিমতন ঘরটার পিঠে আরেকখানা ঘর। অন্য ভাড়াটের। সেখান দিয়ে দিনটা ঠিক এসেও আসতে চায় না তার কাছে। কেন যে রোজই এত দেরি করে শিবদাস বুঝতে পারে না। মাথার ওপর টিনের ছাউনিতে অজস্র ছোট-বড় ফুটো। সেই ফাঁকগুলো দিয়ে সকালটা অনেকক্ষণ লুকোচুরি খেলে তার সঙ্গে। একসময় পেছনের গলিতে লোকজনের হাঁটাচলা শুরু হয়। টুকরো টুকরো কথা তন্দ্রার মত ভেসে ওঠে। ডুবে যায়। ফের ভাসে। মিলেমিশে এক হতে থাকে পচা নর্দমার ভ্যাপসা গন্ধগুলোর সঙ্গে। শিবদাস তখনও ঠিক বুঝতে পারে না সকাল এল কিনা। রাত থেকে দিনটাকে আলাদা করতে একটু বেশিই সময় লাগে তার। পিটপিট চোখে চারদিকে তাকায়। শতজীর্ণ ঘরের একটা কোণে তখন গুটিসুটি মেরে বড়ো ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে থাকে শিবদাসের দুঃখী বউটা। আবছা অন্ধকারে শিবদাস তাকে দেখেও দেখে না। আচ্ছন্নের মত উঠে গিয়ে দরজা খোলে। পাশের ভাড়াটের ঘর পেরোলে মাটির উঠোন। উঠোনের পর সদর দরজা। তারপরে কাঁচা রাস্তা। শিবদাসই প্রথম সদর দরজা খোলে রোজ। বাইরে এসে আধভাঙা লাল রোয়াকটায় পা মুড়ে বসে। সদ্যফোটা দিনটার দিকে বোবা চোখে তাকায়।

রাস্তা জিজ্ঞাসা করে—কিহে শিবদাস? সকাল এসেছে তবে?

শিবদাস ঘটঘট মাথা নাড়ে।

—চলো তবে বেরিয়ে পড়ি!

শিবদাস বিড়বিড় করে—এখন বেরোলে খোকার মা বকবে যে।

—বকুক। তুমি এসো তো আমার সঙ্গে?

শিবদাস দাঁড়িয়ে উঠেও বসে পড়ে। খোকার মা উঠোন পেরিয়ে ঠিক এদিকেই আসছে। এত পা টিপে বার হয় রোজ, তবু কী করে যে টের পেয়ে যায় বউটা? রোজ পেছন পেছন উঠে আসে। সময় বুঝে পথ আগলে দাঁড়ায়—চলো। চোখমুখ ধুতে হবে না?

কোনদিন বলে—চা করেছি। ঘরে এসো।

শিবদাস আমতা আমতা করে—একটু এদিক ওদিক দেখে আসি না হয়। বেশি দূরে যাব না।

—না। বউ গলায় শাসন আনে—এখন নয়। পরে।

শিবদাস সুড়সুড় করে ঘরে ফেরে। পৃথিবীতে একমাত্র এই বুড়ি বউটার ধমককেই ভয় পায় সে। উঠোন ডিঙিয়ে পেছন ফিরে তাকায়। দরজা ধরে রাস্তা তখনও ডাকতে থাকে—ও শিবদাস, এলে না তবে? এত কষ্ট করে তোমার জন্য সকাল নিয়ে এলাম..

শিবদাস নিজের মনে বলে ওঠে—আসছি, আসছি। রোসো একটু।

রাস্তা তবু তার পা ধরে টানে। টানতেই থাকে।

দুই

ঘুম থেকে উঠেই জানলার পর্দাটাকে ভাল করে টেনে দিল অঞ্জন। এত ভারী পর্দা কি করে যে বারবার সরে যায়! রাতে শোবার আগেও টেনেছিল ভাল করে। তবু দ্যাখো...। অঞ্জন মনে মনে বেশ বিরক্ত হল। জানলাটাকে একেবারে বন্ধ রাখাও চলে না। ওখান দিয়েই যা একটু হাওয়া-টাওযা আসে ঘরে। তার দোলাতেই রাতে কখন টুক করে সরে যায় কমলারঙ পর্দাটা। পুরো সরে না। ছেনাল মেয়েদের মত এলোমেলো করে রাখে নিজেকে। ফাঁকফোকর দিয়ে টাকুসটুকুস রাস্তা উঁকি মারে। তাই দেখেই ভোরবেলা কেন যে এত ভয় পায় তুলিকা!

জানলা থেকে সরে এসে অঞ্জন গোমড়া মুখে বলে উঠল—আসলে এ বাড়িতে উঠে আসাটাই ভুল হয়েছে আমার! কে জানত এখানে এলেই তোমার মাথায় নতুন ভূত চাপবে!

তুলিকা ম্লান হাসল। কিছু কিছু ব্যাপার থাকে যা কাউকে বলা যায় না। অনেক কাছের আপনজনকেও না।

অঞ্জন নরম হবার চেষ্টা করল একটু—কেন কিছুতেই তুমি মনে জোর আনতে পারছ না বলো তো? এসময় মনটা একেবারে ফ্রী রাখা দরকাব। সব সময় এভাবে ভয পেলে...

—এ বাড়ি এখন আর চেঞ্জ করা যায় না, না? তুলিকা ফস করে বলে ফেলল। বলেই লজ্জিত হল। মাত্র দেড়মাস হল বাড়ি বদলেছে। শরীরের মধ্যে আবার একজন এসেছে টের পেয়েই জেদ ধরে বসেছিল—অন্য কোথাও চলো। তাড়াতাড়ি। এখানে থাকলে আবার কিছু একটা হয়ে যাবে।

অঞ্জন প্রথমটা আমল দেয়নি—বাজে চিন্তা বাদ দাও তো! যত সব কুসংস্কার।

হয়ত কুসংস্কার। হয়ত অন্যায় বায়না। তবু তুলিকা কি করে ভোলে আগের বাড়িতে পর পর তিনবার তার...উফ। তার নাকি জরায়ু দুর্বল! ফেলোপিয়াণ টিউবেও কিসব গণ্ডগোল! তার জন্যই...। বাজে কথা। তুলিকা বিশ্বাস করে না। ওখানে কেউ নির্ঘাত তুকতাক করত কোন। মাসীমা সেরকমই বলেছিলেন। ওই যে বাড়িওয়ালার মেজ মেয়েটা, ওই যাকে বিয়ের পর থেকে স্বামী নেয় না, সেইই নির্ঘাত বাণ মারত। নতুন বৌদিও সেই রকম বুঝিয়েছিল তুলিকাকে। নইলে পাঁচ মাস ছ মাস পেটে থাকার পরও তরতাজা প্রাণগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া বাড়িটাও ছিল কেমন অন্ধকার মত। দুটো ঘরের একটাতেও আলোবাতাস ঢুকত না। গলি দিয়ে সামনের বাড়ি পেরোলো তবে রাস্তা, ইচ্ছে করলেও মানুষের মুখ দেখার উপায় নেই। শেষের দিকে তুলিকার দমবন্ধ হয়ে আসত।

—এবারও কিছু হয়ে গেলে তুমি কিন্তু দায়ী হবে হ্যাঁ!

অঞ্জন রেগে যেত—চাইলেই কি মনের মত সব পাওয়া যায়? কম তো খুঁজছি না। বাড়িভাড়ার রেট কি হয়েছে জানো? একটু পছন্দসই ফ্ল্যাট মানেই মোটা অ্যাডভান্স। সেলামি। সব দিক ভাবতে হবে তো না কি?

এসব কথা তুলিকা বোঝে না তা তো নয়। এখন প্রতিটি কড়ি হিসেব করে চলার সময়। এক কামরার এই ফ্ল্যাটের জন্যই আগাম দিতে হয়েছে পাঁচহাজার। এর ওপর সামনে আবার একটা বিরাট খরচা। তবু বলে ফেলল।

—এ বাড়ি এখন ছাড়লে বাড়িওয়ালা অ্যাডভান্স ফেরত দেবে না?

অঞ্জন উত্তর দিল না। বড় অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। তুলিকা সেদিকে তাকিয়ে নিজেকে শাসন করার চেষ্টা করল। ছি, এই ফ্ল্যাটটা নিজেই না সে পছন্দ করেছিল। একেবারে রাস্তার ধারে বলে! জোর করে হাসি ফোটাল ঠোঁটে—তুমি আজকাল কথায় কথায় এত রেগে যাও কেন বলো তো?

অঞ্জনের রাগ নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বউটাকে বড় ফ্যাকাশে লাগছে। রক্তশূন্যতার জন্য কি? চোখ আর গাল দুটোও বেশি ফোলা। এবারও বাচ্চাটা থাকবে কিনা কে জানে! অস্থির হাতে তুলিকার কাঁধ খামচে ধরল—প্লিজ তুলি. একটু সেন্সেবল হবার চেষ্টা করো। এত ভেঙে পড়লে চলে নাকি?

তুলিকা জানলার দিকে তাকাল। নাহ, রাস্তাটা এখন আর ধারেকাছে নেই। পর্দার আড়াল থেকে দেখাও যাচ্ছে না তাকে। অনেকটা হাল্কা লাগল নিজেকে। স্বামীর পাশ ঘেঁষে বসল,—ভেঙে পড়লাম কোথায়?

—পড়োনি?

—না-আ।

—তবে হঠাৎ হঠাৎ অমন পাগলামি করো কেন?

তুলিকা ছলছল তাকাল—ভয় করে যে।

—কিসের ভয়? কাকে ভয়?

—রাস্তাকে। বলতে গিয়েও ঢোঁক গিলে নিল তুলিকা। থাক। ভয় যে পায়, ভয় শুধু তারই। অন্য কারুর নয়।

অঞ্জন কাছে টেনে আদর করল বউকে—পাগলি মেয়ে! কাকে ভয় তোমার? আমি আছি না?

তুলিকা হাসল নরম করে। হাসতে হাসতেই টের পেল আর একটুও ভয় করছে না তার। কাউকে না। একটুখানি মুখের কথাও অনেক সময় বড় আশ্বাস এনে দেয়।

হাসতে হাসতেই চিমটি কাটল স্বামীর হাতে,—কোথায় আর তুমি আছ মশাই? এই তো একটু পরে বেরিয়ে যাবে। ফিরবে সেই সন্ধ্যেবেলা। এর মধ্যে এতটা সময়... দশটা থেকে সাতটা, সাড়ে সাতটা, কোন কোন দিন আটটা নটা... তুলিকা কড় গুনে গুনে হিসেব করতে থাকল,—তাহলে ধরো গিয়ে ন ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা, বারো ঘণ্টা...

—তা অবশ্য ঠিক। অঞ্জনের কপাল জড়ো হল,—তোমাকে অনেকক্ষণ একা থাকতে হয়।

—তবে?

—তবে এক কাজ করা যায়। তোমাকে রানীগঞ্জে রেখে আসি কটা মাসের জন্য।

রানীগঞ্জ মানে তুলিকার বাপের বাড়ি। সেখানে থাকার মধ্যে আছে মাত্র দুই

দাদা-বৌদি। প্রথমবারের বাচ্চাটা ওখানেই নষ্ট হয়েছিল। যাবার ঠিক সাতদিনের মাথায়। ভাবতে গিয়েই আঁতকে উঠল তুলিকা—কখখনো না। আমি এখন মোটেই রানীগঞ্জ যাব না।

—তাহলে মাকে নিয়ে আসি বড়দার ওখান থেকে! কিম্বা বড়দিকে যদি বলি...

—না, না। সজোরে মাথা নাড়ল তুলিকা—এত তাড়াতাড়ি কাউকে ব্যতিব্যস্ত করার কোন মানেই হয়! মা বুড়ো মানুষ। আগেরবারই ওনার খুব কষ্ট হয়েছে। আর বড়দিই বা সংসার ফেলে এতদিন ধরে এখানে...

—বেশ তবে রাতদিনের লোক দেখি একটা?

—দূর! এই একটা ঘরে তাকে শুতে দেব কোথায়! দুশ্চিন্তা কোরো না তো। সবে সাড়ে তিনমাস চলছে। এর মধ্যে এত ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই। তুলিকা চোখ ঘুরিয়ে হাসল—আসলে নতুন বাড়ি, নতুন পরিবেশ... আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো!

তুলিকা এরকমই। ভয় পায়, তবু ভয়টাকেই সঙ্গী করে রাখতে চায় সবসময়। অঞ্জন তল পায় না তার মনের। অফিস বেরোনোর আগে তাও একবার বলে,—দুপুরে খেয়ে উঠে লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমোবে, বুঝলে? একদম জানলায় গিয়ে বসবে না। খেয়ে উঠে মনে করে নার্ভের ওষুধ খেও কিন্তু।

—হুঁ। তুলিকা মাথা নাড়ে। নাড়ে বটে তবে কিছুক্ষণ পর সেকথা আর মনে থাকে না। থাকবেই বা কি করে! দুপুর হলেই জানলাটা যে চুম্বকের মত টানে তাকে। খাওয়াদাওয়ার পর জানলার উঁচু ধাপিটায় পা মুড়ে রাস্তার মুখোমুখি বসে। আজই যেন একটা বোঝাপড়া করে নেবে, এভাবে কটমট তাকায় রাস্তাটার দিকে। এই সব রাস্তায় লোকজন থাকে না বড়। গ্রীষ্মের দুপুর দশ দিক ফাঁকা করে রাখে। আশপাশের বাড়ির জানলা-দরজাও বন্ধ সব। দু'একটা কাক রোদে ভিজে ক্লান্তভাবে ঝিমোয়। কুকুররা ছায়া খুঁজে ফেরে। হায় রে, ছায়া কোথায় তখন! আকাশ পৃথিবী চলে গেছে তেজী রোদের দখলে। বৈশাখী বাতাস রুক্ষ, হিংস্র। তুলিকা ব্যাকুল হয়ে এদিক ওদিক তাকায়। এক-আধটা ফেরিওয়ালাও যদি দেখা যেত এসময়। তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে রাস্তাটা বেলেল্লাপনা শুরু করে দেয় নিরালা দুপুরের সঙ্গে। দুপুরও ফুঁসতে থাকে ফণাতোলা সাপের মত। তখনও তুলিকা কিছুতেই জানলাটা বন্ধ করতে পারে না। রাস্তার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। শক্ত হয়ে বসে থাকে। প্রতিদিন লড়াইটা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করে এভাবেই প্রতিদিন হেরে যায়। রোদের পিঠে চেপে রাস্তা ক্রমে আরও কাছে চলে আসে। একেবারে গায়ের ওপর। অদৃশ্য হাতটা এইবার বুঝি...। তুলিকা দুহাতে নিজের পেট চেপে ধরে। আঁচল দিয়ে আড়াল করতে চায় গর্ভকে। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। রাস্তা যেন তার অলক্ষ্য নিয়তি, তার হাত থেকে মুক্তি নেই তুলিকার। নেই। নেই।

তিন

মুক্তি নেই শিবদাস পাগলারও। রাস্তা তাকে পাকে পাকে বেঁধে রেখেছে। সারাটা দিন পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। লোকে তাকে পাগল বলে। এই সব লোকেদের মধ্যে তার আপন বউটাও আছে। হ্যাঁ, আপন বউ। পাগলা শিবদাস সেরকমই ভাবে। কারণ ওই বউ ছাড়া দুনিয়ায় তাব আপন বলতে আর কেউ নেই। উঁহু. ভুল হল। আরেকজন আছে। নিশ্চয়ই আছে। সে হল শিবদাসেব খোকা। একমাত্র ছেলে। অনেকদিন আগে তাব বাড়ি ফেবাব কথা ছিল। অনেকদিন ধরে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে শিবদাস। লোকে বলে ছেলেটা নাকি তার কবেই মরে গেছে। সবাই নাকি নিজেব চোখে তাকে মরে যেতে দেখেছে! ধুস। একথা আবাব সত্যি হয় নাকি? অতবড় জোয়ান ছেলেটা তার। সূর্যেব মত টকটকে রঙ। ঘোড়াব মত টগবগে তেজ। সে ছেলে অমন ভুস করে মরে যেতে পারে! যত সব অলুক্ষণে কথা।

শিবদাসেব কথা শুনে খোকার মা মুখে আঁচল গুঁজে কাঁদে। কপাল ঠোকে দেওয়ালে—দোহাই তোমার, এবাব একটু ঠাণ্ডা হও। খোকা সত্যি আর ফিরবে না।

—ফিরবে না বললেই হল! শিবদাস ঠোঁট উল্টে হাসে। মেয়েমানুষের যেমন বুদ্ধি, তেমনই চিন্তার গতি! লোকে কি বলল না বলল বিশ্বাস করে বসে আছে! খোকা তাদেব মবলটা কবে? এই তো শিবদাস চোখ বুজলেই পরিষ্কার দেখতে পায় খোকা ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে আছে চৌকিতে। ঘব আঁধাব কবে। ভরসন্ধেবেলা। কদিন ধরে কি যেন তার হয়েছে। কথা বলছে না ভাল করে। খাচ্ছে না। গোঁজ হয়ে শুয়ে আছে সর্বসময়। শুধোতে গেলে দাঁত খিঁচিয়ে উঠছে.—বিরক্ত কবো না তো! নিজেদেব কাজ করো গিয়ে।

কি জমাট ভাবী গলা। ঠিক যেন ঢাকের বাদ্যি। খোকাব মা ভয়ে কাঁপছে। শিবদাস অফিস থেকে ফিবতেই ফিসফিস কবছে এসে কানেব কাছে,—কি হল বলো দিকিনি ছেলেটার?

—কি হবে? বলতে গিয়ে বলা কাঁপছে শিবদাসেবও। কবে থেকে যে নিজের ছেলেকে নিজেই ভয় পেতে শুরু করেছে! কখনই বা এমন লায়েক হয়ে উঠল ছেলে! এই তো সেদিনও বাপেব কাঁধে চড়ে ঘুরত। বায়না করত এটা-সেটাব জন্য। কথায় কথায় আঁচল খুঁজত মায়েব। শেষ বয়সের ছেলে আদরও পেয়েছে খুব। সেই ছেলে, দ্যাখ না দ্যাখ, হঠাৎ একেবারে লাগামছাড়া! চুল ওড়ে ফবফব কবে, কবজিতে পেতলের চেন, গলায় হাব, পরনে আঁটোসাঁটো রঙদাব জামাপ্যান্ট। কোনভাবেই তাকে আর চিনে উঠতে পাবে না শিবদাস। দশটা প্রশ্ন কবলে একটার জবাব দেয়। স্কুল না পেরোতে পড়া ছেড়েছে। বন্ধুর সঙ্গে কিসের বুঝি ব্যবসা করে। খুলে বলে না কখনও। পার্টিবাজিও রয়েছে সঙ্গে। পার্টির হয়ে মিটিং মিছিল করে। ভোটের সময় সদলবলে খাটে।

সেই দলবলই এল সেদিন গভীর রাতে। ছেলে তখনও চৌকিতে শোয়া। বাপ মা নিচে, মেঝেতে পাতা বিছানায়।

—খোকা? খোকা বাড়ি আছিস?

শিবদাস আধোঘুমে গলা ওঠাল,—কে-এ? কে রে এত রাতে?

—আমরা মেসোমশাই। খোকা আছে ঘরে? নিরীহ মোলায়েম গলা।

খোকার মার তবু গলা কাঁপল। জানলার তার ধরে গলিতে চোখ বোলাল বার বার—কেন বাবা? এত রাতে তাকে কি দরকার?

—দরকার আছে মাসীমা। ডেকে দিন একটু।

ডাকতে হল না। তার আগে ছেলে নিজেই উঠেছে। অন্ধকারেই প্যান্ট জামা পরছে। শিবদাস আলো জ্বালাতে গেল, ছেলে ধমকে উঠল—আহ্!

তারপর বেরিয়ে গেল। অন্ধকার ছিঁড়ে। রাতটাকে টুকরো টুকরো করে। লোকে বলে খালপাড়েই নাকি শুয়েছিল রাতভর। যেমন শুয়ে থাকে ঘরের চৌকিতে। হাত পা ছড়িয়ে। টুঁটিটাই নাকি ছেঁড়া ছিল শুধু। আর পেটখানা দুফাঁলা। পুলিশও সেরকম শুনিয়েছিল বটে। শিবদাস মানতে পারেনি। অতসব প্রাণের বন্ধু কখনও শত্রু হতে পারে! ওদের সঙ্গেই কোথাও নিশ্চয়ই চলে গেছে খোকা! কাজ ফুরোলে ফিরবে। ভেবে ভেবে সেই সকাল থেকে লাল রোয়াকটায় বসে থাকে শিবদাস। সারাটা সকাল ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে। মাস ঘোরে। বছর যায়। একটা...দুটো...পাঁচটা...আটটা বছর। বেলা বাড়লে শিবদাসের বউ ডাকতে আসে—ওঠো দিকি এবার! দুটো খেয়ে নেবে চলো।

শিবদাস বলে—আরেকটু দেখি।

শিবদাসের বউ স্বামীর পিঠে হাত রাখে। এসময় প্রতিদিনই তার গলা ছেড়ে কাঁদতে সাধ যায়। স্বামীর মুখ চেয়ে সামলায় নিজেকে। শিবদাসের চাকরিটাও গেছে অনেককাল। বদ্ধ পাগলকে কে আর চাকরিতে রাখে! দু-দুটো পেটের ভাবনা এখন ভাবতে হয় বুড়িটাকেই। এদিক ওদিক খেটে বেড়ায়। মোয়া, আচার বানায় ঘরে। তাই দিয়েই চলে কোনক্রমে। দুগাল ভাত বাড়ে স্বামীর পাতে। ছেলেভোলানো গলায় বলে, —আর কতক্ষণ বসে থাকবে গো? ওর আজ ফিরতে দেরি হবে।

শিবদাসের চোখে উজ্জ্বল হয়—খোকা বুঝি বলে গেছে তোমাকে?

—হ্যাঁগো। এখন খাও তো।

কোনদিন দুটো শাকভাত। কোনদিন শুধু পান্তা। তাই চেটেপুটে খেয়ে উঠে পড়ে শিবদাস। ময়লা ছেঁড়া শার্টখানা গায়ে গলায়। ছাতি নেয় বগলে,—তবে আমি একটু বেরিয়ে দেখি। কাছাকাছি পেলে ধরে আনব।

আগে আগে বাধা দিত বউ। আজকাল আটকায় না। সকালে তবু কথা দিয়ে বেঁধে রাখা যায় মানুষটাকে। দুপুরে কোন বাধাই মানে না শিবদাস। জোর করলে ফল উল্টো হয় বরং। ইদানীং তাই মোয়ার ঠোঙা, আচারের শিশি ঝোলায় পুরে হাতে ধরিয়ে দেয়—পারলে পথে এগুলো বেচার চেষ্টা কোরো, কেমন? মোয়া বলবে জোড়া এক টাকা। আচার বড় নিলে সাড়ে সাত, ছোট পাঁচ। কিগো, মনে থাকবে তো? বেশি দূরে যেও না কিন্তু!

—না গো না। খোকাকে পেলেই নিয়ে চলে আসব। দূরে যাব কেন?

শিবদাস হনহন বেরিয়ে পড়ে। এ মোড় ঘুরে ও-মোড়ে যায়। এ রাস্তা থেকে ও-রাস্তা। কোন রাস্তায় যে গেছে ছেলেটা! বকবক করে রাস্তার কাছেই খোঁজ নেয়। —এবার কোনদিকে যাই বলো দিকি?

রাস্তা তার হাত ধরে, ওদিকে চলো। ওই ওপারে। পুরো একটা পাক খেয়ে শিবদাস ফের প্রশ্ন করে,—এবার কোন পথে যাই?

পুরোনো বন্ধুর মত রাস্তা তার কাঁধে হাত রাখে,—এসোই না আমার সঙ্গে।

বছরভর রোদ-বৃষ্টি মাথায় এভাবেই রাস্তার সঙ্গে ঘোরে শিবদাস। ঘুরতে ঘুরতে ঘোরাটাই নেশা হয়ে যায় একসময়। পাগল মানুষের অবুঝ নেশা। হাওয়াই চপ্পল ফটফটিয়ে, দুপুর পিঠে নিয়ে চরকি খেয়ে চলে। উন্মাদ মস্তিষ্কের কোষগুলো দিনে দিনে আরও তালগোল পাকাতে থাকে। খোকার চেহারা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যায়। খোকা যেন ঠিক কত বড়! কার মত! ওই ছেলেটা! নাকি ওইটা? না আরেকটু লম্বা মাথায়? রাস্তা-ঘাটে ছেলেপুলে কোন দেখলেই শিবদাস তাকে খোকা বলে ভেবে বসে—, কাছে গিয়ে গদগদ স্বরে ডাকে—ও খোকা, ঘরে ফিরবি না?

বালকের দল ভারী মজা পায়। পাগলকে ঘিরে হাততালি দিয়ে লাফায়, তার ছেঁড়াফাটা ধুতিখানা ধরে টানাটানি করে! শিবদাস মোটেও রাগে না। সামনে যাকে পায় খপাত করে তার হাত ধরে। শিশুর মত বলে—ধরে ফেলেছি। ধরে ফেলেছি।

ছেলেরা ছটফটিয়ে ছাড়িয়ে নেয় নিজেদের। দূরে গিয়ে হাত ঘুরিয়ে নাচে—ধর তো দেখি, এই পাগলা, ধর তো দেখি!

শিবদাস কাকুতিমিনতি করে—দুষ্টুমি করে না বাবা। ঘরে চল এবার।

—না যাব না। হি হি। না যাব না। ছেলেরা তার দিকে ইঁটের টুকরো ছোঁড়ে —ঘরপাগলা বুড়ো রে, ছেলেপাগলা বুউড়ো।

শিবদাস মরিয়া হয়ে ওঠে, ঘরে গেলে গান শোনাবো চল। সেই গানটা—সেই আলিবাবা আর চোরের গান।

—ধুস! ওসব কে শোনে? হিন্দি গান করো—হিন্দি গান। ছেলেরা হৈ-হৈ করে।

—ও বাবা! শিবদাস গাল ছাড়িয়ে হাসে। দাঁতগুলোয় সব পোকা লেগেছে। ফোকলা গালে শৈশব নাচানাচি করে—কোন গানটা শুনবি বল দিকি? বলে আর উত্তরের অপেক্ষা করে না, হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে ওঠে,—এক দো তিন, চার পাঁচ ছয়... ..., আ জা সনম, আ জা সনম... গাইতে গাইতে বগল বাজায়। জোড়া পায়ে ধিতাং ধিতাং নাচে।

গান থামলেই খোকারা হল্লা করে—আরেকটা হোক। আরেকটা হোক।

—উহুঁ, আবার কাল। বুড়ো মানুষটা হাপরের মত হাঁপায়। দম নেয় জোরে জোরে —ঘরে মা ভাত বেড়ে বসে আছে। এবার বাড়ি ফেরার পালা। বলতে বলতে নিজেই গটগট করে এগিয়ে যায়। পথ হারিয়ে অন্য পথের বাঁকে আসে। মনে মনে গান খোঁজে নতুন। খোকাদের জন্য আজকাল শুধু গান বেঁধে রাখতে হয় মাথায়। পথের গান। বাজারচলতি গান। সাবেকি বাংলা গান। দেশাত্মবোধক গান। সব গানেরই একটাই

সুর। সুর নয়, নিজস্ব বেসুর। কলিগুলোও নিজের মত করে তৈরি করে নেওয়া। কাউকে না পেলে রাস্তাকেই শোনায় গান। শেষ ধাক্কায় কালোয়াতি ছোঁয়াও রাখে অল্প। এভাবে গানই শেষে জীবন হয়ে যায় কবে। পৃথিবীর সব শিশু হয়ে যায় নিজের সন্তান। আর দুপুরের রাস্তাগুলো হয় বেঁচে থাকা। অন্তহীন। অবিরাম।

এভাবেই চলতে চলতে একদিন হঠাৎ খোকার মাকেও পথের ধারে খুঁজে পেয়ে গেল শিবদাস। গান থামিয়ে পাগল থমকে দাঁড়াল। জানলা ধরে কে ওই বিষাদমূর্তি ছবি হয়ে বসে আছে! সেই মুখ, সেই রঙ, সেই ভাসাভাসা চোখ। শিবদাস চিৎকার করে উঠল।

—ও খোকাব মা? ওভাবে বসে আছিস কেন একা একা? খোকা এখনও ফেরেনি বুঝি!

তুলিকা ভয়ানক চমকে উঠল। ছিটকে সরে গেল জানলা থেকে।

শিবদাস ভাঙা গলায় আবাব চেঁচাল—ভয় পাস কেন? ও খোকার মা—গান শুনবি, গান?

বৃদ্ধ উন্মাদটা জানলার ধারে এসে গেছে একেবারে। তুলিকা ঝাঁপিয়ে পড়ে জানলা বন্ধ করে দিল। মাগো. কি লাল লাল চোখ! বাজ পড়ার মত গলার আওয়াজ। জানলার ছিটকিনি তুলে দিয়ে হাঁপাতে থাকল তুলিকা।

চার

শ্রাবণ মাসের গোড়া থেকে পেটেব ভেতর নড়াচড়া শুরু করেছে বাচ্চাটা। কুটকুট আড়মোড়া ভাঙে হঠাৎ হঠাৎ। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে তুলিকা হাত বাখল পেটের ওপর—এই তো এখানটায় নড়ছে। ছোট্ট ঢেউয়ের মত ফুলে উঠল একটু। উঠেই থেমে গেল। তুলিকার বুক ঢিপঢিপ কবে উঠল! আর নড়ছে না কেন? ফোলা পেটে হাত বুলিয়ে আদর করল গর্ভের কুঁড়িটাকে। ছেলেভোলানো গান ধরল গুনগুন—

খোকন আমার সোনা...
স্যাঁকবা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দানা...

ঠিক তখনই জানলার ওপারে পাগলা শিবদাসের গলা শোনা গেল—কই গো খোকার মা, আজ গান শুনবে না?

তুলিকা হেসে ফেলল ফিক করে। পাগল বুড়োর মুখে খোকাব মা ডাকটা শুনতে কেন যে এত ভাল লাগে তার! লজ্জাও করে একটু একটু। এ ডাক শুনেই প্রথম দিন কি ভয় পেয়েছিল! ইস, ভাগ্যিস তখখুনি ঠিকে-ঝি এসে গিয়েছিল কাজে!

শিবদাস আবার ডাকছে,—কি হল রে? ও খোকার মা?

তুলিকা বিছানা ছেড়ে জানলার ধারে গেল। গলায় হালকা অভিমান—তিন দিন আসোনি যে বড়, কোথায় ছিলে?

—পথেই ছিলাম গো। এ রাস্তা, সে রাস্তা। ধুতির খুঁটে মুখের ঘাম মুছল বুড়ো। ঝোলা থেকে আচারের শিশি বার করল একটা—নে তোর জন্য এনেছি।

তুলিকা হাত বাড়িয়ে শিশিটা নিল। গুছিয়ে বসল জানালার ধাপিতে—এবার কিন্তু দাম নিতে হবে, কত দেব বলো?

বুড়ো হাসল ফিকফিক— দাম দিয়ে কি হবে রে! নিয়ে এসেছি—খা।

—তা খাব। তুলিকা মাথা দোলালো—কিন্তু দাম এবার নিতেই হবে। নিশ্চয় তুমি এগুলো বেচতে নিয়ে আসো।

—তা আসি। নইলে বুড়ি বড় বকে যে।

—তবে দাম বলো।

—দূব! শিবদাসও মাথা দোলালো,—সব জিনিস কি দাম দিয়ে কেনা যায় রে?

তুলিকা চমকিত হল। হঠাৎ হঠাৎ এরকমই দার্শনিকের মত কথা বলে ফেলে শিবদাস। বলে শিশুর মত হাসে। এমন মানুষ কি কবে যে পাগল হয়। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে একপশলা। ভেজা আকাশটা এখনও ভারী তবু। ম্লান আলোয় টিমটিম কবছে চতুর্দিক। সূর্য আজ আর রোদ পাঠাতে পারবে না। রাস্তাকেও মটকা মেরে পড়ে থাকতে হবে ভিজে বেড়ালের মত। তুলিকা একটু বুঝি নিশ্চিন্তও বোধ করল। রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে বুড়োর চোখে চোখ রাখল,—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—কি রে?

—তুমি কেন মিছিমিছি রাস্তায় ঘুরে মরো বলো তো?

—বারে, না ঘুরলে তাকে পাব কি করে! শিবদাসের মুখে নির্মল হাসি—ঘুরি বলেই তো খুঁজে পাই।

—ছাই পাও! তুলিকা ঠোঁট কামড়াল—কতদিন তোমাকে বলেছি না এভাবে ঘুববে না রাস্তায়?

—বাহ! না ঘুরলে তাকে তোর কাছে রোজ পাঠাই কি করে?

—আমার কাছে! তুলিকা চোখ কপালে তুলল।

—হ্যাঁরে হ্যাঁ, তোর কাছে। খুঁজে দ্যাখ, তোর ঘরেই রয়েছে সে।

কাকতলীয় কিনা কে জানে, তুলিকার পেটের ভেতর বাচ্চাটা নড়ে উঠল তখখুনি। ঢেউ তুলে এপাশ থেকে ওপাশে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল তুলিকার। কেমন ঘোর-ঘোর লাগছে। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চেতনা। জানালার গ্রীল আঁকড়ে নিজেকে সামলাল। তারপর বুড়ো যেন কত আপন এভাবে তাকাল তার দিকে—আমার খুব ভাবনা হয়, জানো?

—উহুঁ, একদম ভাববি না। শিবদাস চুকচুক শব্দ তুলল গলায়,—গান শুনবি? গান?

নতুন করে উদাস হল তুলিকা।

শিবদাস ডাকল ব্যস্তভাবে—ও খোকার মা, নাচ দেখাই তবে একটা! সেই যে সেই নাচ... ... বলেই চড়া গলায় গান ধরল।

—মাগো, বলো কবে শীতল হব... ... কত দূর আর কত দূর... ...

শিবদাস পাগলার নাচের তালে মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আচমকাই। বুড়োর

হুঁশ নেই কোন। ঘুরে ঘুরে উদ্দাম নেচে চলেছে সজোরে পা ঠুকছে ভেজা রাস্তার পিঠে। প্যাচপ্যাচ আর্তনাদ করছে রাস্তা। তুলিকা খিলখিল হাসছে। হাসতে হাসতে মনখারাপগুলোকে উড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে।

মোড়ের মাথায় থমকে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা কয়েক সেকেণ্ড দেখল অঞ্জন। ঠিক যেন কাচের অ্যাকোয়ারিয়ামে দুটো রঙিন মাছ খেলছে, হাসছে। শূন্যে লাফিয়ে বাতাস ভরতে চাইছে বুকে। পুরোটাই একটা পরিপূর্ণ ভালো লাগার দৃশ্য। কিন্তু সব ভালো লাগার দৃশ্যকে তো আর চিরন্তন করে রাখা যায় না। বুক নিংড়ে দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল। মাথা নিচু করে নিঃশব্দে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল অঞ্জন।

বৃষ্টি নেমেছিল আবার। অঝোর ধারায়। রাত যত গাঢ় হচ্ছে, বৃষ্টির তেজ বাড়ছে তত। নির্জীব হয়ে আসছে পৃথিবী। এখন বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। এখনই কথাটা বলে ফেলা দরকার। কিন্তু কিভাবে যে শুরু করা যায়। অঞ্জন ছটফট করে উঠল—তুলি, আজ আমি ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলাম।

কথাটা কি খুব নিচু স্বরে বলল! নাকি মনে মনে! তুলিকা শুনতেই পেল না। নিজের মনে গুনগুন গান গাইছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল খুলে ফেলল। ঘুরে ঘুরে দেখল গর্ভবতী যৌবনটাকে।

বুক ভারী হয়ে আসছে অঞ্জনের। তুলিকা আজকাল খুশিতে ঝলমল করে সারাক্ষণ। আশ্চর্য! একটা বদ্ধ পাগলের অর্থহীন বিশ্বাস কি করে যে এত শক্তি এনে দিতে পারে! ভয়কে জয় করার শক্তি! অঞ্জন বিছানা থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল। অসম্ভব, এখন আর তুলিকাকে কিছুতেই ওই ভয়ঙ্কর কথাগুলো শোনানো যায় না।

বিনুনিতে গার্ডার বেঁধে তুলিকা কাছে এল তার—শোন এবার তুমি মাকে একটা খবর দিতে পারো, বুঝলে?

অঞ্জন অন্যমনস্ক হবার ভান করল।

—কি হল, শুনছ না? তুলিকা আলগা ঠেলা দিল কাঁধে—বেশ, মাকে নয় আর কদিন পরেই আনলে। রাতদিনের লোক পাচ্ছি একটা, তাকেই না হয় রেখে দিই কি বলো? ডাইনিং স্পেসটায় শোবে?

অঞ্জন মুখ ঘুরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল বাইরের দিকে। একেবারে গায়ের পাশে দাঁড়িয়ে তুলিকা। দুর্বল জরায়ুতে উল্টোমুখে সন্তান ধারণ করে। অস্থির অঞ্জন সিগারেট ফেলার ছল করে জানালার ধারে চলে এল। উদভ্রান্ত মুখে তাকাল রাস্তার দিকে। জোলো হাওয়ায় চারদিক ঝাপসা। আধো অন্ধকারে রাস্তাটাকে কি কুৎসিত লাগছে! ঠিক যেন এক চুল খোলা ডাইনী লক্ষ লক্ষ দাঁত বার করে তার দিকে তাকিয়েই খলখল হাসছে। মাথাটা কেমন দুলে উঠল। গলার কাছে দমবন্ধ করা কষ্ট। রাস্তার কি সত্যি কোন ভূমিকা থাকে? কেড়ে নেওয়ার? ফিরিয়ে নেওয়ার? অঞ্জন বুঝতে পারছে না। শুধু টের পাচ্ছে রাস্তাটার হাত থেকে কোন ভাবে নিস্তার নেই কারোরই। তুলিকার না। শিবদাসের না। কারুর না। বিফল আক্রোশে জ্বলন্ত সিগারেটটা রাস্তার গায়ে ছুঁড়ে মারল অঞ্জন। তারপর আচমকাই প্রচণ্ড শব্দ করে বন্ধ করে দিল জানলাটাকে।

আমার এখন সময় নেই

খবরটা পেলাম রাত নটায়। দরজা খুলেই সুজাতা বলল, শুনেছ কী হয়েছে?

—কী?

—তুমি জানো না! অনুতোষদা মারা গেছে!

কফিহাউস থেকে ফুরফুরে মেজাজে বাড়ি ফিরেছি, কথাটা প্রথমে আমার মাথাতেই ঢুকল না, কে মারা গেছে?

—অনুতোষদা? আমাদেব অনুতোষদা?

অনুতোষ মারা গেছে! যাহ, তা কী করে হয়! দিব্যি পঁয়তাল্লিশের টগবগে মানুষ, জোয়ানই বলা যায়, অসুখবিসুখেবও কোনও খবর শুনিনি, সে হঠাৎ মাবা যাবে কেন? মৃত্যু কি এতই সুলভ?

সুজাতা বলল, একটু আগে দীপিকাদিব ফোন এসেছিল। নামখানাতে নদীতে ডুবে গিয়ে...

সুজাতার গলা বুজে এল। আমিও ধপ করে সোফায় বসে পড়েছি। এতক্ষণ কফিহাউসে ছিলাম, কেউ তো কিছু বলল না ওখানে! নাকি ওখানেও কেউ খবর পায়নি! আমারই মতো।

ঘনিষ্ঠ কারুর মৃত্যুসংবাদ শুনলে আমাব বুক ধড়ফড় করে, পা কাঁপতে থাকে, হাতেব জোর কমে যায়, তালু শুকিয়ে আসে অজানা ভয়ে। এখন সেরকমটাই হচ্ছে! তার মানে অনুতোষ আমার ঘনিষ্ঠজন ছিল!

দু-এক মিনিট রুদ্ধবাক আমি কোনওক্রমে প্রশ্ন করলাম, কবে? কখন?

সুজাতা পাশে বসে আমার কাঁধে হাত রাখল। তারও স্বর কাঁপছে, আজই সকালে। বকখালি যাবে বলে হাতানিয়া দোয়ানিয়া পার হচ্ছিল, হঠাৎ নৌকো থেকে পড়ে...

—কীভাবে পড়ল! ওখানে তো নৌকো-ফৌকো উল্টোয় না! এতটুকু সরু নদী।

—আমি তো সে কথাই ভাবছি, একটা জলজ্যান্ত মানুষ হঠাৎ কেন জলে পড়ে যাবে?

—আত্মহত্যা করল, না অ্যাক্সিডেন্ট! সঙ্গে কে ছিল?

—আমি অত ডিটেলে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। তুমি দীপিকাদিকে একটা ফোন করো না।

—দীপিকা ফোনে আমার কথা কিছু বলল?

—না তো! কী বলবে?

—আমার কালকের প্রাইজ পাওয়া নিয়ে কিছু...? বলেই কোঁত করে গিলে ফেলেছি কথাটা। এ কথা কেন মুখ থেকে বেরিয়ে এল? এমন অসময়ে?

বিভাবতী স্মৃতি পুরস্কার কমিটি এ বছরের শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করেছে। গত সোমবার। তারপর থেকে অজস্র অভিনন্দন পেয়ে চলেছি। ঘরে বাইরে। রাস্তায়। অফিসে। বাড়িতেও মাঝে মাঝেই ফোন বেজে উঠছে। এই তো আজই

কফিহাউসে ছোটখাটো একটা সম্বর্ধনা পেলাম তরুণতর প্রজন্মের লেখকদের কাছ থেকে। সমসাময়িক লেখকরা ঈর্ষা গোপন করে আমার প্রশংসা করছে। কষ্ট লুকিয়ে বন্ধুবান্ধবরাও। সুবীর। বিমান। নির্মল। দীপাঞ্জন।

ব্যাতিক্রম শুধু দুজন। অনুতোষ আর দীপিকা।

মৃত মানুষের ওপর অভিমান সাজে না। কিন্তু দীপিকা?

দীপিকা একটু দেরিতে লেখা শুরু করেছে। এখন মাঝেমাঝেই নানান পত্রপত্রিকায় তাব গল্প-উপন্যাস বেরোয়। আমার মতো না হলেও লেখার জগতে নামও হয়েছে অল্পস্বল্প। যদিও লেখা খুব একটা আহামরি নয়। মেয়েদের মধ্যে মোটামুটি। কানাদের মাঝে ঝাপসা। তা ছাড়া মেয়ে হওয়ার আলাদা সুবিধেটাও তো আছে। ভ্রূকুটির ধনুর্বাণ আছে। চপল হাসির পাশুপৎ অস্ত্র আছে! একটু আহ্লাদী-আহ্লাদী স্বরে কথা বললে গল্প না ছেপে উপায় আছে সম্পাদকের! আরে বাবা, এটা তো অবধারিত সত্য. মেয়েদের মধ্যে কোনও গভীর ভাববোধ নেই! দৃষ্টিভঙ্গিও সংসারের পানাডোবার বাইরে বেরোয না। মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি কি মেয়েদের দিয়ে হয়? তবু ওই এলেবেলেরও কী ডাঁট! অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না!

এই সব আকাশপাতাল দ্বিধায় ইতস্তত আমি, সুজাতা আবার বলল, কী হল? ফোন করো?

—কী হবে ফোন করে? দীপিকা কি অনুতোষের সঙ্গে ছিল? অনুতোষকে স্বচক্ষে জলে পড়ে যেতে দেখেছে?

আমার কথার ভঙ্গিতে সামান্য রুক্ষতা ছিল। সুজাতা ম্লানমুখে বলল, দীপিকাদি খবরটা দিয়ে তোমাকেই খুঁজছিল। দ্যাখো না যদি আরও ডিটেলস-এ জানা যায়।

—ডিটেলস আবার কী? মৃত্যুর আবার ডিটেলস হয় নাকি?

সুজাতা হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমার গলায় এতক্ষণে একটা কষ্ট চাক বাঁধছিল। পুটপুট করে পিন ফুটছিল শরীরে। বেশ খানিকক্ষণ পর ঢোক গিলে বললাম, আমার ভাল্লাগছে না সুজাতা। একটা লোক...সকালেও বেঁচে ছিল...আরও কত কাল বেঁচে থাকার কথা...অথচ এখন বেঁচে নেই! আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

পাশের ঘর থেকে টুকাইয়ের গলা ভেসে আসছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইতিহাস মুখস্থ করছে টুকাই। ইউরোপের ইতিহাস। ক্রুসেড। শার্লামেন। সিংহহৃদয় রিচার্ড। জোরে না পড়লে কোনও কিছুই টুকাইয়ের মাথায় ঢোকে না। আজ টুকাইয়ের ভাঙা স্বর বড় কানে বাজছে। সুজাতাকে বললাম, টুকাইকে একটু আস্তে পড়তে বলতে পারো না? আজকাল ওইভাবে গাঁকগাঁক করে পড়ে কেউ?

সুজাতা এখনও দেখছে আমাকে, তুমি তাহলে ফোন করবে না? তোমার একটুও জানতে ইচ্ছে করছে না অনুতোষদার কথা?

করছে। ভীষণভাবেই করছে। কিন্তু দীপিকাকে আমি ফোন করব না। গত সাত দিনে সে আমাকে একটিবারও অভিনন্দন জানানোর সৌজন্য দেখায়নি, আমি কেন তাকে ফোন করতে যাব।

জানলার পাশে গিয়ে সিগারেট ধরালাম। ওপারে পুষ্পহীন কৃষ্ণচূড়া গাছ ধোঁয়াশা মেখে দাঁড়িয়ে। একা। আমাকে দেখছে।

সুজাতা নিচু স্বরে বলল, শুনেছি সাত পা একসঙ্গে হাঁটলে নাকি বন্ধুত্ব হয়, তুমি অনুতোষদার সঙ্গে কুড়ি বছর ধরে একসঙ্গে হাঁটছিলে!

সারা জীবন একসঙ্গে হেঁটেও কি সত্যিকারের বন্ধু পাওয়া যায়! মানুষ তো আজীবন একাই। তা ছাড়া সৃষ্টিশীল শিল্পীদের বন্ধু থাকেও না। থাকে বড়জোর জোট অথবা শুভার্থী। সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে তাদেরও নাম গন্ধ বর্ণ বদলে যায় বারবার। প্রয়োজন অনুসারে। স্বার্থের তাগিদে। সেই সুবাদে অনুতোষও কবেই দূরের মানুষ। তবু আজ একটা খবর নেওয়া উচিত। বিমানকে ফোন করলে কেমন হয়! আমাদের মধ্যে বিমানেব সঙ্গেই যা শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল অনুতোষের।

বিমান নয়, বিমানের বউ ফোন ধরেছে। উত্তেজিত গলায় বলল, ইশশ, কী হয়ে গেল বলুন তো! ও ভীষণ ভেঙে পড়েছে। একটু আগে অনুতোষদার বাড়ি থেকে ফিরল। ফিরেই ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। ডাকব?

—ডাকো।

বিমানের গলা ধরা-ধরা, তুই কার কাছে খবর পেলি?

—দীপিকা ফোন করেছিল এখানে। ব্যাপারটা ঠিক কী হযেছিল বল তো?

—কী আর হবে! নিয়তি!

—নৌকো থেকে পড়লটা কী করে? নেশা-টেশা করেছিল নাকি?

—নাহ, সেরকম তো কিছু শুনলাম না। কেউ বলছে নৌকোর ধারে বসেছিল, হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পা স্লিপ করে...। কেউ বলছে ইচ্ছে করে...। কিছুদিন ধরে খুব ডিপ্রেশানেও ভুগছিল তো।

—সঙ্গে কেউ ছিল না? ইদানীং শুভেন্দু বলে কে এক নতুন বন্ধু হয়েছে শুনেছিলাম?

—না না, সে-ও ওর সঙ্গে বেরোত না। ও একাই ছিল। একা-একাই হুটহাট বেরিয়ে যেত। কে ওর বোহেমিয়ানিজমের সঙ্গে পাল্লা দেবে?

—হুঁ। একটু সময় নিয়ে বললাম, বাড়ির অবস্থা কী দেখলি?

—রিমা একেবারে পাথর হয়ে গেছে। ছেলেটা প্রাণপণে স্টেডি থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু কী করে পারবে বল? মাত্র তো সতেরো বছর বয়স। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে চোখের জল আর সামলাতে পারে না...

—অনুতোষকে নিয়ে এসেছে?

—না। বড় শালা আনতে গেছে। ওখানকার হসপিটালে ফোন করা হয়েছিল। পোস্টমর্টেম করে বডি আনতে আনতে কাল সকাল দশটা-এগারোটা হয়ে যাবে। বিমান দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কী যে কাণ্ডটা করে বসল অনুতোষ! তুই কাল সকালে আসছিস তো? ওর বাড়িতে? সুবীর, দীপাঞ্জনরা অবশ্য স্ট্রেট শ্মশানে চলে যাবে বলেছে। অফিস ঘুরে।

কে যেন আমার স্নায়ুতন্ত্রী ঝেঁকে দিয়ে গেল। দম চেপে বললাম, কী করি বল

তো? কাল সকালেই আমার আবার বর্ধমান যাওয়ার কথা...

বিমান একটু চুপ মেরে গেল। তারপর বলল. ও। তোর সেই প্রাইজের ব্যাপারটা আছে, না?

—হুঁ। সক্কালবেলায়ই বেরিয়ে পড়ব ভেবেছিলাম...

—তুই তা হলে আসছিস না?

—ইচ্ছে তো করছে। ওদিকে প্রাইজ না নিতে যাওয়াটাও খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে না? আমারই জন্য অনুষ্ঠান? দেখি যদি সময় পাই সকালে একবার ঘুরে যাব।

ফোন ছেড়ে দিয়ে মনে মনে বললাম. কী করে যাব আমি? আমার এখন সময় নেই। আমার এখন সময় নেই।

দুই

খাওয়াদাওয়া সেরে খাতা-কলম নিযে বসেছি আমি। কালকের সভার জন্য একটা সুন্দর ভাষণ তৈরি করতে হবে। একরাশ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কী লিখি, কেন লিখি. কীভাবে লিখি, এ সব বিশ্লেষণ করা কি মুখের কথা? আগে থেকে খসড়া করে নিলে অনেক সুবিধে হয়, ঘাবড়ে গিয়ে গুলিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। তার ওপর কাল ওখানে দুজন মন্ত্রী আসবেন। ভারতীয় সাহিত্য পরিষদের দু-একজন প্রতিনিধিও থাকবেন। তাঁদের সামনে বক্তৃতা দিতে উঠব আমি। প্রস্তুত হয়ে যাওয়াটাই তো ভাল।

বহুক্ষণ ঘষেও খুব বেশি এগোনো গেল না। শুরুটা কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছে না। একটা-দুটো লাইন কলমের ডগায় এসেও পিছলে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে কাগজ থেকে। প্রথম ছাপানো কবিতাটা দিযে শুরু করব? পাথরে কোঁদা বুক/দাও হে কুঠারে শান/ ...সে নয় শুরুটা হল, তারপর?

সুজাতা মশারি টাঙিয়ে শুযে পড়েছে. পাশবালিশ সরিয়ে রেখে হঠাৎই উঠে বসল বিছানায়। ফ্যাসফেসে গলায় বলল. অনুতোষদা তোমায় খুব ভালবাসত।

যে দু-চার লাইন মাথায় আসছিল, তাও হুশ করে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে। অনুতোষ যে আমাকে ভালবাসত, তা কি আমি জানি না? আমার চেয়ে সে কথা আর কে বেশি জানে!

'জল' পত্রিকায় প্রথম আমার একটা গল্প পড়েছিল অনুতোষ। কয়লাখনির গল্প। তখন আমি সদ্য আসানসোল থেকে কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছি। ওখানকার কুলিকামিনরা তখনও আমার রক্তে মিশে আছে। গল্পটা মূলত ছিল তাদের নিয়েই। গল্পটা পড়ে মুগ্ধ অনুতোষ পত্রিকা অফিস থেকে আমার ঠিকানা জোগাড় করে ফেলল। খুঁজে খুঁজে সাতসকালে আমার বাড়ি এসে উপস্থিত। বেহালা থেকে চেতলায়। আলাপের আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনি থেকে তুমি। দু ঘণ্টার ভেতর তুই। অনুতোষ তখন নিজেও একটা কাগজ বার করছে। শুভম। খুবই ছোট পত্রিকা। বহুদিন ধরে পত্রিকাটা চালিয়েছিল অনুতোষ। শুধুই গল্পের পত্রিকা। আমাকে সেখানে একটা বড় গল্প লিখতে

বলল। পুজোসংখ্যার জন্য। আমার তখন কলমের হাল সদ্য দাঁত-ওঠা শিশুর মতো। অবিরাম শুলোচ্ছে। বুকের ভেতর যত কথা জমা আছে, সবই তখন অক্ষরের স্রোত হয়ে ধেয়ে আসতে চায়। স্মৃতি থেকে স্বপ্ন, বেদনা থেকে আসক্তি, জন্মমুহূর্ত থেকে পঁচিশ বছর বয়স, সব।.

মনপ্রাণ ঢেলে অনুতোষের কাগজে গল্প লিখেছিলাম। একটি নৈঃশব্দ্যের অপমৃত্যু। গল্পটা লিখে নাম হয়েছিল কিনা জানি না, তবে তুফান যে একটা উঠেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তুফানটা তুলেছিল অনুতোষ স্বয়ং। কফিহাউসের আড্ডায়। বইমেলায়। গল্পপাঠের আসরে। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনেব দপ্তর থেকে শুরু করে নামী দামী লেখকদের বাড়ি গিয়ে আমার গল্পের বিজ্ঞাপন করত অনুতোষ। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় একটা ছেলে আমার লেখার সমালোচনা করেছিল বলে তার নাকে ঘুষি মেবে হইহই ফেলে দিয়েছিল চারদিকে।

অথচ অনুতোষ তখন নিজেও লিখছে। একটা গল্পেব কালেকশান বার হয়েছে। দুটো উপন্যাস। উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে সে-ও তখন প্রথম সারিতে। নিজেব খ্যাতিব জন্য না ভেবে অন্যের স্তুতির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তে একমাত্র অনুতোষই পারত। কেউ একটু ভাল লিখলেই তাব জন্য পাগল হয়ে ওঠা ছিল অনুতোষের স্বভাব।

সেই অনুতোষ আজ ডুবে গেছে হাতানিয়া দোয়ানিয়ায়!

যে নেই, সে নেই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও নেই।

আমি আছি। আমি থাকব। আমাকে কাল যেতেই হবে বর্ধমান।

সুজাতার দিকে ফিরে তাকালাম, শোনো, আমি কিন্তু কাল সাতটার মধ্যে বেরিয়ে যাব।

—অনুতোষদার বাড়ি যাবে? আমিও যাব। এ সময়ে আমাদেরই তো রিমার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত।

বিরস মুখে বললাম, আমি যাচ্ছি না। আমার বর্ধমান যাওয়া আছে। পারলে তুমি ঘুরে এসো।

—তুমি অত সকালে বর্ধমানে গিয়ে কি করবে?

—দশটার সময় ওদের লোক আমার জন্য স্টেশনে ওয়েট করবে।

—অনুষ্ঠান তো তোমার দুটোয়। সকালে একবার ঘুরে যেতে অসুবিধে কী?

—বলছি না সকলে অপেক্ষা করবে! আমাকে নিয়ে ব্যাপার, আমি যদি টাইমলি না পৌঁছোই...

—তুমি তাহলে কাল অনুতোষদার ওখানে যাবেই না?

—পরে যাব।

—পরে কেন? একবার শেষ দেখাও করবে না?

এ তো মহা গেরো হল। কী করে সুজাতাকে বোঝাই, আমাকে কাল একটু আগে যেতেই হবে। মন্ত্রী, ভাষা·পরিষদের লোকজনদের সঙ্গে হোটেলে লাঞ্চ আছে। যে কোনও পরিচয়ই খাবার টেবিলে সব থেকে বেশি গাঢ় হয়। মূল্যবান সম্পর্ক গড়ে

তোলার এমন স্বর্ণসুযোগ হাতছাড়া করে কেউ?

আবেগ আমারও আছে। অনুতোষের জন্য আমারও কম মনখারাপ হচ্ছে না। তবে সুজাতার মতো বেহিসেবি আবেগ আমার সাজে না। অন্তত যৌবনের এই প্রান্তসীমায় এসে। তার চেয়ে বরং নিক্তিতে মেপে গল্প-উপন্যাসে আবেগ ছড়িয়ে দেব, পড়তে পড়তে থম মেরে যাবে পাঠকের বুক। ছেলেমানুষি জোলো সেন্টিমেন্ট কি আমাকে মানায়? অনুতোষের মতো?

অনুতোষের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল মহাবোধি সোসাইটি হলে। মাস পাঁচেক আগে। এক তরুণ কবির মৃত্যুতে শোকসভা হচ্ছিল, একদম শেষ বেঞ্চে বসেছিল অনুতোষ। আমাকে দেখে উঠে এল, হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাইরে, চল, একটু কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে গিয়ে বসি। এখানে আমার কেমন দমবন্ধ হয়ে আসছে।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। গোলদিঘি থেকে জোলো বাতাস উঠছিল। পাশাপাশি বসে রইলাম দুজনে। বহুক্ষণ।

অনুতোষই প্রথম বরফ ভাঙল, ছেলেটার কী প্রতিভা ছিল, অথচ দ্যাখ কেমন দুম করে মরে গেল। এত তাড়াতাড়ি কী করে যে মরে মানুষ!

আমি কপালে আঙুল ঠেকালাম, ভাগ্য। আমাদের কার যে কখন কোথায় মৃত্যু হবে!

অনুতোষ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, তুই ভাগ্য মানিস?

—এমনিতে মানি না। আমি হেসে ফেললাম, চাকরির প্রোমোশনের সময়ে মানি। বই বিক্রির সময়ে মানি। ছোটবেলাতেও মানতাম। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর আগে।

—যাক, এখনও তা হলে সত্যিটা স্বীকার করার সৎসাহস তোর আছে!

—তুই কি বলতে চাইছিস?

অনুতোষ বিষণ্ণ চোখে তাকাল, দীপেন, তুই অনেক বদলে গেছিস রে। আগে তোর নিজের ওপর কনফিডেন্স এত কম ছিল না। তোর লেখা শেষ হয়ে আসছে দিন দিন। কথায় কাজে কন্ট্রাডিকশান থাকলে ভাল লেখা বেরোয় না রে।

আমার রাগ হয়ে গেল। সিগারেট ধরিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললাম, ফুরোচ্ছিস তুই—আমি না। এ বছরও আমি তিনটে উপন্যাস লিখছি। গোটা কুড়ি ছোট গল্প।

অনুতোষ তড়াং করে উঠে দাঁড়াল, নাম্বার রিপ্রেজেন্টস নাথিং। তুই যা বিশ্বাস করিস না, তাই লিখিস। ইউ আর এ বিগ জিরো!

অনুতোষ এখন শুয়ে আছে লাশকাটা ঘরে।

আমি পাচ্ছি এ বছরের শ্রেষ্ঠ তরুণ গল্পকারের পুরস্কার।

ওই মূর্খের জন্য সময় নষ্ট করব আমি?

জানলার পর্দা ছিঁড়ে ভাষণের লাইন ক'টা আবার ঢুকে পড়ছে ঘরে। টেবিল ল্যাম্পের চারদিকে ঘুরপাক খেল কিছুক্ষণ। তারপর ডানা মেলে কাগজে বসল। সঙ্গে কিছু দৃশ্যকল্পও নিয়ে এসেছে তারা। আমার প্রথম জীবনের সাহিত্যের অনুপ্রেরণা।

কয়লাখনির খাদানে বেলচা মারছে মজুর। ঘামে কালিতে তাদেরই শরীর কখন কালো মানিক। হঠাৎ কোনও অজ্ঞাত ফাটল দিয়ে জল ঢুকতে শুরু করল খনিতে। একে একে ডুবে গেল সার সার শ্রমিকের দেহ। ফ্রক পরা বালিকা শবদেহের ঢাকা সরিয়ে নিজের বাবার শরীর খুঁজছে। জলের নীচে বাবা তখন পরিপূর্ণ অঙ্গার।

আমি কাতর গলায় সুজাতাকে বললাম, তুমি তো জানো সুজাতা, আমি একদম ডেডবডি স্ট্যাণ্ড করতে পারি না! কেন আমাকে বার বার জোর করছ?

সুজাতা তবু অবুঝ, ভাল করে ভেবে দ্যাখো কেন জোর করছি!

কী করে ভাবব? শব্দরা এসে গেছে! শব্দরা এসে গেছে!

আমি ফিসফিস করে বললাম, চুপ থাকো। এখন আমার সময় নেই।

তিন

—বন্যার ওপর লেখা আপনার উপন্যাসটা এখনও আমার হাড় কাঁপিয়ে দেয়।

মন্ত্রীবাক্যে আমার রোমে রোমে হর্ষ জাগছিল। এত কাজের মাঝেও আমার মতো একজন লেখকের লেখা ইনি পড়েছেন!

—খরা বা অনাহারের ওপর আপনাব তো তেমন লেখা দেখি না। এ সব নিয়েও তো আপনাদের লেখা উচিত। এই যে কালাহাণ্ডিতে এত বড় একটা অনাবৃষ্টি চলছে...

—না, মানে...আমি ঘাড় চুলকোলাম, ওদিকে তো বড় একটা যাইনি। স্বচক্ষে না দেখলে আমি আবার ঠিক লিখতে পারি না।

—দেখে আসুন। ঘুরে আসুন। কে বলেছে আপনাকে না দেখে লিখতে! অন্ধ্র ওড়িশার দিকে কিছু কালচারাল ডেলিগেট পাঠাচ্ছি, যাবেন আপনি? সঙ্গে ট্যুরিং স্পটগুলোও দেখে আসতে পারেন।

আমি নীরব থাকি। নীরব থাকাটাই এ মুহূর্তের দস্তুর। শব্দহীনতাই শ্রেষ্ঠ সম্মতি।

স্থানীয় এক আডিটোরিয়ামে বেশ বড়সড় সভার আয়োজন করেছেন উদ্যোক্তারা। আমার পুরস্কারটিও ভারী মনোরম। সপ্তাশ্ববাহিত রথে ছুটছেন সূর্যদেব। ব্রোঞ্জের মূর্তি। বেশ পাকা হাতের কাজ। সঙ্গে একটা শাল। ফুল। আর দশ হাজার টাকার চেক।

সভা ভাঙার পর স্থানীয় পত্রিকার কয়েকটা ছেলে আমার সাক্ষাৎকার নিতে এল। তারা শুধুই আমার স্টেজের ভাষণে তৃপ্ত নয়, নতুন করে তাদের আবার আমার লেখার উদ্দেশ্য বোঝাতে হবে।

ছেলেগুলোর প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমি যখন প্রায় বিধ্বস্ত, এক ছোকরা ঝপ করে জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনি তো লেখক অনুতোষ দত্তকে খুব কাছ থেকে চিনতেন, তাই না?

এ প্রশ্ন যে কখনও না কখনো উঠবেই আমি জানতাম। আজই সমস্ত বাংলা দৈনিকে অনুতোষের মৃত্যুসংবাদ বার হয়েছে। গহীন জলে ডুবে গেলেন উদীয়মান সাহিত্যিক। অনুতোষ দত্তর অপমৃত্যু। নদীতে তলিয়ে গেলেন সত্তর দশকের গল্পকার।

মুখ থেকে হাসি মুছে নিলাম, কে না তাকে চিনত ভাই। সে তো শুধুই গল্পকার

ছিল না, সে ছিল আমার এক সময়ের সুহৃদ। আমরা একসঙ্গে গল্পের কাগজ করেছি। গল্প নিয়ে কত হইচই করেছি। জীবনমুখী গল্পের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছি।

—কিন্তু আমরা তো গত পাঁচ-সাত বছর ধরে অনুতোষবাবুর সেরকম লেখা পাইনি? উনি কি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারলাম না। প্রশ্নটা আমাকেও ধাক্কা মেরেছে অনেক বার। অনুতোষটা বড় এলোমেলো ছিল। সেটাই কি কারণ? আজ ক্যানিং ছুটছে, কাল বসিরহাট, পরশু মালদা, পরদিন কেঁদুলি। প্রবাদ ছিল অনুতোষকে নাকি একসঙ্গে একই সময়ে দক্ষিণেশ্বর, বেহালা আর সন্দেশখালিতে দেখা যায়। যে মানুষ এক মুহূর্ত নিজেকে স্থিত করতে পারে না, যার চিন্তায় কোনও গৃহস্থালি নেই, সে কি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে গল্প লিখবে? শুধুই একবুক ভাব নিয়ে কি লিখে ওঠা যায়?

আশ্চর্য! এই নিয়ে অনুতোষের কোনও দুঃখবোধ ছিল না। কিংবা হয়তো ছিল। কোনও কিছু ঠিক মনোমত লিখতে পারছিল না বলেই ছটফট করত দিন-রাত! উন্মত্তের মতো দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াত! লেখার উপকরণ খুঁজতে গিয়ে লেখাটাকেই হারিয়ে ফেলেছিল অনুতোষ।

আমি যুবকের দিকে তাকালাম, হয়তো অনুতোষ পারছিল না। লেখকরা অনেক সময়ই ভেতর থেকে ফুরিয়ে যায়।

এক তরুণ কপালে ভাঁজ ফেলে প্রশ্ন ছুঁড়ল, এই যে স্যাড দুর্ঘটনাটা, অনুতোষবাবুর হঠাৎ নৌকো থেকে পড়ে মারা যাওয়া, এর সঙ্গে কি ওঁর হতাশার কোনও যোগ আছে বলে আপনার মনে হয়?

এত কচকচি আমার ভাল লাগছে না। অনুতোষ যখন জলে পড়ে যায়, তখন তার মনের অবস্থা কী ছিল আমি কী করে বলব? তাকে নিয়ে এত প্রশ্নের জবাবই বা কেন আমি দেব?

হঠাৎ আমার নাকে যেন ঘুষি মারল কেউ। আমি অনুতোষকে নিয়ে ভাবব না ঠিকই, কিন্তু অনুতোষ আমাদের জন্য ভাবত একসময়। আমাদের অনেকের জন্যই ভাবত। এই যে দীপিকা আজ দীপিকা হয়েছে, তার মূলেও তো অনুতোষ। কারণ ছাড়াই কী নাচানাচিটাই না করত দীপিকার লেখা নিয়ে! সেই দীপিকা গত মাসে কফিহাউসে বসে অবলীলায় নিন্দা করে গেল অনুতোষের। অনুতোষ আর আগের মতো বন্ধুবৎসল নেই! অনুতোষ অন্য সকলের লেখা নিয়ে এখন ভীষণ জেলাস! অনুতোষ এখন যাচ্ছেতাই!

আরেকটা ঘুষি পড়ল নাকে। শুধু দীপিকা কেন, যার লেখা যখন ভাল লেগেছে, তার জন্য জীবনপাত করেনি অনুতোষ? নামী পত্রিকা থেকে নিজের গল্প তুলে নিয়ে অন্যের গল্প সম্পাদকের হাতে তুলে দেওয়াকে কী বলে?

শুধু লিখতে না পারার হতাশা? না সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা? কোনটা বেশি পীড়িত করেছিল অনুতোষকে?

দূর, সঙ্গীরা কী করবে? আমি কী করব? অনুতোষের টালমাটাল চলার সঙ্গে যদি পা মেলাতে না পারি, সে দোষ কি আমার? তা ছাড়া অনুতোষ এখন ফুরিয়ে

যাওয়া শক্তি। তার পত্রিকাটাও উঠে গেছে। কেউ আর তাকে পাত্তা দেয় না। কিসের জন্য বন্ধুরা তাকে আঁকড়ে থাকবে? হৃদয় ছাড়া আর কী ছিল তার? সে নিজেই এক মূর্তিমান ব্যর্থতা!

আমি কথা ঘুরিয়ে বললাম, হতাশা সব লেখকের মনেই থাকে। কোনও না কোনও ভাবে। হেমিংওয়ে তো লিখতে না পারার দুঃখে রিভলবার দিয়ে সুইসাইড করেছিলেন!

পাঁচটা বেজে গেছে। হেমন্তের দুপুব নির্জীব হয়ে আসছে ক্রমশ। উপহার কিটসব্যাগে গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, চলি ভাই।

যুবকদের মুখে অতৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠেছে. আবও কযেকটা প্রশ্ন ছিল যে। আচ্ছা, আপনি যখন লেখেন. তখন কি গল্পের পূর্ণ চেহারাটা আপনাব চোখের সামনে ভেসে থাকে?

এ প্রশ্নের উত্তব দিয়ে লাভ নেই। উত্তব দিলেই নতুন প্রশ্ন আসবে। আসবেই। এই বয়সে শুধুই প্রশ্ন জমা হতে থাকে বুকে। সার সাব। বর্ষাঋতুব আগে পিঁপড়েদের মতো।

সামনেব ছেলেটিব কাঁধ চাপড়ে দিলাম, আবাব আসব আমি। তখন যত খুশি প্রশ্ন কোরো। এখন আমার একদম সময় নেই।

চার

রাতেব শরীর মাড়িয়ে ফাঁকা বাস সাঁইসাঁই ছুটছিল। বর্ধমান থেকে লোকাল ধরে হাওড়া স্টেশন, স্টেশন থেকে বাস, এবার আমার ফেরার পালা। পুজোয় বেরোনো উপন্যাসটা নিয়ে আজ রাত থেকেই বসব ভাবছি। পুজোসংখ্যার জন্য তাড়াহুড়ো করে লেখাতে অনেক ফাঁকফোঁকর থেকে গেছে. বইমেলায় বই হয়ে বেরোবার আগে ভালমতো ঘষামাজা দরকার। মাঝের দিকের চ্যাপ্টারগুলো বাড়াতে হবে, প্রকাশকরা বলে উপন্যাসটা একটু মোটার দিকে থাকলে কাটতিটা ভাল হয়।

হাজরার মোড পার হয়ে বাসটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। ড্রাইভার-কণ্ডাক্টররা মিলে চেষ্টা করল খানিকক্ষণ, কয়েকবার গরগর করল বাস, হেঁচকি তুলল, তারপর পুরোপুরি নিথর।

গোটা পনেরো যাত্রী রয়েছে বাসে. সকলের মুখেই গৃহে ফেরার উদ্বেগ। হেমন্তের শিরশিরে বাতাসে কম্ফর্টার জড়ানো এক প্রৌঢ় কণ্ডাক্টারদেব উদ্দেশে হাঁক মারল, কী হে, পুরোপুরি দেহ রাখল নাকি?

কণ্ডাক্টার হেল্পারের কাছ থেকে বিড়ি নিয়ে ধরাল, বোধহয় সেলফ ফেঁসে গেছে, কি বলো পার্টনার?

ড্রাইভার গম্ভীর মুখে বলল, হ্যাঁ, ঠেলতে হবে।

চার মহিলা ছাড়া বাকিরা বাস থেকে নেমে পড়েছে। সকলের দেখাদেখি আমিও হাত লাগিয়েছি। হেঁইও মারি জোয়ানদারি। হেঁইও মারি জোয়ানদারি! একটু গড়িয়ে এবার একটা জোর হিক্কা তুলল বাস, তারপরেই পুরোপুরি মৃত।

অন্য যাত্রীরা ভাড়া ফেরত নিয়ে কণ্ডাক্টরের সঙ্গে বচসা জুড়েছে, ছোট্ট ভিড় জমেছে রাস্তায়। মেহনতি জনগণের কাছ থেকে পয়সা উদ্ধার করা তাদের নিয়ে গল্প লেখার থেকে অনেক বেশি কঠিন। আমি আর দাঁড়ালাম না। বাড়ি পৌঁছতে মাইলখানেকও বাকি নেই, রাত হয়েছে হোক, এটুকু রাস্তা হেঁটেই মেরে দেব আজ।

চেতলা ব্রিজের কাছে এসে একটা সিগারেট ধরালাম। দুপুরের খাওয়া বেশ হেভি হয়ে গেছে, এখনও মাংসের ঢেকুর উঠছে। সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য আমার কাঁধে। মূর্তিটা তেমন ভারী নয়, তবু ঘাম হচ্ছে অল্প অল্প। ক্লান্তিতে। শারীরিক অস্বস্তিতে।

একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ধেয়ে এল হঠাৎ। শ্মশানের দিক থেকে। মাংস হাড় আর চর্বি পোড়ার ধোঁয়া।

আমি নিথর। অনুতোষ তো এই শ্মশানেই এসেছিল আজ! কখন এসেছিল? কিসে পোড়ানো হল অনুতোষকে? ইলেকট্রিক চুল্লিতে? কাঠে? নাকি অনুতোষ লাশকাটা ঘর থেকে এখনও এসে পৌঁছতে পারেনি? কিংবা হয়তো এই এসে পৌঁছল সবে! আচমকাই ধোঁয়ামাখা বাতাস ফিসফিস করে উঠেছে, আয় দীপেন, তোর জন্যই অপেক্ষা করছি রে! তোরা না এলে আমি যাই কেমন করে?

আমার গা-ছমছম করে উঠল। আমার কান্না পেয়ে গেল। মাংসপোড়া গন্ধ আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরছে আমাকে। দুপুরের মাংসের ঢেকুর জ্বালিয়ে দিল বুক।

কটু বাতাস আবার টানছে, আয় দীপেন! আয় দীপেন!

হেমন্তের কুয়াশায় আমার স্বর ডুবে গেল, আমাকে ছেড়ে দে অনুতোষ। আমার হাতে এখন অনেক কাজ। আমার এখন সময় নেই রে।

বাবু-কাঙালি পালা

প্রথম অংক : প্রথম দৃশ্য

ঘড়ির ছোট কাঁটা ডান কাতে হেলে যাওয়ার পর রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সুরেশবাবু। কী ব্যাপার! বেলা পেকে গেল, এখনও কোনো ব্যাটার পাত্তা নেই কেন! চঞ্চল চোখে আরেকবার তাকালেন কবজিতে বাঁধা সোনালি কোয়ার্টজ ঘড়ির দিকে। দশ আঙুলে চমকে উঠলো হীরে, পান্না, মুক্তো, চুনী, প্রবাল। গরদ-পাঞ্জাবির বোতাম খুঁটলেন কচি বালকটির মতো,—'কী হলো? একজনেরও টিকি দেখা যাচ্ছে না যে বড়?'

—'যাবে, যাবে।' পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক টুকরো ফিচেল হাসি ছুঁড়ে দিলো অশোক,—'এখখুনি দেখবেন সব হড়হড় করে এসে যাবে।'

—'বেশি দেরি কবলে ঝামেলা তোদেরই।' সুরেশবাবু গলা চড়ালেন,—ছ'টায় প্রসেশান বার না করতে পারলে গোটা পাড়া আর ঘোরাতে হবে না, হ্যাঁ...দেবে তরুণজ্যোতি লাস্ট ইয়ারের মতো আগেভাগে রাস্তা আটকে হুঁ....মুনলাইট ব্যাণ্ডও ঠিক সাড়ে পাঁচটায় এসে যাবে বলে রাখলাম।'

—'ঘাবড়াচ্ছেন কেন সুরেশদা? আপনার গেস্টদের ঠিক টাইমলি খাইয়ে পাচার করে দেবো।'

—'আসুক আগে বাবাসকল।'

—'আয়েগা আয়েগা, আয়েগা জি আনেঅলা...'

সুরেশবাবুর তবু ভাবনা কমলো না। ডেকরেটারের চেয়ারে খচমচ শব্দ তুলে নড়ে বসলেন। ব্রেজনেভ ভুরু নাকের মাথায় জড়ো,—'কিরে শ্যামল. তুই একবার উঠে দেখবি নাকি?'

শ্যামল উত্তর দিলো না। উল্টোমুখো চেয়ারে বসে আয়েস করে সিগারেট টেনে চলেছে। চোখ বুজে রিঙ ছেড়ে যাচ্ছে পরপর। ক'দিন টানা ধকলের পর এই তো সবে এখন একটু হাত-পা ছড়ানোর সময়। এত বড় একটা পুজো তোলা কম কথা! তার ওপর গত বছর থেকে উটকো টেনশনটাও এসে জুটেছে। তরুণজ্যোতি যে কোনো ছুতোয় পাড়া অ্যাটাক করতে পারে। ভাবতে ভাবতে মাথার ওপর বুক-ভর্তি ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলো শ্যামল।

—'জবাব দিচ্ছিস না যে? টাইমটা খেয়াল আছে?' সুরেশবাবু ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠছেন। যত সব বালখিল্যের দল! অস্থির কি অকারণে হচ্ছেন? ডুবলে একা ডুববেন? কথার কী ছিরি...আপনার গেস্ট। গেস্ট! গেস্ট! অবশ্য সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে গেস্ট তো শুধু তাঁরই। আজকের কাঙালি ভোজনের দায়দায়িত্ব পুরোটাই তাঁর। মালকড়িও তাঁরই পকেট থেকে গেছে। উপায়ই বা কী ছিল? মা কালীর স্বপ্নাদেশ বলে কথা। কাঁচাখেকো মা আমার। তাঁকে তিনি চটান কোন সাহসে? আদেশ পালনের জন্য নিজের হাতে কাঙালি ভোজনের বাজার করেছেন। মেনু—খিচুড়ি লাবড়া আর

চাটনি। সক্কাল থেকে প্যাণ্ডেলের পেছনে কাঠকয়লার ধোঁয়ায় বসে চোখ মুছেছেন। রান্নার তদারকি। এদিকে তেনাদেরই দর্শন নেই। আশ্চর্য!

সুরেশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলেন প্যাণ্ডেল থেকে। প্যাণ্ডেল তো নয়, চল্লিশ ফুট রাস্তা জুড়ে বিশাল এক মন্দির। বাঁশ কাপড়ের ছদ্মবেশ পরা। হুঁ, পুজোয় এবার কিছু জাঁকজমক হয়েছে বটে। একে রজতজয়ন্তী, তার ওপর তিনি, তারও ওপর মায়ের স্বপ্নাদেশ। ছেলেগুলোর রুচিকেও বাহবা দিতে হয়। বাইরেটা যেন সত্যি দক্ষিণেশ্বরের সেই মন্দিরটি। আর ভেতরটা হুবহু নাচমহল। ছেলেরা বলছিল মাণ্ডু না পাণ্ডু কোন রাজবাড়ির নকল যেন। চারদিকে পেল্লাই সব ঝাড়লণ্ঠনের চোখঝলসানো সেট। একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে নেশা ধরে যায়। নাহ, তরুণজ্যোতি এবার কোনোভাবেই টক্কর দিতে পারেনি চিরসবুজের সঙ্গে। সুরেশবাবু গর্বিত চোখে কয়েক মুহূর্ত দেখলেন। পরিষ্কার দেখা যায়, মা এ বছর পুরোপুরি দিগম্বরী নন। ডাকের সাজে ঘনকৃষ্ণ রূপ বুঝি আরও ভয়ঙ্কর। আরও মধুর। মায়ের হাতের চকচকে খাঁড়াটির দিকে চোখ পড়তেই সুরেশবাবুর শরীরে শিহরণ খেলে গেল। ....মা, মাগো, ব্রহ্মময়ী, মুখ ফেরাস নে মা। তোর আদেশমতো সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট করেছি। সম্পূর্ণ নিজের খরচায়। তুই শুধু মা কথা রাখিস। ব্রিজ কনস্ট্রাকশানের অর্ডারটা...মাগো ইনকামট্যাক্স ফাইলটা....এক্সপোর্ট লাইসেন্সের ঝামেলাটা...প্রবল আবেগে সুরেশবাবু সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া ছেলেটাকে প্রায় খামচে ধরলেন—'অ্যাই অ্যাই, অ্যাই তরুণ, তোরা ঠিক খবর দিয়েছিলি তো ওদের?'

—'আপনি মাইরি এমন দিল্লাগি করেন...' তরুণ ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধ ছাড়িয়ে নিলো, —'হেঁটে গিয়ে দিতে হয় না; এসব খবর ওদের কাছে ওয়্যারলেসে পৌঁছে যায়।'

—'আমাদের স্টেশনেরগুলোকে জানিয়েছিস?' সুরেশবাবুর মুখে মাতৃআজ্ঞা পালনের বিহ্বল ঘোর।

—'হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ। ওদেরই বলেছি দশদিকে রটিয়ে দিতে। দেখুন না ওরা এখখুনি লিড করে চলে এলো বলে!'

সুরেশবাবু আবেশে বিভোর হলেন।

প্রথম অংক : দ্বিতীয় দৃশ্য

শহরতলির বুকের ওপর আপ ডাউন দুই লাইনকে পেটে বেঁধে মুখোমুখি শুয়ে দুটি লম্বা বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম। পিঠের ওপর কিছুদূর অন্তর যাত্রীদের জন্য পাতা সিমেন্টের বেঞ্চ। তার পেছনে ঢালু জমি। সেই জমিতে সার সার অজস্র ঝুপড়ি। ছেঁড়া পলিথিন, ভাঙা চাটাই আর কাঠিকুঠি দিয়ে বাঁধা কাকের বাসা। অথবা মানুষের ঘরবাড়ি। গোটা চত্বর জুড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে কালোকুলো হাঁড়িকুড়ি, ময়লা ছেঁড়া কাপড় আর কাদামাখা ল্যাংটো বাচ্চা। কোথাও শাখা ছড়িয়ে পেচ্ছাপের ধারা চলে গেছে লাইনের দিকে। কাগজের টুকরো, শালপাতার ঠোঙা উড়ছে আলতো হাওয়ায়। ডানদিকের একমাত্র নিঃসঙ্গ কৃষ্ণচূড়া গাছটিতে ঝুলছে দুটো ভেজা শাড়ি, কিছু ট্যানা। একটু দূরে প্ল্যাটফর্মের

মাঝবরাবর রুপোলি করোগেটেড শেড। তারই নিচে বসে আছে ওরা। এ চত্বরের বাসিন্দা সব। শঙ্করী তার ভাঙা চিরুনি জোর জোর চালিয়ে উকুন ছাড়াচ্ছে মেয়ের মাথা থেকে। ছড়ানো পায়ের ওপর আলটপকা শুয়ে তার ছ'মাসের ছেলে। উদাসীন চোখ আকাশে ফেলে ছেলেটা একমনে কাঠের টুকরো চিবিয়ে চলেছে। একটু তফাতে আরও দুটি শিশু নিজেদের মধ্যে কাগজ ছেঁড়ার খেলায় মগ্ন। তাদের ঠিক পেছনে, বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে মাতু ছোট্ট একটা আয়নায় নিবিষ্টমনে দেখছে নিজেকে। শুকনো খড়ের মতো চুলের গোছা ছড়িয়ে আছে পিঠে। বঙ্গজ্বলা ছাপা শাড়িটি আলগা ছুঁয়ে আদুড় শরীর। বর্ষার লাউডগার মতো স্তনের ফালি উঁকি মারছে সেই কাপড়ের ফাঁক দিয়ে। সেদিকে জুলজুল তাকিয়ে আচমকা এক কড়া ঢেকুর তোলে লতিফা মিঞা। মাতু ঘাড় ফেরায়,—কী দেকিস, অ্যাঁ?'

মাতুর চোখে প্রশ্রয়ের হাসি। লতিফ একটু কাছে এগোয়। মাতু ঠোঁট টেপে। সাহস পেয়ে ওর কোল ঘেঁষে শেষে শুয়েই পড়ে লতিফ,—'তোর বাটির খিচড়িটা ভালোকরে ঢ্যাকা দিয়ে রাকিস কিন্তু। পরে খাবো।'

সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা মেরে লতিফকে সরিয়ে দেয় মাতু,—'ওরে আমার সাধের নাগর রে, ও খিঁচড়ি যেন তোর। আমি বলে আর খেতে পারলুম নি তাই নে এলুম।'

ঝামটা শুনেও লতিফ রাগ করে না। উল্টে খ্যাকখ্যাক হাসে। মাতুর চোখে চোখ রেখে অশ্লীল ভঙ্গি করে একটা। তাই দেখে হেসে লুটিপাটি যায় কিশোরী সবিতা। মেয়েটার মা-বাপ নেই। কোনো কালে ছিল কিনা তাও আর মনে পড়ে না তার। সারাদিন রোদজলে উড়ে বেড়ায়। লোকের দোরে ভিক্ষে চাইতে গেলে কেউ কেউ তাকে কাজ করতে বলে। বলেই শুধু, রাখে না। মেয়েটার যে গাভর্তি পাঁচড়ার ঘা। নোংরা চুলে মোটা জট। সেই চুলে আঙুল ডুবিয়ে মেয়েটা হাসে। হাসতেই থাকে, —'ও লতিফদাদা, চল না, ওই উদিকের পুজোতেও আজ খিচড়ি দিচ্ছে। চল গিয়ে নে আসি।'

লতিফ মাথা নাড়ে। লিকলিক হাতখানা রাখে মাতুর উরুতে,—'নাঃ, আর যাবুনি। বেশি খিঁচড়ি খেলে পেট ছাড়বে। পেট এক্কেরে গজমজ করতেছে।'

—'মাইরি!' লতিফের কথায় সায় দেয় ধুলোতে গড়িয়ে থাকা ভজন,—। 'যেখেনেই যাও শুদু খিচড়ি আর লাবড়া। আর কিচু দিতে বাবুদের যেন হাত ওটেনিকো।'

শঙ্করী মুখ ঘুরিয়ে টিপ্পনী ছোঁড়ে,—'আহা, নোলা দ্যাকো মিনসের! বাবুরা তোমাকে খিঁচড়ি দেবে না তো কি আইসকিরিম কাটলেট দেবে?'

—'দেবে নাই বা কেন?' হঠাৎ ওদের কথার মধ্যে ঝাপটে আসে খোঁড়া পেহ্লাদ। এতক্ষণ চুপচাপ শুয়েছিল বেঞ্চির রোদে। ডাকসাইটে ভিখিরি। মেজাজ সর্বসময় তিরিক্ষি থাকে তার। ভিখিরির কোথথেকে এত রাগদাপট আসে কে জানে! সেই দাপটে সে এখন বিদ্রোহ মেশায়,—'এদিকে বলবে আমাদের খাইয়ে সব নারায়ণসেবা করতেচে, পুণ্যি হবে বাবুদের, ওদিকে দেবার বেলা শুদু খিচড়ি আর লাবড়া। মুতে দি অমন নারাণসেবার মুকে!'

সবিতা আবার হিহি হেসে ওঠে,—'ও দাদু, এট্টু আগে সেই খিচড়িই তুই কিন্তন গালভরে গিলে এসেচিস। ও দাদু....'

—'ওই শেষ। আর খাবুনি। আর যাবুনি ওসব ছেনালপনায়। খেতি দেবে তো ভালো কিচু দাও, নইলে ব্যাস...'

একটু আগে তরুণজ্যোতির প্যাণ্ডেল থেকে পেটপুরে খেয়ে এসেছে সকলে। থালাবাটি ভরে নিয়েও এসেছে কিছু। ওদিকের বাবুরা আজ বেশ সকাল সকাল খাইয়ে দিয়েছে। ভরপেট মেজাজে তাই ঝটাপট প্রতিবাদ দানা বাঁধতে শুরু করে দেয় সকলের। প্রতিবাদ ক্রমে রাগ হয়ে যায়,—'ঠিক বলেচো। আমরা কেউ আর যাবুনি।'

দেখেশুনে হাসকুটে সবিতাটাও আর হাসতে পারে না। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে খোঁড়া পেহ্লাদের দিকে, —'আমরা না খেলে তাদেরও তো আর ভগবান পুণ্যি দেবে না, না দাদু?'

পুণ্যি জিনিসটা যে কেমন, পেহ্লাদও সঠিক জানে না। নিঃশব্দে নিজের শক্ত পেটে হাত বুলিয়ে যায় সে। বুলিয়েই চলে। আর তখনই কোথা থেকে আচমকা ফড়িং-এর মতো উড়ে আসে কচি আর নেলো। কচির বাপ গাঁয়ে থাকতেই মরেছিল। এক ফোঁটা ওই ছেলে কোলে শহরে চলে এসেছিল আমিনা। সেই মাতলার ওপার থেকে। বাবুদের বাড়ি বারকতক কাজও করেছে। তবে তার বড় হাতটান বলে কেউ বেশিদিন রাখে না। তাছাড়া এখানে আসার পর শরীরেরও বিরাম বিশ্রাম নেই তার। বছর বাদে বছর ছেলে আসছে কোলে। পাঁচপাঁচটা কচিকাচা নিয়ে আমিনার ঘর যেন খরগোশের সংসার। নেলোটাই শুধু যা পেটের নয়—কচির পেছন পেছন কীভাবে একদিন এসে পড়েছিল। খরগোশের মা তাকেও ফেলে দেয়নি—, ঠাঁই দিয়েছে পলিথিনের ঘরে।

আমিনার সেই কচি নেলো দৌড়ে এসেই চিলচিৎকার করতে থাকে। আটফাটা প্যান্ট কোমরে চেপে হ্যা হ্যা হাঁপায়,— 'এই চল চল সব। বাবুরা আমাদের জন্য সব বসে আচে...'

—'মরণ!' গোলাপী ধমকে ওঠে, —'বসে আচে তো আমাদের ইয়ে হয়েছে। অত চেল্লাস নি বাপ!'

—'বারে, বাবুরা যে বললে গে ডেকে নিআয়।'

—'বলুক।'

—'যাবি না তোরা?'

—'না। বাবুদের গে বলে আয় অন্য কাঙালি ডাকুক। আমরা যাবুনি।'

—'কেন?'

—'কেন কী, যাবু নি,—যাবু নি!'

কচি নেলো ফ্যালফ্যাল তাকায়। এমন ধারার আজব কথা এই জীবনে প্রথম শুনছে। তবে শোনেই শুধু। বোঝে না। কিম্বা বুঝতে চায়ও না। হাতের চেটোয় শিকনি মুছে পরস্পরকে গোপন ইশারায় কী বলে। নেলো ছুটে নিজেদের ঝুপড়ি থেকে বাসন আনতে যায়,—'তোর বাটি দুটো নে যাচ্চি মাসি। খিচ্‌ড়ি আনবো।'

—'এই রাক, রাক বলচি!' মা খরগোশ দাপদুপ ছুটে আসে। এতক্ষণ চোখটি বুজে শুয়েছিল চুপচাপ,—'আমার বাটিতে মোটে হাত দিবিনি।'

—'অমন করতিচিস কেন?' কচি নেলোর পক্ষ নেয়।

—'চুপ কর।' আমিনা দাবড়ায় ছেলেকে. —'অত নোলা কিসের, অ্যাঁ? এট্টু আগেই তো গাঁকগাঁক গিলে এলি!'

—'তো কি? আর খাবুনি?'

—'না খাবিনি।' বদরি ছেলেদুটোর ডানা ধরে টান মারে,—'আমরা কেউ আর বাবুদের নারাণসেবায় যাবুনি। মণ্ডা মেঠাই মাছ মাংস দিলি পর যাবো, নইলে আর কোনো শালারে পুণ্যি করতে দিবুনি। এই আমাদের বিচার।'

ডাউন লাইনে একটা লোকাল ট্রেন এসে থেমেছে। মানুষ আর শব্দে সেকেণ্ডের জন্য আনমনা হয়ে যায় প্ল্যাটফর্মখানা। কচি নেলো সেই সুযোগটুকু হাতছাড়া করে না। পলকে বদরির হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়।

প্রথম অংক : তৃতীয় দৃশ্য

কিশোরী হাসি মেখে মাথার ওপর শুয়ে আছে শরতের আকাশ। ঠিক শরতও নয়, শরৎ হেমন্তের মাঝামাঝি সময়। রোদের রঙ এসময় কাঁচা সোনা। এ রোদে গা ডোবাতে ভালো লাগে। তবে দাঁড়ানোও যায় না বেশিক্ষণ। শরীর ঘামে ভেজে। চামড়া জ্বলে ওঠে। সুরেশবাবু সেই রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চিড়বিড়িয়ে উঠলেন,—'পুঁততে ফেলবো। পুঁতে ফেলবো সব ক'টাকে! এত বড় আস্পর্দা, বলে কিনা মাছ মাংস না দিলে আসবে না!'

একটু তফাতে কচি নেলো থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে। পাড়ার পাঁচটা মানুষ ভিড় করেছে তাদের ঘিরে। ভিখিরির বাচ্চা দুটোর কথা শুনে সকলেই হতবাক। এমন বিটকেল কথা কে কবে শুনেছে। ভিখিরিরা খ্যাটন রিফিউজ করছে! হ্যাঁ! নীরেনবাবু মাথা নাড়ছেন ঘন ঘন, —'কী শুনছি মোয়াই? এরপর কোনদিন শুনবো মিনিস্টারবা গদি চায় না... পুলিশ ঘুষ চায় না... সরকারী কর্মচারী সব... এ তো ঘোর কলি মশাই!'

মণ্টু কচির কাঁধে ঠেলা মারে,—'তোদের এসব রোয়াবি কবে থেকে শুরু হলো রে—হ্যাঁ?'

অশোক হুঙ্কার ছাড়ে,—'নিশ্চয়ই কেউ শিখিয়েছে। আমি পরিষ্কার ফাউল প্লের গন্ধ পাচ্ছি। কিরে, পালের গোদাটা কে বল দেখি?'

—'দেবো এক থাপ্পড়...'

কচি নেলো যুগলে কেঁদে ফেলে। অশোক অবিরাম জেরা করে চলে।

শ্যামল বলে,—'ওভাবে হবে না। ল্যাম্পপোস্টে বাঁধ দুটোকে।'

কচি নেলোর গলা নিংড়ে উৎকট কিছু শব্দ বার হয়। তরুণ বলে,—'বুঝে গেছি। এসব শালা তরুণজ্যোতির প্ল্যান। আমাদের ডাউন দেবার জন্য ওদের সাতসকালে ডেকে খাইয়ে দিয়েছে।'

শ্যামল ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় ছেলেদুটোকে,—'কুছ পরোয়া নেই। আমি যেখান থেকে পারি ভিখিরি ডেকে আনছি। আমাদের কাঙালি ভোজন আজ হবেই। এ শালা শুধু সুরেশদার নয়, এ আমাদের চিরসবুজের প্রেস্টিজের সওয়াল।'

বলতে বলতে ভিড় ঠেলে এগোয়। তাই দেখে সুরেশবাবু আচমকা ভেঙে পড়েন, —'অন্য জায়গা থেকে ভিখিবি আনলে আমার যে হবে না শ্যামল। মা আমাকে স্বপ্নে বারবার ওই স্টেশনেরগুলোকেই যে দেখিয়েছিলেন।'

'আশ্চর্য!' শ্যামল গজগজ করে,—'আপনাকে তো অন্য ভিখিরি ডাকতেই হতো সুরেশদা। আয়োজন করেছেন একশ জনের। অত আপনার স্টেশনে নেই।'

—'তা হোক' সুরেশবাবু শ্যামলের হাত চেপে ধরেন, 'যে-উপাযে হোক তুই ওদেরই ডেকে নিয়ে আয় ভাই।'

—'শুনছেন তো ওরা আসবে না।'

—'তবু তোবা যা।' সুবেশবাবুর গলা ধরে আসে, —'ওদের গিয়ে বল এখন তো মাছ মাংস হয়ে উঠবে না। তার বদলে সকলকে দু'টাকা করে ক্যাশ দেবো... ...'

ছেলেবা পরস্পব মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে। কচি নেলো তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগায়। দুরন্ত গতিতে পৌঁছে যায় স্টেশন-চত্বরে। বিজ্ঞ পেহ্লাদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বৃত্তান্ত সব শোনে। তারপর অদ্ভুত রায় দেয়,—'দু ট্যাকায় হবেনি। বাবুদের গে বল, কম করে পাঁচটা করে ট্যাকা দিতে হবে। সকলকে। তবেই যাবো, হ্যাঁ!'

এ পক্ষের দরকষাকষি শুনে ও-পক্ষ রাগে ফাটে। তরুণজ্যোতি নির্ঘাৎ কলকাঠি নাড়ছে পেছনে। হাতকাটা পল্টু বনবন চোখ ঘোরায়,—'আপনি শুধু একবার মুখের কথা খসান দাদা, হুকুম দিন, ভাসানের পর তরুণজ্যোতিকে দুরমুশ করে দিই!'

—'সে দেখা যাবেখন।' সুবেশবাবু বড় কষ্টে সামলান নিজেকে। এমন অসহায় অবস্থায় আর কখনও পড়তে হয়নি তাঁকে। দশাসই মানুষটা ক্রমশ কেমন নির্জীব হয়ে পড়েন। মনে হয় তেমন ভাবে দাবি করলে হয়তো দশ টাকাতেও রাজি হয়ে যেতেন।

দ্বিতীয় অংক : প্রথম দৃশ্য

রাত গভীর। ভাসানটাসানের পালা নির্বিঘ্নে চুকে গেছে। সারাদিনের ক্লান্তি মেখে সুরেশবাবু অনেকক্ষণ শুয়ে পড়েছেন বিছানায়। বড়ই ধকল গেছে আজ—শরীরের ওপর, মনের ওপর। তবু কেন যে ঘুম আসে না। ডানলোপিলোর গদিতে শুধুই এপাশ ওপাশ করতে থাকেন। অতগুলো টাকার পরেও করকরে দেড়শোটা টাকা বেরিয়ে গেল। তা যাক। ব্রহ্মময়ীর যেমন ইচ্ছা। ভাবতে ভাবতে চোখ খোলেন। বোজেন। আবার খোলেন। কান খাড়া করে কিসের যেন প্রতীক্ষা করেন। পল্টুরা এত দেরি করছে কেন? আর কখন... ...?

—'কিগো ঘুম আসছে না? চুড়ি ঝমঝমিয়ে গায়ের কাছে সরে এসেছেন স্ত্রী। সুরেশবাবু ফোঁস করে শ্বাস ফেলেন।

—'এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

সুরেশবাবু ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলেন।

—'সত্যিই, হাড়হাভাতেগুলো কী বাড়টাই না বেড়েছে। এবার আসুক ভিক্ষে চাইতে, কুকুর লেলিয়ে দেবো।'

সুরেশবাবু এবারও কোনো কথা বলেন না। তাঁর হয়ে উত্তর দিয়ে দেয় বিকট একটা শব্দ একটু দূরে, মনে হয় ওপাড়া থেকে। প্রথমে একটা ফাটে, তারপর আরেকটা। আরও আরও। মুহুর্মুহু শব্দে বোমা আছড়ে পড়তে শুরু করেছে বাইরে। সুরেশবাবুর স্ত্রী চমকে উঠে বসেন বিছানায়,—'ওপাড়ার সঙ্গে আবার লাগলো বোধহয়। ওগো, কি হবে?'

এতক্ষণে সুরেশবাবুকে ভারি শান্ত দেখায়। ধীরেসুস্থে নামেন বিছানা থেকে। স্ত্রী কানে হাত চাপা দিয়েছেন,—'নিশ্চয়ই এ তোমার পল্টুর কাজ। ছি ছি, আজকের দিনেও এমন মারদাঙ্গা! ওফ!'

রাত্রি ফুঁড়ে বিকট উল্লাস দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারদিক। সুরেশবাবু স্থির দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। এরপর যে কী করণীয়? কী? কী? ভাবতে ভাবতেই ইথার তরঙ্গে ইচ্ছাময়ীর নির্দেশ এসে যায়। বড় আলো জ্বালিয়ে ঘর ছেড়ে চটপট প্যাসেজে আসেন। স্ত্রী আর্তনাদ করে ওঠেন প্রায়,—'কোথায় যাচ্ছ তুমি এখন? এই, বাইরে বেরোচ্ছ নাকি?'

—'আহ, চুপ করো তো একটু।' সুরেশবাবু নিচু গলায় ধমকান মহিলাকে,—'কোথায় আবার যাবো? ফোন করতে যাচ্ছি।'

—'কাকে?'

—'ও সি উজবুকটাকে ডেকে লাভ নেই। ডিসিকে পাই কিনা দেখি।'

—'কেন?'

—'কেন আবার? এখখুনি ফোর্স পাঠাতে বলতে হবে।'

—'তাহলে তোমার ছেলেরাও সব ধরা পড়ে যাবে যে।' গোলগাল ভালোমানুষ মহিলাটির গলা কেঁপে ওঠে, —'ওরা তোমার জন্য কত কী করে... ...তোমার পুজোতে এত খাটলো... ...পল্টু শ্যামল তোমাকে ভগবানের মতো... ..'

—'তুমি ঘুমোও তো গিয়ে। সব ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।' সুরেশবাবু ড্রয়িংরুমের আলো জ্বালান। পেছন পেছন চলে আসেন স্ত্রীও। দরজা ধরে একদৃষ্টে দেখেন প্রতাপশালী স্বামীকে। দৃষ্টিতে বিস্ময়। দৃষ্টিতে আতঙ্ক।

—'কী দেখছো হাঁ করে? বললাম তো শুয়ে পড়ো?' সুরেশবাবু রিসিভার হাতে তুলে গাল ছড়িয়ে হাসেন। বড় শান্তির হাসি। সারাদিন পর। এই প্রথম,—'কাল দুপুরেই ওদের আমি ছাড়িয়ে আনবো, হলো তো?'

—'তাহলে ধরাচ্ছো কেন?'

—ধরাচ্ছি কেন? সুরেশবাবু ঘর ফাটিয়ে হেসে ওঠেন, —'এই জন্যই বলে মেয়েছেলেদের বারো হাত কাপড়েও কাছা হয় না... ...হা হা হা...' বলতে বলতে ডায়াল ঘোরান,—'ইজ্জত বাড়বে গো, ইজ্জত। যতটা খুইয়েছি ততটাই ফিরে পাব। তরুণজ্যোতির ছেলেগুলোও এবার থেকে পোষা কুকুর হয়ে যাবে, বুঝলে।'

সুরেশবাবুর স্ত্রী কিছুই বোঝেন না। তবু কেন যে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটে ওঠে তাঁর! শ্রদ্ধা গদগদমুখে তাকিয়ে থাকেন সর্বশক্তিমান স্বামীটির দিকে।

দ্বিতীয় অংক : শেষ দৃশ্য (যবনিকা)

আমিনার ঝুপড়ির পেছনে. গোটা একটা যুবতী শরীর ছুঁয়ে থেকেও বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে ভজন। হায় ভগবান, শঙ্করীটা বাবুদের মারপিটের মধ্যে পড়ে গেল না তো? মেয়েছেলেটা আজও গেছে ভাটিখানার দিকে। বারণ শোনেনি। প্রায় রাতে ওখান থেকে দু'পাঁচ টাকা রোজগার করে আনে। স্বামীকে স্বামী বলে মান্যিই করতে চায় না। রাঁধাবাড়ার কাজটাও করে না আজকাল। ভজনকেই সামাল দিতে হয় সবকিছু। লোকেব বাড়িব কাজেও লাগানো যায় নি শঙ্করীকে। আটাত্তবের বন্যার পর এদিকে এসে ভজন দু'চারদিন কাজটাজ খুঁজেছিল। পরে দেখলো শঙ্করীর কথাই ঠিক। ভিক্ষেতে পয়সা বেশি। খাটলে অত হয় না। সব থেকে বেশি পয়সা আসে... ...ভজন ঢোক গিললো। সারাদিন ঘুরেফিরে সন্ধ্যায় শঙ্করী টেনে চুল বাঁধে। কোথথেকে একখানা সিল্কের শাড়ি পেয়েছিল. রাত বাড়লে বাহার দিয়ে পবে নেয় সেখানা। চোখে কাজল টানে। কপালে টিপ। তারপর টুকটুক চলে যায় ভাটিখানাব দিকে। গরিবগুরবো মেয়েগুলোব ইদানীং ওদিকেই বেশি টান। বিকেলে সদ্য পাঁচপাঁচটা টাকা হাতে থাকায় ভজনের মেজাজ দিব্যি ফুরফুরে ছিল। ফোকটের টাকায় কার না আনন্দ হয়। পেটে ক্ষিধে নেই, হাতে কাঁচা টাকা, এর বেশি আর কিই বা চাই মানুষের? ভজন তাই সোহাগ করে বলেছিল—'এখন দুদিন জিরিযে নে না। তোর বড ধকল যায়। পাঁচ পাঁচ দশটা ট্যাকায় দু'তিন দিন তো চলে।'

আসলে ভজনের সাধ ছিল শঙ্করী অন্তত আজকেব রাতটা কাছে থাকুক তার। বহুকাল পর। শঙ্করী পাত্তা দেয়নি। ঝামটা দিয়ে উঠেছিল.—'আমাব ট্যাকার দিকে মোটে নজর দেবে না। ও ট্যাকাতে ছিটের বেলাউজ কিনবো আমি।'

ঝমাঝম শব্দ করে রাতের মালগাড়ি যাচ্ছে দুলে দুলে। সেই শব্দকে চুরমার করে ফেটে পডছে বাবুদের মারণবোমা। ভজন সবে এলো আমিনার পাশ থেকে। কথায় কথায় সাঁঝেব বেলা কী ঝগড়াটাই না করলো শঙ্করী। ভজন বুঝি বলেছিল, —'এই তো সেদিন বেলাউজ কিনলি, আবার একটা কিসের?'

—'সে খোঁজে তোমার দরকার কী?' শঙ্করী ফুঁসে উঠেছিল।

—'দরকার আচে লিশ্চয়। তুই বেলাউজ কিনলে আম্মও পাঁচ ট্যাকা দে ফুর্তি মারবো। তোর থেকে সোঁদর মেয়েছেলের কাচে যাবো।' চটজলদি জবাব দিয়েছিল ভজনও।

—'যা না তাইলে। উই তো তোদের সুহাগী আমিনা কখুন থেকে চট বগলে ঘুরতেচে—সিখেনে যা।'

—'যাবোই তো!'

ভজন উঠে বসলো সোজা হয়ে। আমিনা তখনও মাটিতে গড়াচ্ছে,—'কী হলো গো?'

—'বাবুদেব জোব মারপিঠ নেগেচে রে।'

—'লাগুক। ও তো রোজ রাতের খেলা।' আমিনা হাত বাড়িয়ে টানলো ভজনকে। ভজন নিশ্চল।

—'ইদিকে আয়।' আমিনার গলায় হিসহিসানি।

ভজন মুখ ঢাকলো দু'হাতে,—'তোব ছাওয়াল কাঁদতেছে। থামাবিনি?'

—কাঁদুক।' সাপের মতো পিছলে আসছে আমিনা,—'পেট আজ ভবা আচে। বেশিক্ষণ কাঁদবেনি।'

—'তবে বোধহয় বোমা শুনে ভয় পায়।'

—'আহা, ও আবাজ ওবা লতুন শুনছে নিকি?' তবু শেষ পর্যন্ত উঠেই দাঁড়ায় ভজন। লুঙ্গির খুঁট থেকে পাঁচ টাকার নোটখানা খুলে গোমড়ামুখে বলে,—'তিন ট্যাকা ফেবত দে।'

আমিনা পলকে লাফিয়ে উঠেছে। পারলে বুঝি ছোবল মেবে শেষ করে দেয় মানুষটাকে। গলা কাঁপছে প্রেতিনীব মতো,—'বুইচি। তুই এখুন তোব মাগ খুঁজতে যাবি। তা অ্যাতই যখন পিরিত, আমার কাচে আসা কেন, অ্যাঁ?'

ভজন চুপ। আমিনা শূন্যে উড়িয়ে দেয় সবুজ নোটখানা, —'আহারে, কী সুহাগের মবদ। যা ভাগ,—ভাগ এখান থেকে। ট্যাকাব গবম আমিনারে দেকাতে আসবিনি, বুইলি?'

ভজন উর্ধ্বশ্বাসে ভাটিখানাব দিকে ছোটে।

বাতাস ক্রমশ শীতল হচ্ছে। মাথার ওপর একরাশ তারা পুজোপ্যাণ্ডেলের আলোর মতো খেলা দেখিয়ে চলেছে একটানা। ফট্যাফট জ্বলছে নিভছে। আকাশের চাঁদোয়ার নিচে শুয়ে সেই মুহূর্তে লতিফ মাতুকে বলে,—'তুই আমারে নিকে করবি?'

মাতু বাতাসের মতো ঝিবঝির হাসে। লতিফ টেরও পায় না কথার ফাঁকে কখন তাব খুঁট থেকে পাঁচ টাকার নোটটা খুলে নেয় মেয়েটা। সরে শোয়। লতিফ হাত বাড়ায়,—'কাচে আয়।'

মাতু কথা ঘোরাবার চেষ্টা কবে,—'বাবুদের আবার দাঙ্গা নেগেচে গো!'

—'নেগেচে তো নেগেচে, তুই সরে যাস কেন?'

মাতু জোর করে ঠোঁটে হাসি ফোটায়। আঁচল পিঠে চেপে চিৎ হয়ে শোয়। পিঠের নিচে টাকাটা খচমচ করতে থাকে।

লতিফ অন্ধকারে দাঁত ছড়ায়,—'তোরে নিয়ে আমি ঘর বাঁধবো ঠিক।'

লতিফের হাত আলতো করে সরিয়ে দেয় মাতু,—'এট্টু সবুর কর। ছেলেটা কাঁদে। থামিয়ে আসি।'

—'চটপট আসবি।'

মাতু সাবধানে ওঠে। বোমার শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে অনেকেরই। চারদিকে চাপা গুঞ্জন মানুষের। ঝুপড়িতে ঢোকার মুখে কি ভেবে মাতু থমকে দাঁড়ায়। নরম স্বরে বলে,—'সকালে বেরুনোর আগে খিচড়ি খেয়ে যাস।'

লতিফ ততক্ষণে টের পেয়ে গেছে। প্রেম ভুলে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করেছে

সে,—'এই মাতু, এই হারামজাদি, দে বলছি। দিয়ে যা আমার ট্যাকা।'

—'কিসের ট্যাকা?'

—'জানিস না যেন, ন্যাকা। আমার নুঙ্গির খুঁটে ছিল... ...'

—'তার আমি কি জানি?'

—'ফের মিছে কথা! চোর... ... ছেনাল... ... '

লতিফের চিলচিৎকার আঁধার কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। সবিতার তন্দ্রাটুকুন ভেঙে যায়। বেঞ্চিতে উঠে বসে ঘুমচোখে প্রথমটা সে কিছুই বুঝতে পারে না। জোরে চোখ ডলে। উকুন চুলকোয়। ঘোর কালো রাত ডুবে আছে আবছা কুয়াশায়। গোপন ভয়ের মতো বাতাসে হালকা বারুদের গন্ধ। ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা তোলে। আকাশ নেই। মাথা জুড়ে করোগেটেড ছাদ। স্টেশনের বাতিগুলোকেও স্পষ্ট দেখতে পায় না সবিতা। ধোঁয়াশার আড়ালে সবই যেন অনেক দূরের। কান খাড়া করে সে শুধু উঁচুনিচু নানান শব্দ শোনে। কোনো শব্দেরই মানে খুঁজে পায় না। বেঞ্চির পাশে কচি নেলো। তাদের কথাও কানে আসে।

কচি বলে,—'বাবুদের কেন মারপিট নেগেচে আমি জানি।'

নেলো বলে,—'আমিও জানি।'

—'কেন বল্ দিকি?'

—'ও পাড়ার বাবুরা আমাদের আজ আগে খেইয়ে দেছে। তার জন্যি আমরা এ পাড়ায় যেতি চাইনি, তাই।'

—'ধুস! ওই আংটিবাবুটাকে পুণ্যির জন্য আমাদের পাঁচ ট্যাকা করে দিতি হলো, তাই।'

—'কী করে জানলি?'

—'তারা তখন বলছিল, শুনিস নি?'

—'হিহি হিহি! পুণ্যির জন্য বাবুরা কত কী করে! হিহি!'

—'চুপ কর্। বাবুদের ব্যাপার তুই কী বুজিস রে?'

—'বুজি। সব বুজি।'

—'তবে বল দেখি পুণ্যি কাকে বলে?'

—'কাকে আবার! এই যে বাবুরা ক্যাঙালি খাওয়ায়, ট্যাকা দেয়—এসব হল পুণ্যি।'

—'আর পাপ?'

—'পাপ?' নেলো মাথা চুলকোয়।

—'পারলি না তো?'

—'কিই?'

—'হুই যে মাতু লতিপের ট্যাকা চুরি করেচে, সেইটে হলো পাপ।'

কচি নেলো পাশাপাশি শুয়ে বকবক করেই চলেছে। বুঝি রাতভর পাপপুণ্যের ঠিকানা খুঁজে চলবে। সবিতাকে হঠাৎ বড় শীতে ধরে। হাঁটু মুড়ে কুঁকড়ে মুকড়ে শোয়। তীব্র ডাকে চতুর্দিক তোলপাড় করে ঠিক তখনই দূরপাল্লার গাড়িটা স্টেশন

মাড়িয়ে ছুটে চলে যায়। তীক্ষ্ণ হুইসিলে চাপা পড়ে যায় যাবতীয় আওয়াজ—বাবুদের বোমাবাজি, মাতু-লতিফের ঝগড়া, কচি নেলোর জিজ্ঞাসা, উত্তর। কুকুরের গোঙানি। মানুষের নিশ্বাস। সবিতার চোখে ঘুম নামতে থাকে। নতুন করে আবছা ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে বোকা মেয়েটা টেরও পায় না পৃথিবীর সমস্ত কথা আর শব্দগুলো কখন নিঃশব্দে তারই বুকে ঢুকে পড়েছে। অকারণেই। কার্তিকের কুয়াশার মতো রহস্যময়। ধূসর।

আমিনার মতো রাত্রির নিশ্বাসও ধীরে ধীরে ভারি হয়ে আসে।

উটপাখি

জীবনে প্রথম এ'ধরণের আজগুবী কথা শুনল কল্যাণী। ঘরে ফিরে বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল শব্দকটাকে নিয়ে। আজ হঠাৎ এমন একটা কথা জিজ্ঞাসা করল কেন মানুষটা? এমনি এমনি? না মনে কোন কুচিন্তা আছে? 'কুচিন্তা' শব্দটা কারেন্ট মারার মত ঝনঝনিয়ে দিল সারা শরীর। মানুষটার শেষ পর্যন্ত এই ছিল মনে? না. না। তাই বা কি করে হয়? তেমন মানুষ তো নয় সে। তবে? কি জানি বাবা! পুরুষের মন কখন যে কি মতলবে থাকে!

অনেকক্ষণ উদাসভাবে জানালার ধাবে দাঁড়িযে থাকে কল্যাণী। হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকাব গুটি গুটি ঢুকে পড়ছে ঘরের ভেতর। কার্তিকের বিকেল। রোদ নরম হওয়ার আগেই গলতে শুরু করে। গলে গলে মিশে যায় কাঁচা অন্ধকাবের গায়ে। পূবমুখো ঘরের সামনে একফালি বারান্দা। সকালের রোদ বাবান্দাতেই থমকে থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিন শুকিয়ে ফ্যাকাশে মেরে যায ঘরের ভেতব। এদিকের জানালাদুটোর পর্দা তুলে রাখলে দু'ফালি আকাশ তবু যা হ'ক ছিটে-ফোঁটা আলো ছিটিয়ে দেয়। পর্দাও আবার সবসময় তুলে রাখা যায় না। পাশেই খাটাল। গোয়ালাগুলো খড়ের ছাউনি তুলে ওখানেই ঘরদোর বানিয়ে নিয়েছে।

খাটালের দিক থেকে একঝাঁক মশা হঠাৎ সানাই বাজিয়ে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। কল্যাণীর চমক ভাঙে। রোজই এ সময়ে সে ঘরে ধুনো দেয়। ঠাকুরের আসনে সন্ধ্যাবাতি জ্বালে। ছেলেমেয়ে দুটোও ফিরবে এবাব। উনুনে আঁচ পড়বে। এককাঁড়ি রুটি কবতে হবে এখন। পর্দা নামিয়ে বারান্দায় আসতে আসতে একরাশ কাজের ভাবনা তার চিন্তাটাকে আলুথালু করে দেয়। ঝিমধরা মেজাজে সে উনুনের খোলে জ্বলন্ত কাগজ পুরতে থাকে। একটু পরে ধোঁয়া ছুটবে গলগলিয়ে। ওই মানুষটার ঘরের সামনে দিয়েই তাকে যেতে হবে উঠোনে উনুন নামাতে। মুহূর্তে মনস্থির করে নেয সে। না, মানুষটার সঙ্গে আর বেশি মেলামেশা করাটা ঠিক হবে না। বাপীর বাবা জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।

রাখাল রোজকার মতই সন্ধের মুখে বাড়ি ফেরে। সার্টের বোতাম আলগা কবতে করতে বলে. 'আজ. বুঝলে, খুব একচোট হয়ে গেছে বড়বাবুর সঙ্গে!'

বাপী আর বেবি মেঝেতে ছড়িয়ে বসে লেখাপড়া করছিল। বাবার ফুরফুরে মেজাজ দেখে তারা নড়েচড়ে বসে।

'শালা তেলুয়া। অফিসারকে তেল মারতে রোজ শালা এগাবটার মধ্যে খাতা ভেতরে পাঠিয়ে দেবে।'

কল্যাণী চিমনির কাঁচ পরিষ্কার করছে। আজ শুক্রবার। ঠিক দশটায় কারেন্ট যাবে। অন্যান্য দিন এসব কথার পিঠে সে কিছু বলে না। চুপচাপ শুনে যায়। আজ একটু বেশি উৎসাহের সঙ্গে স্বামীর কথায় তাল দিয়ে ওঠে, 'কেন, তোমাদের বড়বাবুর চোখ নেই? বাসট্রামের কি অবস্থা টের পায় না?'

রাখাল এমনিতেই বাড়ি এসে অফিসের গল্প করতে বেশি ভালবাসে। এখন কল্যাণীর কথায় পরম মেজাজে পিঠ চুলকোয়, 'এই কে বলে! আজ তো এই নিয়েই অফিসে দারুণ ফাটাফাটি। শুয়োরের বাচ্চাটাকে বেশ একচোট দিয়েছি। আর শালা আমার পেছনে লাগতে আসবে না।'

বাপী বেবি খিলখিলিয়ে হাসে। রাখাল হঠাৎ যেন সচকিত হয়, 'এ্যাই, তোরা কি শুনছিস হাঁ করে? পড—পড়াশুনো কর।'

কল্যাণী বারান্দায় যাবার আগে ঘাড় ঘোরায়, 'পড়াশুনোয় মন আছে ওদের? সারাদিন শুধু খেলা আর শয়তানি!'

বাপী ভয়ে ভয়ে বলে, 'অঙ্কটা বুঝতে পারছি না বাবা। জেঠুর কাছে যাব?'

'না।' গমগমিয়ে ওঠে কল্যাণীর গলা, 'কোথাও যেতে হবে না। ঘরে বসে পড়ো। কোনো আব্দার নয়।'

রাখাল অবাক মুখে তাকায়, 'কেন, যাক না! শিবেনদা তো একা একাই শুয়ে আছে মনে হল।' তারপর কি মনে হতে গলা নামায়, 'টাকাটা বাড়ানোর কথা বলেছিলে? নাকি ভুলে গেছ!'

কল্যাণীর বুকে একঝাঁক চড়ুই পাখী দাপাদাপি শুরু করে দেয়। কি অদ্ভুত ব্যাপার! মানুষটার নাম শুনলেই কেন যে কাঁপন ধরছে শরীরে? একা ঘরে শুয়ে আছে। তার মানে আজ ছাত্র ঠেঙাতেও বেরোয় নি। এসবের মানে কি?

বাবার কাছে অনুমতি পেয়ে বাপী বেবি দুজনেই বেরিয়ে গেছে ছুটে। রাখাল পায়খানায় ঢুকেছে। চায়ের জল চাপিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বসে থাকে কল্যাণী। জল ফুটে বাষ্প বার হয়। রুটিটুটি শেষ করে উনুনে গুঁড়ো কয়লা দিয়েছিল। গনগনে আঁচ চাপা পড়ে ঈষৎ উষ্ণ হলকা গরম নিশ্বাসের মত মুখে বুকে উত্তাপ ছড়ায়। কল্যাণী তখন প্রায় পালিয়েই এসেছিল মানুষটার কাছ থেকে। সেই থেকে বুকের বিশ্রী দাপানিটা কিছুতেই কমছে না। ছি ছি, এসব কি শুরু হল তার মনের ভেতর? ঘুরেফিরে বার বার সেই এক অসতী চিন্তা! কি অদ্ভুত প্রশ্ন—'কল্যাণী, তুমি খুব সুখী, তাই না?' বলার সময় কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছিল মানুষটাকে। থমকে দাঁড়িয়েছিল কল্যাণী, 'হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন দাদা?'

'এমনি। কদিন ধরেই কথাটা তোমায় জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম।'

'কেন?'

'তা তো জানি না। তোমায় দেখে মাঝে মাঝে এ প্রশ্নটা জাগে আমার।'

কি রকম অপরিচিত কথা সব। কল্যাণীকে কোনদিন কেউ এমন ধরণের কথা জিজ্ঞাসা করে নি। কেমন যেন কেতাবী কেতাবী। অত বড় বড় সব কথা কোনদিন ভাবতেও শেখে নি সে। কদিন আগে সিনেমা দেখতে গিয়ে ওরকমই একটা দৃশ্য দেখেছিল সে আর পাশের ঘরের মন্টুর মা। উত্তমকুমার মনে মনে সুচিত্রা সেনকে ভালবাসে। সুচিত্রা একটা ফুটফুটে ছেলের মা। স্বামী খুব বড় অফিসার। গাড়ি আছে। বাড়িঘর ছবির মত সাজানো। কত আসবাব! কি আলোবাতাসওয়ালা বড় বড় ঘর সব! দামী দামী পর্দা ঝুলছে। সুচিত্রা প্রকাণ্ড একটা ঝকঝকে খাবার টেবিলে একা

একা বসে আছে। গা-ভর্তি গয়না। ঝলমলে দামী শাড়ি। উত্তম শিবেনদার মতই দুঃখী দুঃখী মুখে জিজ্ঞাসা করেছিল,— 'তুমি খুব সুখী, না?'

সদ্যদেখা ছবি। এখনো মনে দাগ আছে। কল্যাণী চোখ বুঁজে নিজেকে সুচিত্রা সেনের জায়গায় বসিয়ে ফেলে। শিরশির করছে শরীর। দূর্! সিনেমা কখনও সত্যি হয় নাকি? শিবেনদাও কি বইটা দেখে এসে এসব বলল? কি বোকা মানুষটা। ওসব সিন্, ওসব কথা সিনেমাতেই মানায়। কল্যাণী ওভাবে ভাববে কি করতে?

'কিগো চা দেবে না?' রাখাল পায়খানা থেকে বেরিয়ে বিবিধ-ভারতী চালাল, —'তোমার মুখটা শুকনো শুকনো লাগছে কেন? শরীর খারাপ?'

'না তো।' কল্যাণীর চোখ ছলছল করে ওঠে।

রাখাল রেডিও বাড়িয়ে দেয়। মনমেজাজ আজ তার কিছু শরিফ আছে। একটা এরিয়ারের বিল অনেকদিন ধরে পড়েছিল। আজ পাওয়া গেছে। ভূপেনরা ভীষণ ধরেছিল মাল খাওয়ানোর জন্য। খুব জোর এড়ানো গেছে। রাখাল খুব হিসেবী। সে জানে গেরস্তমানুষের রোজ রোজ অত শখ করা ভাল না। শখের জিনিস এক-আধদিনই ভাল।

শখের কথা মনে হতে সে গলা চড়িয়ে কল্যাণীকে ডাকে, 'এই, কাল সিনেমা দেখতে যাবে?'

'কি বই?'

'চলো, কালই মেরে আসি। মহুয়ায় চলছে। সবাই বলছিল দারুণ বই। জমাটি বেড়সিন্ আছে।'

'তোমার খালি ওই সব!' কল্যাণী হেসে ফেলে।

'নয়ত কি?' রাখাল হ্যা হ্যা করে হেসে ওঠে, 'ও সব ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু আছে নাকি? মেয়েছেলেদের যে ভগবান কি দিয়ে গড়েছে!'

কল্যাণীর মনের মেঘ সরে যাচ্ছে একটু একটু করে। এই তো সুখ। একেবারে তার হাতের মুঠোয়। নিশ্চয়ই সুখী সে। এমন স্বামী, সংসার, ছেলেমেয়ে। শিবেনদা মিছিমিছিই তাকে ভাবনায় ফেলেছে। না চাইতেই কত কি যে পেয়ে যায় সে। এর বেশি আর কি দরকার জীবনে? হে ভগবান, আমার মনের পাপ দূর করে দাও। কল্যাণী আদুরে বেড়ালের মত রাখালের গা ঘেঁষে বসে, 'এই জান, ও-পাড়ার খোকা মিত্তির আছে না, সেই যে গো যার বউকে তোমরা হেমামালিনী বলো, সে না পাশের বাড়ির কমলের সঙ্গে পালিয়েছে।'

রাখালের চোখ চিকচিক করে ওঠে, 'তাই নাকি? তুমি কোথ্থেকে শুনলে?'

'পাশের ঘরের দিদি বলছিল।'

'অত সুন্দর মেয়েছেলেকে রাতদিন পেটালে সে পাখী কি আর থাকে? খোকা মিত্তিরটা তো পাঁড়মাতাল।'

'ম্যাগোঃ।' কল্যাণীর মুখচোখ ঘেন্নায় বেঁকেচুরে যায়। 'স্বামী মারে বলে আরেকজনের সঙ্গে ভাগতে হবে? ধম্ম-টম্ম কি সব রসাতলে গেছে? অমন মেয়েদের মুখে থুতু ফেলা উচিত।'

'আরে দূর! ধম্ম বলে আর কিছু আছে নাকি? আমাদের অফিসের সেই সরমা গুহর কথা বলেছিলাম না, সে তো শুনছি আরেকবার বিয়ে করতে চলেছে। অফিসে এই সব নিয়ে কথা হচ্ছিল। ডিভোর্স করেছিস কর, আবার তোর বিয়ে করা কেন? মেয়েমানুষের বার বার বিয়ে হয় শুনেছ কখনো?'

'হ্যাঁ গো, ওদের কি পাপপুণ্যের ভয় নেই?'

'থাকলে কি আর এক স্বামী ছেড়ে আরেক স্বামী ধরে। আবার আমাদের অফিসের সেই ছোকরা মৃন্ময় সান্যাল, সে কি বলে জান? বলে সরমাদির ভেতরকার যন্ত্রণা আপনারা কি বুঝবেন? কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে সমালোচনা করা ঠিক না। পোকার ডিম!'

'ওমা সেই ছেলেটা? আমাদের এখানে একদিন এসেছিল না? সে এসব বলে? ছেলেটাকে দেখে তো বেশ ভাল ছেলে মনে হয়। ওর এত আঠা কিসের?'

রাখাল চকচকে চোখে চিবিয়ে চিবিয়ে হাসে, 'অমন একটা ডগডগে সোমখ মেয়ের ওপর আঠা যে কারণে থাকে সেই কারণে!'

কল্যাণী এবার আচমকা বোকার মত প্রশ্ন করে বসে, 'আচ্ছা ওই সব মেয়েদেরই তো অসুখী বলে, তাই না গো?'

রাখাল সামান্য থতমত খেয়ে যায়। তারপর এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেয় কথাগুলো, 'ধুর্! ওগুলো একধরণের নোংরামি। সুখটুখ অনেক বড় বড় কথা।'

হয়ত তাই। কল্যাণী চুপ করে যায়। রেডিওতে নাটক আরম্ভ হচ্ছে। রাখাল সেদিকে মন দেয়। কল্যাণী উঠে হাতের কাজকর্ম সারে। খাটালের দিক থেকে বোঁটকা গন্ধ আসছে। আজ ঘরে ধুনো পড়েনি, মশা ওড়ে নাকমুখের পাশ দিয়ে। কল্যাণী বাক্স-পেঁটরার মাথা থেকে বালিশ মশারি পাড়ে। বাপীর বাবা ঠিকই বলেছে—সুখ টুখ অনেক বড় বড় কথা। ও সব নিয়ে শিবেনদা ভাবে ভাবুক। কল্যাণীর কিছু এসে যায় না তাতে।

বাপী বেবি পড়াশুনো সেরে ঘরে ফেরে, 'মা, জেঠুর খুব জ্বর এসেছে। রাত্তিরে খাবে না বলল। তোমায় একবার ডাকছে।'

কল্যাণী সঙ্গে সঙ্গে খরখরিয়ে ওঠে, 'আমার এখন ফরমাস্ খাটার সময় নেই। যত্তোসব!'

রাখাল বিছানায় টানটান শুয়ে পড়ে, 'আহা, ডাকছে কেন শুনেই এসো না। একা একা আছে। এক ফাঁকে টাকা বাড়ানোর কথাটাও পারলে বলে নিও।'

কল্যাণী ঝংকার দিয়ে ওঠে, 'ওসব তুমি বোলো। আমি পারব না।'

রাখাল হঠাৎ চটে যায়, 'কেন, তোমার বলতে অসুবিধেটা কি শুনি? দুশো টাকায় আজকাল কোন মানুষের খাওয়া-দাওয়া হয় নাকি? তুমি তো পিরীত করে সকালের চা, বিকেলের জলখাবার দিতে শুরু করেছ। ওসব দেওয়ার কি কথা ছিল? ইস্কুলের মাইনে এখন অনেক বেড়েছে। আমাদের থেকে বেশি স্কেল। তার ওপর অতগুলো টিউশানিও করে।'

'বললাম তো পারব না।' কল্যাণী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

রাতে পাশাপাশি শুয়ে কল্যাণী অনেকক্ষণ চিন্তা করে, রাখালকে কথাটা বলবে কিনা। মানুষটা তখন রেগে-মেগে নিজেই গিয়ে শিবেনদার সঙ্গে কি সব কথাবার্তা বলে এসেছে। না, মানুষটা যদি কখনও কিছু আঁচ করতে পারে। আগে-ভাগে বলে দেওয়াই ভাল। দোষ কেটে যাবে।

কল্যাণী ভয়ে ভয়ে স্বামীর বুকে হাত রাখে, 'তুমি রাগ করে আছ?'

'রাগের কি আছে? শিবেনদার সঙ্গে তোমার খাতির বেশি তাই বলতে বলেছিলাম। তুমি বলবে না, তাই নিজেই বললাম।'

'কি বলল শিবেনদা?'

'কি বলবে আবার। মানুষটা সত্যি এত ভাল—আমি বলার আগেই বলল এত ইতস্তত করছেন কেন? নিশ্চয়ই বাড়াব। কত বাড়াতে হবে বলুন? বেশ জ্বরও এসেছে দেখে এলাম। তুমি একবার সকালেই গিয়ে খবর নিও। আমাদের কাছে খাওয়া-দাওয়া যখন করে তখন আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে।'

কল্যাণী ফোঁস করে একটা গরম নিশ্বাস ফেলে, 'শিবেনদার ঘরে যেতে আমার কেমন যেন লাগে। মানুষটা আর আগের মত নেই।'

'সে কি? এই তো এত দাদা, দাদা—হঠাৎ আবার কি হল?'

'জানি না। আমার যেন কেমন অন্যরকম লাগে এখন। আমি দাদা ভাবলেও সে বোধ হয় আর ভাবতে চায় না।'

রাখালের শরীরটা শক্ত হয়ে উঠছে কল্যাণী টের পায়।

'তুমি রাগ করলে? কথাটা অবশ্য তোমায় আরও আগে বলা উচিত ছিল।'

'আরে দূর, রাগ করব কেন? তুমি নিজে ঠিক আছ তো?' রাখাল জড়িয়ে ধরে কল্যাণীকে।

'ভাল লাগে না যাও। খালি আজেবাজে কথা।' কল্যাণী রাখালের রোমশ বুকে চিমটি কাটে।

রাখাল আরও ভাল করে জড়িয়ে ধরে তাকে, 'তাহলে আর চিন্তা কি? শোন, শিবেনদাকে আমি খুব ভালভাবে জানি। মানুষটা মোটেই ধান্দাবাজ টাইপের নয়। বরং ভীতু গোছের। কখনই বেশি এগোনোর সাহস হবে না।'

'মনে মনে তো পাপ চিন্তা থাকতে পারে?' কল্যাণী সবল আবেগে স্বামীর গলা জাপটে ধরে।

'থাকুক না, ক্ষতি কি? বরং ভালই হবে। তেমন বুঝলে ওকে ভালমতন লেজে খেলাতে পারবে। তুমি চাইলে হয়ত পুরো মাইনেটাই তুলে দেবে তোমার হাতে।'

বিপন্ন বিস্ময়ে ছিটকে যায় কল্যাণী, 'একি বলছ তুমি।'

'দূর পাগলি।' রাখাল ওকে কাছে টেনে নেয়, আবার বলে, 'তুমি নিজে ঠিক থাকলে এর মধ্যে কোন দোষ নেই।'

কল্যাণীর গা ঘিনঘিন করে ওঠে। বমি হবে এখনি। কোনরকমে শুধু বলে, 'আমি ওসব পারব না।'

রাখাল ওকে ছেড়ে উঠে বসে বিছানায়। অন্ধকারে মানুষটার মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর রাখাল সাপের গলায় হিসহিসিয়ে ওঠে. —'তোমাদের এই ঠুনকো সতীপনা দেখলে আমার গা জ্বলে যায়! সংসারের চিন্তা করতে করতে আমি মুখের রক্ত তুলে মরি. আমায় সামান্য একটু সাহায্য করতেও তোমার গায়ে লাগে! যত সব ন্যাকামি!'

'আমিও তো খেটে মরি তোমার সংসারের জন্য।' কল্যাণী বলতে গিয়েও সামলে নেয়। উঠে বসে রাখালের কাঁধে মাথা ঠেকায়। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'রাগ কোরো না গো। তুমি যা চাও তাই হবে।'

প্রাত্যহিক ক্রিয়ার পর ক্লান্ত রাখালের নাক ডাকে. কল্যাণী উঠে বসে বিছানায়। বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়ায় জানলার গরাদের এপারে। এক ছটাক আকাশ গাঢ় নীল রঙ নিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার মুখের ওপর। গুটিকয়েক তারা জ্বলে. নেভে। সামনের খাটালের ম্লান আলোয় গরুগুলোকে দেখা যায়। কল্যাণী অনেক কিছু ভাবার চেষ্টা করে। রাখালের কথা. সংসারের কথা. বাপী বেবির কথা। আস্তে আস্তে তার মস্তিষ্কের কোষে ঢুকে পড়তে থাকে শিবেনদা. খোকা মিত্তির. সরমা গুহ. রাখালের অফিসের সেই চনমনে ছেলে মৃন্ময় সান্যাল. এমন কি খোকা মিত্তিরের পালিয়ে যাওয়া সুন্দরী বউটাও। কল্যাণী হিসেব মেলাতে চায় অনেক কিছুর। পারে না। চিন্তাগুলো একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে মণ্ড হয়ে যায়। একটাকে অন্যটার থেকে পৃথক করার ক্ষমতা হারিয়ে যায়। গলার কাছে দলা দলা কান্না ডেলা পাকায়। মাথা যেন টগবগে ভাতের হাঁড়ি। তার ভেতরে শিবেনদার কথাগুলো হাতা-খুন্তির মত অবিরাম পাক খেয়ে চলে। জীবনে এই প্রথম সে নিজেকে প্রশ্ন করতে শেখে.—'কল্যাণী. তুমি খুব সুখী. না?'

দখলদার

প্রথমদিকে একটাই আসত। হাড়-জিরজিরে উপোসী চেহারা, সরু সরু লম্বাটে ঠ্যাং, গায়ের রঙ কিছুটা ফ্যাকাশে বাদামি। দেখলেই গা ঘিনঘিন করে ওঠে। চোখদুটোই শুধু আশ্চর্য ব্যতিক্রম! কী ভয়ানক অহংকারী, জেদি আর বেপরোয়া চাহনি।

পূর্ণিমা প্রথম দিনই দেখে আঁতকে উঠেছিলেন, —ম্যাগোঃ এটা কী করে এখানে ঢুকল?

তখন সবে মাস দুই হল এ পাড়ায় বাড়ি করে উঠে এসেছেন তাঁরা। আগে পৈতৃক বাড়িতেই থাকতেন। নিরাপদ অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। কলকাতাতেই তাঁর কাজ বেশি। সারাদিন ধরে শুধু এখান সেখান ছুটে বেড়াচ্ছেন। অ্যাসেমবলি, রাইটার্স বিল্ডিং, মিটিং-মিছিল। দিল্লিও দৌড়তে হয় মাঝেমাঝেই। তারওপর দিনভর বাড়িতে লোকজনের আসা-যাওয়া লেগেই আছে। পার্টির লোক, উমেদার, ভি আই পি। জেলা শহরের পৈতৃক বাড়িতে থেকে এত কিছু সামাল দেওয়া যাচ্ছিল না। পূর্ণিমারও অসুবিধা হচ্ছিল খুব। জননেতার স্ত্রীদেরও আজকাল নানান কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়। হাজার রকমের সমাজসেবার কাজ, নারীমুক্তি, নারীজাগরণ। নিরাপদ তাই কলকাতার এই দক্ষিণ দিকে ছোটখাটো একটা বাড়ি তুলে নেওয়া মনস্থ করেন।

বাড়িটা ছোটখাটো হলেও ছিমছাম। নিচু পাঁচিলঘেরা একতলা বাড়ি, সামনে একটু বাগান করার জায়গাও আছে। বাগান পেরিয়ে দু ধাপ সিঁড়ি ভাঙলে প্রথমে বৈঠকখানা। বড়সড় মতন ঘরটার দুই দেওয়াল ঘেঁষে লম্বা লম্বা বেঞ্চি, মাঝখানে সস্তাদামের সোফাসেট, সেন্টার টেবিল, দেওয়ালে দুখানা প্রকাণ্ড অয়েলপেন্টিং। এই ঘরেই দিনের বেশিটা সময় কাটান নিরাপদ, লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। এ ঘরটা ছাড়াও অবশ্য আরেকটা ড্রয়িংরুম আছে নিরাপদর। সেটা পুরোপুরি বিলিতি কায়দায় সাজানো। অয়েলপেপারে মোড়া দেওয়াল, দামী সোফাসেট, মেহগনি কাঠের কারুকাজ করা আসবাবপত্র, পেলমেট থেকে ঝোলা বাহারী পর্দা। মিনে করা পেতলের প্রকাণ্ড ফুলদানিতে নিয়ম করে ফুল সাজিয়ে রাখেন পূর্ণিমা। ড্রয়িংরুমটার পিছনে ছোট্ট করিডর। সেখানে মুখোমুখি দুখানা শোবার ঘর, দুটোই এয়ার কণ্ডিশনড়। এছাড়াও আছে গেস্টরুম, ডাইনিং রুম, ইত্যাদি ইত্যাদি। দুটো শোবার ঘরের একটাতে থাকেন নিরাপদ-পূর্ণিমা, অন্যটা দুই ছেলের জন্য। তারা দার্জিলিং-এ পড়াশুনা করে। ছুটি-ছাটাতে বাড়ি এলে সে ঘর তাদেরই।

নাহ্, নিরাপদ বোকা লোক নন। এক নজরে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মত বিশাল বাড়ি তিনি মোটেই বানাননি। বাইরে থেকে দেখলে একতলা বাড়িখানা নিতান্তই ছিমছাম, সাদামাটা। বাড়ির চতুর্দিক মনোরম গ্রিল দিয়ে আড়াল করা। সেই বাড়ির গর্ভে অমন একটা খেঁকুরে বিড়াল ঢুকে পড়লে পূর্ণিমা বিরক্ত হতে পারেন বইকি। শুধু ঢোকা নয়, খাবার টেবিলের ওপর একেবারে আরাম করে শুয়ে রয়েছে।

পূর্ণিমা চিৎকার করে উঠেছিলেন,—এই হরি, শীগগীরই তাড়া এটাকে, এখখুনি বিদায় কর।

হরি নিরাপদর সেই দেশের বাড়ির পুরনো চাকর। এখন অবশ্য তাকে আর ঠিক চাকর বলা যায় না। দাদাবাবুর ভাগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চালচলনও পাল্টেছে। পরনে ধোপদুরস্ত জামাকাপড়, চুল উড়ুউড়ু সর্বসময়। নিরাপদর সঙ্গে বাড়িতে কেউ দেখা করতে এলে তাকে আগে হরির কাছে আর্জি জানাতে হয়।

সদর অবধি বিড়ালটাকে তাড়া করে এসে হরি সেদিন বিরক্তমুখে বলেছিল, তখনই বলেছিলাম বস্তিটস্তির কাছে জমি কিনবেন না। তা দাদার সেই এক কথা, গরীবদের সঙ্গে থাকব। থাকো গরীবদের সঙ্গে! বোঝ। এই আমি আপনাকে বলে রাখলাম বউদি, এ জায়গায় যখন বাড়ি বানিয়েছেন, আরও অনেক ঝক্কি পোয়াতে হবে।

কথাটা ভুল নয়। তখনকার মত হ্যাংলা প্রাণীটাকে দূর করা গেলেও, দেখা গেল সে আবারও আসছে। বার বার। সময় অসময় নেই। প্রথম দিকে একাই আসত। তারপর কখনও একা কখনও জোড়ায়, কখনও ছোট বড় তিন-চারজন মিলে। যেখানে সেখানে যখন তখন ঢুকে পড়ছে। খাবারঘর রান্নাঘর, এমনকি শোওয়া বসার ঘরেও। আর সুযোগ পেলেই সাফ করে দিচ্ছে দুধটা, মাছটা। রাতভর শুয়ে থাকছে দামী সোফাসেটের ওপর, ছেলেদের নরম বিছানায়। দেখলেই পূর্ণিমার গা কশকশ করে ওঠে। সবকটারই কি মরকুটে চেহারা। গাভর্তি ঘা, রোঁয়াওঠা শরীর, খাই খাই করা ছাড়া আর কিছুই জানে না।

নিরাপদ সারাদিনে নিশ্বাস ফেলার সময় পান না। নতুন বাড়িতে এসে তাঁর কাজকর্ম আরও বেড়েছে। সকাল থেকে রাত যেন ঝড়ের আগে কেটে যায়। সকালে একগ্লাস ফলের রস খেয়ে ঘণ্টাখানেকের জন্য বৈঠকখানায় এসে বসেন। লোকের সঙ্গে কথাবার্তা সেরেই স্নান খাওয়া করে ছুট। তারপর গোটা দিন ধরে শুধু তো কাজ আর কাজ। দেশের জন্য। দশের জন্য। সব সেরে বেশির ভাগ দিনই খাবার টেবিলে আসতে তাঁর দশটা সাড়ে দশটা বেজে যায়। সংসারের খুঁটিনাটি খবর রাখার তাঁর সময় কোথায়?

এর মধ্যেই একদিন সকালে খাবার টেবিলে বসে সবে খবরের কাগজগুলোতে চোখ বোলাচ্ছেন, পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করলেন—আজও কি হাল্কা ব্রেকফাস্ট করেই বেরোবে? না হেভি কিছু দিতে বলব?

নিরাপদ উত্তরে বললেন,—আজ আমার সম্পর্কে কাগজে কি লিখেছে দেখেছ?

পূর্ণিমা স্বামীর হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিলেন,—পরে দেখো। ফলের রসটা আগে খেয়ে নাও তো দেখি।

—কালকের স্টেটমেণ্টটাকে কি ভাবে ঘুরিয়ে লিখেছে দ্যাখো। সবকটা রিপোর্টার শালা দুনম্বরী। নিরাপদ টেবিল থেকে আরেকখানা কাগজ তুলে ছুঁড়ে মারলেন মেঝেতে।

সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের তলা থেকে মৃদু আর্তনাদ উঠেছে—মিঁয়াও।

নিরাপদর হাত থেকে কিছুটা ফলের রস চলকে গেল। খুবই বিরক্ত হলেন তিনি। এঃ, এই নোংরা ঘেয়ো বেড়ালটা এখানে কেন?

পূর্ণিমা আলগা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—সংসারের কোন খবরই তো আজকাল রাখো না! এ বাড়িতে কী ভীষণ বেড়ালের অত্যাচার যে শুরু হয়েছে তা জানো?

—বেড়ালের অত্যাচার! নিরাপদর চোখ গোল হল.—এগুলো থাকে কোথায়?

—কোথায় আবার! তোমাদেব ওই বস্তিতে।

—যাঃ যাঃ। নিরাপদ চটিসুদ্ধ পা মাটিতে ঠুকলেন। বিড়ালটা একটুও নড়ল না। যেখানে ছিল সেখান থেকেই করুণ গলায় আবার ডাকল.— মিঁয়াও।

নিরাপদর এবার একটু মায়া হল। পূর্ণিমাকে বললেন.—একটু দুধ-টুধ দিয়ে দাও না। বেচারাব বোধহয় ক্ষিধে পেয়েছে।

—থাক. আর দবদ দেখিও না। একবাব খেতে দিলেই একেবারে মাথায় চড়ে বসবে। আব রক্ষে থাকবে না।

—আহা. রাগ করে' কেন? হাজাব হোক মা ষষ্ঠীর জীব। বলেই নিরাপদ অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলেন। ঝুঁকে পড়ে আলতো করে ছুঁতে গেলেন বিড়ালটাকে।

পূর্ণিমা হাঁ হা করে উঠলেন.—করছ কি? ছুঁয়ো না। একদম ছোঁবে না বলছি।

বিড়ালটা অবশ্য তার আগেই সরে গেছে টেবিলের তলা থেকে।

নিরাপদ পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন.—ব্যাপার কি বলো তো? সকাল থেকেই আজ এত মেজাজ গরম কেন? টুকুসুকুর চিঠি আসছে না বুঝি?

—থাক। তোমাকে আর ছেলের খবর নিতে হবে না।

নিরাপদ হেসে ফেললেন. খুব রেগে আছ দেখছি।

—রাগব না? ওই বেড়ালগুলোর অত্যাচারে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে শোভার মা সবে দুধ এনে টেবিলে রেখেছে. দ্যাখ না দ্যাখ সাফ! কাল গোটা ডাইনিং স্পেসটায় এঁটো কাঁটা ছড়িয়ে... অসহ্য।

নিরাপদ আবারও হাসলেন.— এক কাজ করো না. সবকটাকে ধরে বস্তায় পুরে বাইরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসতে বলো।

—সে চেষ্টা কি আর করা হয়নি? কি সাংঘাতিক ফেরোসাস ওগুলো ভাবতেও পারবে না। মিটমিটে শয়তান এক-একখানা। কাল সাবিত্রীর মার ছেলেটাকে যা বিশ্রীভাবে আঁচড়ে দিয়েছে...! ওদের ধরা খুব কঠিন।

—সে কি! নিরাপদ এতক্ষণে ভয় পেলেন.—বেড়ালের আঁচড় খুব খারাপ জিনিস।

—তাহলে আর বলছি কি। গোটা বাড়িতে এমন ভাবে ঘুরে বেড়ায়. যেন...।

—উঁহু. ভাল কথা নয়। বেড়াল খুব ইনফেকসাস প্রাণী।

—তাই তো ভয়ে মরছি। ছেলে দুটোর ছুটি পড়তে আর বেশি দিন নেই। ওরা আসার আগে হাড়হাভাতেগুলোকে না তাড়ালেই নয়।

বললেন বটে. তবে সমস্যাটা রয়েই গেল। লক্ষ কাজের মাঝে নিরাপদও বেমালুম ভুলে গেলেন বিড়ালগুলোর কথা। দিন কাটতে লাগল। যথারীতি শীতের ছুটিতে টুকু-সুকুও এসে পড়ল। গোলগাল ফুটফুটে চেহারার দুই কিশোর। দুজনেই নিরাপদ-ঘেঁষা হয়েছে। সুকুটা একটু দুষ্টু ধরনের। একটু আদুরেও।

দ্বিতীয় রাতেই শুতে এসে নিজের বিছানায় বিড়াল আবিষ্কার। সে তো মহা খুশি, —মা, দেখে যাও, কি সুইট দুটো বেড়াল আমার বিছানায় ঘুমোচ্ছে।

নিরাপদ নিজের ঘরে বসে তখন দিনের ক্লান্তি কাটানোর জন্য সামান্য সুরাপান করছিলেন। পূর্ণিমা সঙ্গ দিচ্ছিলেন তাঁকে। ছেলের উল্লাস শুনে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ডিভান থেকে,—যা ভেবেছিলাম তাই। নোংরা জানোয়ারগুলো ওই ঘরে বসে আছে।

নিরাপদ মোটা গলায় হেঁকে উঠলেন,—পুশ দেম অ্যাউট সুকু। শীগগীরই ঘর থেকে বার করে দাও।

সুকু ততক্ষণে দৌড়ে এসেছে এ ঘরে,—ও নো বাপি। কি সুন্দর করে শুয়ে আছে দুজনে। কি ইনোসেন্ট লুক। একটু গায়ে হাত দিতেই কি সুইটলি ডেকে উঠল মিঁযাও। পুওর ক্যাট। ওদেব কিছু একটু খেতে দিলে হয় না?

পূর্ণিমা হিস হিস করে উঠলেন—না সুকু, একদম ছোঁবে না ওদের। দে আর মোস্ট ডার্টি...।

নিরাপদ হাঁক ছাড়লেন, —হরিই-ই...? হরি গেল কোথায়? ওকে বলো এখখুনি বেড়াল দুটোকে বাইরে ফেলে দিয়ে আসতে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই হরি লাঠি নিয়ে ঢুকে পড়ল টুকু-সুকুর ঘরে। আজ একটা নিকেশ কিছু করবেই। বিড়ালগুলোর জ্বালায় তাদেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে।

—হ্যাট হ্যাট, বেরো বেরো।

লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে গেল হরি। আশ্চর্য! অতবড় একটা লাঠি দেখেও বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালো না বেড়ালদুটো। বিছানা থেকে নেমে খাটের তলায় সেঁধিয়ে গেল।

টুকু বলে উঠল, —আহ, করছটা কি? ছেড়ে দাও না ওদের। থাক না যদি থাকতে চায়।

সুকু উবু হয়ে বসে শিস দিয়ে ডাকতে লাগল দুজনকে। পূর্ণিমা দুহাতে মাথা চেপে ধরলেন, ওফ, আমি পাগল হয়ে যাব। টুকু-সুকু সরে এসো। ওদের তাড়িয়ে দিতে দাও।

—কেন? তাড়াবে কেন? ওরা তো কিছু করেনি!

—করতে কতক্ষণ? পূর্ণিমা ছেলেকে খামচে ধরে নিজের কাছে টানলেন,—একদম ইনডালজেন্স দেবে না ওদের।

হরি খাটের তলায় এলোপাথাড়ি লাঠি চালালো আবার। বেড়ালদুটো আরেক দিকে চলে গেল। একবার এদিক যায় তো একবার ওদিক। ঘর থেকে বেরোয় না কিছুতেই। হৈ-হৈ সোরগোল পড়ে গেছে। হট্টগোলে নিরাপদর নেশা প্রায় কেটে যাওয়ার জোগাড়। নেশার ঘোরেই পূর্ণিমার আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছেন তিনি—টুকু-সুকু সরে এস বলছি। যে কোন সময় ওরা খামচে দিতে পারে।

নিরাপদর হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎই কেমন ধড়ফড় করে উঠল। এখনও কাউকে বলেননি তিনি, এমনকি পূর্ণিমাকেও না, আজকাল মাঝেমাঝেই একটা ভৌতিক টেলিফোন

পাচ্ছেন। ঘোস্ট কল। আবার ওরা বেড়ে উঠছে বলে মনে হয়। মাঝেমাঝেই ফোন করে শাসাচ্ছে তাঁকে। বেপরোয়া স্বরে।

আচমকা সবাইকে অবাক করে দিয়ে নিরাপদ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, লাথি মেরে বার করে দে ওগুলোকে। মেরে ফ্যাল। পিটিয়ে মার।

টলমল পায়ে ছেলেদের ঘরে চলে এসেছেন তিনিও। হরির হাত থেকে লাঠি কেড়ে খোঁচা মেরেছেন বাদামি বিড়ালটার গায়ে। বিড়ালটাও ফোঁস করে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে।

নিরাপদ আবারও চিৎকার করেছেন,—কিল দেম! কিল দেম! বলতে বলতেই মাথাটা ঘুরে গেল কেমন। থমকে দাঁড়িয়ে নিজের বুকটাকে খামচে ধরেছেন। এই শীতেও ঘামছেন দরদর করে।

পূর্ণিমা দৌড়ে এসে ধরে ফেললেন তাঁকে।

পূর্ণিমা এই কদিন ধরে নিজের হাতে সেবা করেছেন নিরাপদর। নার্স আয়া কিছু রাখতে দেননি কাউকে। ডাক্তারের উপদেশ, আরও কয়েকদিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে নিরাপদকে। এখনও মাঝেমাঝেই রক্তচাপ ঝাং ঝাং করে লাফ দিয়ে উঠছে।

কদিন ধরে বাড়িতে কম লোকজনও আসছে না। আত্মীয়স্বজন, মন্ত্রী, ভি আই পি আর পার্টির লোকে বাড়ি গমগম করছে সব সময়। টেলিফোন কলই কি কম আসছে! মুখ্যমন্ত্রী আজও ফোনে খবর নিয়েছেন নিরাপদর। সব কিছু নিজে, একা হাতে সামাল দিচ্ছেন পূর্ণিমা। নারী সমিতির বার্ষিক সভা পিছিয়ে দিয়েছেন অনির্দিষ্ট কালের জন্য।

এখন এই মধ্যরাতেও স্বামীর মাথার কাছে বসে আছেন একাই। আজও সন্ধেবেলা নিরাপদর বুকে অল্পস্বল্প ব্যথা হচ্ছিল। ডাক্তাররা যদিও বলছেন ভয়ের কিছু নেই, তবু পূর্ণিমা স্বস্তি পাচ্ছেন কই? নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিলেই বোধহয় ভাল হত। এই মাঝরাতে নিরাপদর যদি কিছু হয়ে যায়, তার অবস্থা কি হবে? কোথায় দাঁড়াবেন? নিরাপদর মাথার পাশে বসে এই সবই ভাবছিলেন পূর্ণিমা। এমন সময়, এই রাত বারোটায়, টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল।

পূর্ণিমা রিসিভার কানে তুললেন,—হ্যালো?

—এটা কি নিরাপদ মিত্রর বাড়ি?

—হ্যাঁ। বলুন।

—শুয়োরের বাচ্চাটার খবর কি? এখনও টিঁকে আছে?

ও-প্রান্তের স্বরটা নিষ্ঠুর রকমের কর্কশ। পূর্ণিমার শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেল। টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতে ভুলে গেলেন তিনি। অভ্যাসবশেই কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে ফেললেন,—কে আপনি?

—নিরাপদর দূর-সম্পর্কের বাপ।

ওপারে এবার আর দু-একজনের হাসির আওয়াজও শুনতে পেলেন যেন পূর্ণিমা।

—খচ্চরটাকে বলে দেবেন বহুদিন ধরে অনেক রক্ত চুষেছে। আর নয়। এবার আমরা সব কিছুর হিসেব নেব।

টেলিফোনটা কেটে যাওয়ার পরও পূর্ণিমা অনেকক্ষণ রিসিভার ধরে রইলেন কানে। থরথর করে কাঁপছেন। কি করবেন এখন? পুলিশকে জানাবেন? হরিকে ডাকবেন? ফোন করবেন নিরাপদর সেক্রেটারিকে?

রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। পূর্ণিমা একভাবে বসে আছেন। বসেই আছেন। এর মধ্যে নিরাপদ জাগলেন কয়েকবার। আবার ঘুমোলেন। আবার জাগলেন। অনেক দিন পর আদর করে কাছে ডাকলেন পূর্ণিমাকে।

—এখনও তুমি জেগে বসে আছ? শোও, এবার। শুয়ে পড়। পূর্ণিমার চোখে জল এসে গেল। সাধারণ মানুষেরা এত নীচ হয় কেন? এত ছোট? একটা লোক অল্প সময়ে অত উঁচুতে উঠে গেছে দেখে দুনিয়া যেন হিংসায় ফেটে পড়ছে। চারদিকে শত্রু বাড়ছে ক্রমশ। নিরাপদ কি কারুর জন্য কিছুই করেননি এতদিন?

পূর্ণিমা নিরাপদর মাথায় হাত রাখলেন,—আমি ঠিক শুয়ে পড়ব। তুমি ঘুমোও।

—আমার অসুখ দেখে তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ, তাই না? পূর্ণিমা উত্তর দিলেন না।

—ভয় নেই। আমি সহজে মরব না। নিরাপদ স্ত্রীর হাতে হাত রাখলেন, —এক কাজ করো তো। আমার মাথার তলায়, গদির নিচে কিছু টাকা রাখা আছে—তুলে লকারে রেখে দাও।

পূর্ণিমা অনেকক্ষণ পর কথা বললেন। ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন— কিসের টাকা?

—ও একটা টাকা। সন্ধেবেলা দানু দিয়ে গেছে। দানু মানে দানু ঘোষ। নিরাপদর সেক্রেটারি। নিরাপদর ডানহাত। পূর্ণিমা ভুরু কোঁচকালেন, তাই তুমি কদিন ধরে দানু দানু করছ?

নিরাপদ চুপ।

—কত আছে?

—আছে। তা আছে বেশ কিছু। নিরাপদর রোমশ হাত পূর্ণিমার ভারী কোমর জড়িয়ে ধরল,—যাও, তুলে রাখো।

পূর্ণিমা টেলিফোনের কর্কশ স্বরটা নিজের ভেতরে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন. কথা বলতে গিয়ে গলা ঘড়ঘড় করে উঠল,—কিসের টাকা বলবে না আমাকে?

নিরাপদ পূর্ণিমার কোমরে আলগা চাপ দিলেন,—তুমি সবই জানো। তোমার কাছে কোন কাজ কি গোপন করেছি কোনদিন?

—তবু খুলে বলো।

—খুলে কি সব বলা যায়? সব কথা খুলে বলতে নেই। এত বুদ্ধিমতী তুমি আর এটুকু বোঝ না?

নিরাপদর গলায় আদর ঝরে পড়ল। আর তখনই হঠাৎ অন্ধকারে দপ করে

জ্বলে উঠল চোখজোড়া। ভয়ংকর তেজী অথচ ঠাণ্ডা নিস্পৃহ চোখ। বেপরোয়া, ধারাল অথচ ক্ষুধার্ত চোখ।

ওটা কি একটাই বিড়াল ? নাকি ওর পিছনে আরও কয়েকটা আছে ? পর পর ? সারিবদ্ধভাবে ? অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। পূর্ণিমা নিথর হয়ে গেলেন।

শাড়ি, রসমালাই এবং বিবাহবার্ষিকী

দুপুরবেলায় হাত খালি হলে খাওয়াদাওয়ার পর একটু নিজের মনে সেলাই ফোঁড়াই নিয়ে বসে শান্তা। কিংবা কোন বই বা ম্যাগাজিন। ঘুমের অভ্যেস এককালে ছিল। আজকাল শরীর ঝামেলা করে। একটু ঘুমোলেই গা ম্যাজম্যাজ, মাথা ভার, বুক জ্বালা। বুবলার হাফহাতাটা শেষ করে লালটির কার্ডিগান ধরতে হবে। তারপর শুভর পুলওভার। নিজের জন্যও একটা চোলিকাট ব্লাউজ বানানোর ইচ্ছে আছে। ইদানীং সবাই খুব পরছে। অবশ্য ততদিন শীত থাকলে হয়। একসময় ভাল হাত চলত, বিয়ের পর প্রথম শীতে শুভর লালকালো জাম্পারটা তো সাতদিনে শেষ করে ফেলেছিল। তখন সময়ও ছিল অফুরন্ত। সারাদিন একা মনে শুধু সময় নিয়ে নাড়াচাড়া করা। এখন সময় ছুটছে তাড়াখাওয়া কুকুরের মত। তাল দিতে গিয়ে শান্তা নাজেহাল। দম নেওয়ার আগেই ছোট পড়িমড়ি করে।

তাতেও যদি ধরা যায় সময়কে। ধরার আগেই পিছলে পিছলে যায়।

ঘুম থেকে উঠেই রান্নাঘর। চা, ভাত, ডাল, তরকারি। শুভ সকালে ভাত খেতে পারে না। তার জন্য রুটি। ছেলেমেয়েদের টিফিন। ওয়াটারবটলের জন্য জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করা। শুভ লালটি আগে পরে বেরোয়। লালটির বাস আসে সাড়ে ন'টায়। ওরা বেরিয়ে গেলে বুবলাকে নিয়ে পড়তে হয়। দস্যি ছেলেকে স্নান খাওয়া করাতেই একগাদা সময়। বেশিরভাগ দিনই স্কুল না যাওয়ার বায়নাক্কা। এরমধ্যেই কাপড় বদলে চুলটুল ঠিক করে শান্তা। কপালে টিপ লাগায়। ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে ফিরতে ফিরতে বারোটা। এ সময় আরেকবার ঠিকে-ঝিটা আসে, তার সঙ্গে খানিক বকবক শেষে স্নান-খাওয়ার পর এই একটু যা বিশ্রাম।

হলুদ গোলাটায় বিশ্রী জট পাকিয়ে গেছে। শান্তা একমনে গিঁটগুলো খোলার চেষ্টা করে। মনটা সকাল থেকেই খচখচ করছে। শুভ আজ একটাও কথা বলেনি তার সঙ্গে। বেরোনোর সময়ও না। এমনিতে অবশ্য সকালের দিকে খুব একটা কথা হয় না দু'জনের। আর সময় কোথায়? তবে আজ শুভ ইচ্ছে করেই কথা বলেনি। বাবুর রাগ হয়েছে। ঠিক আছে, কতক্ষণ রাগ থাকে দেখা যাক। শান্তা গায়ে পড়ে কথা বলতে যাবে না। আজকের দিনেও সে যদি মেজাজ দেখাতে পারে, শান্তার কিসের ঠেকা ভাব করতে যাওয়ার? তা বলে গাল ফুলিয়ে বসে থাকলেও তার চলবে না। বিকেলে কত কাজ। বুবলাকে স্কুল থেকে আনার সময় টাকা পনেরোর রসগোল্লা কিনতে হবে। প্রতিবছরই এ দিনটায় রসমালাই বানায়। ঘরে তৈরি রসমালাই শুভর খুব প্রিয়। এ ছাড়া সাবির মাকে দিয়ে মশলা করিয়ে রেখেছে। সন্ধেবেলা গরমগরম কচুরি ভাজবে, সঙ্গে আলুর দম। কেউ না কেউ আজ বাড়িতে আসবেই। দিদি-জামাইবাবু তো প্রতিবছর আসে। আগেরবার নন্দিনীরা এসেছিল। অনিমেষদারাও ঠিক মনে থাকে আজকের তারিখটা। সন্ধেবেলা যথারীতি বৌদিকে নিয়ে হাজির হবে। সঙ্গে একগোছা ফুল আর মিটিমিটি হাসি।

হলুদ গিট আলগা করে সুতো টানল শান্তা। অতগুলো লোক যে বাড়িতে আসবে তার জন্য কোন মাথাব্যথা আছে শুভর? বিন্দুমাত্র না। শুধু নিজের রাগ নিয়েই ব্যস্ত। সকাল থেকে একবার জিজ্ঞাসা করল না পর্যন্ত। দুনিয়ার লৌকিকতা, সামাজিকতা করার দায় যেন একা শান্তার। উনি দিব্যি মেজাজে টইটুম্বুর হয়ে গটগটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। জানে তো, বাড়িতে অতিথি এসে পড়লে শান্তা একটা না একটা ব্যবস্থা করবে করবেই।

গোলা সামলাতে গিয়ে কাঁটা থেকে ঘর পড়ে গেছে। গলার ছাঁটটা ফেলে উঠে পড়া যাক। শান্তা কাঁটার মুখে কাঁটা ধরল। রাতের রান্নাও এ বেলা সেরে রাখা দরকার। একটু পর থেকেই তো ধূমধাড়াক্কা, হুটোপুটি। বুবলাকে নিয়ে আসার পর লালটি ফিরবে। ওদের জলখাবার দেওয়া, জামাকাপড় বদলানো। বাইরের লোকজন আসবে, ঘরদোরও সাজাতে হবে একটু। কাশ্মীর থেকে আনা বেডকভারটা পাতলে হয়। পর্দাগুলোও পাল্টালে ভাল হত। যাকগে, বুবলাকে আনার সময় বরং বেশি করে ফুল কিনে আনবে। গোলাপ, জুঁই, রজনীগন্ধা। ফুলদানিতে চারটি ফুল রাখলে ঘরের চেহারাই বদলে যায়। অন্যান্যবার শুভই সকালে বাজার থেকে ফুল নিয়ে আসে। আজ যা হাবভাব, বিকেলে তাড়াতাড়ি ফিরবে কিনা তাও সন্দেহ। ছেলেদের বেশ মজা। ইচ্ছে করলে রাগটাগ দেখিয়ে দিব্যি সংসার থেকে সরে থাকতে পারে। শান্তার কোথাও যাওয়ার নেই। এই সংসার চারদিক থেকে তাকে অক্টোপাসের মত খামচে রয়েছে। আজ যদি সে রাগ করে চলে যায় কোথাও! রাত করে ফেরে! ভাবা যায়! ইস, লোকে কি বলবে? লালটি বুবলা তো কেঁদেই সারা হবে। আর শুভ বুঝি বিস্ময়ে পাথর হয়ে যাবে। আসলে এ বাড়ির খাট, আলমারি, দেওয়াল, দরজার মত সেও একটা অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গেছে। এ বাড়ির সদর দরজাটার মত সেও কোথাও নড়তে পারে না। রাগ, দুঃখ, অভিমান সব তাকে চার দেওয়ালে পুষে রাখতে হয়।

দূর, কী সব এতাল-বেতাল ভাবনা! শান্তা সেলাই রেখে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। বোকার মত চোখে জল আসছে। কোন মানে হয় না। এত মনখারাপ করার কী আছে? সামান্য কিছু কথা-ছোঁড়াছুঁড়ি, ও তো সবসময়েই হয়। আপনাআপনি আবার মিটেও যায়। আসলে আজকের দিনেও শুভর মুখভার করে থাকাটা শান্তাকে কষ্ট দিচ্ছে বেশি। এ কষ্ট শুধুই তার একার। শুভ যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। তেমন করে আর কিছুতেই ছুঁতে পারে না শান্তার মনটাকে। বুঝতেই পারে না শান্তা কী চায়। তবে কি আর তাকে আগের মত ভালবাসে না শুভ? ধ্যুৎ, তাই বা কী করে হয়? এই তো গত মাসে, তার যখন ধুম জ্বর, শুভ অফিস কামাই করে দু'দুটো দিন বসে রইল বাড়িতে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, ওষুধ খাওয়ানো, বারবার ছোটা ডাক্তারের কাছে। জ্বর ছাড়ার পরও তাকে বিছানা থেকে উঠতে দেয়নি ক'দিন। নিজেই সংসার সামলেছে, অপটু হাতে কাজকর্ম সেরেছে। শান্তা আলগোছে পাশ ফিরে শুল। তবু কেন তার মনে হয়, শুভ অনেক বদলে গেছে? নাকি সে আর নিজেই বুঝতে পারে না শুভকে? একজনের মনকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে আরেকজন কি পারে? প্রথম প্রথম চেষ্টা হয়ত থাকে। তারপর শুরু হয় মানিয়ে গুনিয়ে চলা। একসঙ্গে শোওয়া বসার অভ্যেস।

কাল রাতে বারকয়েক প্রশ্নটা ছুঁড়েছিল শুভ। শাস্তা তখন শোওয়ার আগে আঁটসাঁট করে চুল বাঁধছে। শুভ নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে বিছানায়। লালটি বুবলা ঘুমিয়ে কাদা।

—'এই, কাল কী নেবে বলো।'

শান্তা কোন উত্তর দেয়নি। প্রতিবছর একই প্রশ্নের জবাব দিতে কারুর ভাল লাগে? তাছাড়া বিবাহবার্ষিকীর মানে কি শুধুই উপহার আদানপ্রদান? সত্যি সত্যি সম্পর্ক কি তাই? অবশ্য শুভ একেবারে কিছু না দিলেও ভাল লাগবে না শান্তার। একটু মন খচখচ করবেই। সব মেয়েরই বোধ হয় করে। মানুষ প্রিয়জনের কাছ থেকে কিছু পেতেই তো ভালবাসে সব থেকে বেশি।

প্রথম বছর নিজে থেকেই তার জন্য একটা মুক্তোর সেট এনেছিল শুভ। জিনিসটা দেখতে মন্দ না, তবে সবুজ পাথরগুলো না থাকলে আরও সুন্দর হত। কথাটা জানাতেই শুভর কী আফসোস, —ইস, চলো কালই গিয়ে পাল্টে আনি!'

—'থাক না। এটাই বা খারাপ কি?'

—'তোমার পছন্দ হয়নি।'

—'কে বলেছে?' শান্তা ওর গলা জড়িয়ে ধরেছিল, —'তুমি ভালবেসে যা দেবে, তাই সুন্দর।'

—'বলছ?'

—'হুঁ।'

সেবার বেশ কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করেছিল তারা। ছোট্ট ফ্ল্যাটখানা ফুলে ফুলে একাকার। সবাই চলে যেতে একটা একটা করে ফুল দিয়ে বিছানা সাজিয়েছিল শুভ। ফুলশয্যার রাতের মত গোড়ে মালা দুটো বালিশে জড়ানো।

—'এবার থেকে প্রতিবছর এভাবে বিছানা সাজাব। যতদিন বাঁচব।'

শুনে শান্তা হেসে বাঁচে না,—'সে কি? বুড়ো হয়ে গেলেও?'

—'আমরা কখখনো বুড়ো হবো না। কোনদিন আমাদের বয়স বাড়বে না।'

—বারে, সময় শুনবে কেন?'

—'সময়ের সঙ্গে ভালবাসার কোন সম্পর্ক নেই। সময় যত বাড়ে, ভালবাসা গভীর হয়।'

শান্তা আবার পাশ ফিরল। দ্বিতীয় বছর তাকে কী দিয়েছিল শুভ? ওহো, সেবার তো সে নার্সিং হোমে। লালটি হলো। তার পরের বছর ফুলে ফুলে বাড়ি ভরে গেলেও বিছানায় কাঁথা, অয়েল ক্লথ, ফিডিং বটল। এখন তো শুভর জন্য আলাদা সিঙ্গল বেডের ব্যবস্থা। ছেলেমেয়ে নিয়ে শান্তা শোয় বড়খাটে। তার মধ্যেই মাঝে মাঝে এক আধদিন তারা যখন এক বিছানায়, তখন কত সাবধানতা তাড়াহুড়ো। ভাল্লাগে না। সব কিছুই কেমন মেশিনের মত হয়ে গেছে। শান্তা একাই নয়, শুভও একটা নিয়মে বাঁধা যন্ত্র। কবে থেকে যে জীবনটা এমন হয়ে গেল।

কাল শান্তার উত্তর না পেয়ে শুভ আবার জিজ্ঞাসা করেছিল,—'শাড়ি নেবে?'

শান্তা চুপ। কী বলবে? এখন বউকে কিছু দেবার ধরনটাও শুভর যান্ত্রিক হয়ে গেছে।

—'বলো কী চাও? আমেরিকান ডায়মণ্ডের সেট আনব? না ভাল পারফিউম।'

বারকয়েক প্রশ্ন করার পর বিরক্ত হয়েছিল শুভ, —'তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

—'কী আবার হবে? কিছু না।'

—'উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

—'এমনি।'

এরপর শুভ উঠে সিগারেট ধরায়। সামান্য খোশামোদের চেষ্টা করে, —'আরে বাবা, লজ্জা কি, বলেই ফেলো না কী চাই?'

—'কিছু চাই না, শুয়ে পড়ো।'

শুভ আস্তে আস্তে ধৈর্য হারাচ্ছিল।

—'তোমাদের, মেয়েদের এই এক ন্যাকামো। সোজা কথার সোজা উত্তর দিতে জানো না।'

—'ন্যাকা কী বললাম?'

—'ন্যাকা নয়? সাধারণ একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি...'

—'দ্যাখো, তোমার সঙ্গে বকবক করতে আমার একটুও ভাল লাগছে না। সারাটা দিন খাটতে খাটতে মুখে রক্ত উঠে যায়, কোন সময় তো ফিরেও তাকাও না। বছরে একদিন আদিখ্যেতা করে আর...'

—'বুঝেছি।' শুভ সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর।—'আর কিছু বলতে হবে না।'

—'সত্যি কথা বললেই গায়ে ছ্যাঁকা লাগে...'

এভাবেই কিছুক্ষণ অকারণ কথা-কাটাকাটির পর বারান্দায় বেরিয়ে গিয়েছিল শুভ। শান্তাও তাকে ডাকেনি।

নাহ, আর শুয়ে থাকলে দেরি হয়ে যাবে। শান্তা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল আয়নার সামনে। কাল অত কথা না শোনালেই হত। কী যে মাঝে মাঝে হয়ে যায়! মেজাজটাকে কিছুতেই বাগে রাখা যায় না। এরকম চলতে থাকলে...। নাহ, শুভ বাড়ি ফিরলে সে আজ নিজে থেকেই মিটমাট করে নেবে। সন্ধেবেলা একটু সাজগোজ করলে কেমন হয়? শুভ বেশ চমকে যাবে তাহলে। শান্তা নরম করে হাসবে তখন, —'এখনও রাগ আছে?'

শুভ ঠোঁট ফুলিয়ে তাকাবে বাচ্চা ছেলেদের মত। শান্তা ওর বুকে হাত রাখবে, —'তুমি তো আজকাল নিজে থেকে আমাকে কিছু দাও না। বেশ, আমি আজ নিজেই চাইছি...'

শুভ শান্তাকে ছুঁতে গিয়েও হাত সরিয়ে নেবে। তখনও হয়ত দ্বিধা। শান্তা নিজেই ওর হাত তুলে ছোঁয়াবে নিজের বুকে, —'শুনবে না কি চাই?'

নিশ্চয়ই আর রাগ করে থাকতে পারবে না শুভ। ওকে কাছে টানবে। আর সেই ফাঁকে শান্তা টুপ করে বলে ফেলবে মনের কথাটা, —'শাড়ি, গয়না, আসবাব

এ সবের মধ্যে বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছি গো। আমাকে তুমি আগের দিনের মত একটা রঙিন দিন উপহার দিতে পারো?'

এভাবে শেষ করতে পারলে একটা দারুণ রোমান্টিক বিবাহবার্ষিকী গল্প লেখা যেত। হল না। তার আগেই আমার গল্প থেকে দুম্ করে উঠে এল শান্তা। খোলা চুল চুড়ো করে মাথার ওপর যেমন তেমন জড়ো করা, ঘাড়ে কপালে তিরতির ঘাম। আটপৌরে শাড়িতে মুখ মুছতে মুছতে হাঁপাচ্ছে —'থামুন। বন্ধ করুন আপনার লেখা।'

—'কেন? কী হল'।

—'বাহ্, আপনার হাতে কাগজ কলম রয়েছে বলে আমাকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেবেন? এ চলতে পারে না।'

—'তোমার পছন্দ হচ্ছে না?'

—'প্রথমটা মন্দ শুরু করেননি। ঝগড়াঝাঁটি, কথাবন্ধ, এমনকি মন খারাপ হওয়া অবধি ঠিকঠাক ছিল। তারপরে একগাদা রোমান্স-ফোমান্স এনে যাচ্ছেতাই রকমের ক্যাতকেতে করে ফেললেন।'

—'বারে, আমি তোমার মনের কথাই তো লিখতে চাইছিলাম। তোমার ভেতরকার আবেগগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে...'

—'আবেগ এলেই ওরকম সব ডায়লগ বলতে হবে নাকি?' মুখে আঁচল চেপে খিলখিল হেসে উঠল শান্তা, —'তাও বিয়ের বারো বছর পরে? ইমপসিবিল। আপনার দেখছি কোন আইডিয়াই নেই!'

—'কিন্তু একদিন তো এসব ডায়ালগই ভাল লাগত।'

—'যখন লাগত লাগত। সব কিছুর একটা সময় আছে...'

—'তোমরাই কিন্তু বলেছিলে ভালবাসার সময় নেই।'

—'একটা বয়সে সবাই বলে। বাস্তবিক কি তাই হয়?' শান্তা হাসি থামাল, 'উঁহু, আপনার দেখছি ম্যারেড লাইফ সম্পর্কে কনসেপশনই নেই! ওসব মধুর মধুর দৃশ্য ফিল্মে ভাল লাগে কিংবা আপনাদের মত লিখিয়েদের গল্প উপন্যাসে। প্র্যাকটিকাল লাইফে ওরকম কখ্খনো হয় না। বাস্তব হল সমুদ্রের মত। যত উচ্ছ্বাস তীরের কাছে। ভেতরে যান, দেখবেন জল ক্রমশ কেমন শান্ত, গভীর...'

—'তাহলে বলছ মধ্যবয়সে তোমরা আর ওধরনের সংলাপ বলো না?'

—'বলার দরকার হয় না।'

—'বিবাহবার্ষিকীর দিনেও নয়? নিশ্চয়ই মানো আজ তোমাদের সম্পর্কটা রিনিউআলের দিন?'

—'মন্দ বলেননি।' শান্তা আমার টেবিলে উঠে বসল, —'তবে সম্পর্ক রিনিউআল না বলে অভ্যেস রিনিউআল বলতে পারেন। আমাদের সম্পর্ক আবেগ, আদর, ভালবাসা সবই খাওয়া-ঘুমোনোর মত একধরনের অভ্যেস হয়ে গেছে। কিংবা অভ্যেসটাই ভালবাসা।'

—'তাই যদি তবে রসমালাই বানাতে গেলে কেন?'

—'বানালাম। বানাতে হয় তাই।' শান্তা ঠোঁট ওল্টালো, —'তাছাড়া সন্ধেবেলা লোকজন আসবে, তাদের আপ্যায়ন করার জন্য...'

—'আর শুভর সঙ্গে কাল যে ঝগড়াটা করলে? সকাল থেকে সে কথা বলেনি, মনখারাপ, এ'ও কি হতে হয় তাই?'

শান্তা বুঝি থমকাল। সেই সুযোগে নিজেকে গুছিয়ে নিলাম, —'তুমি বোধহয় ঠিক বলছ না শান্তা। সবটাই শুধু অভ্যেস হতে পারে না। আমি তো জানি বিয়ের আগে তিনটে বছর, বিয়ের পরও বছর দেড়েক তোমরা কী করেছ। গঙ্গার ধারে সাইত্রিশ দিন, ভিক্টোরিয়ায় ছাব্বিশটা সন্ধে, কাফে-ডি-মনিকোর বাহান্নটা বিকেল. তারপর বিয়েব পর রাতের পর রাত... মনে পড়ে তখনকার কথা? বলতে চাও তার কিছুই অবশিষ্ট নেই?'

মুহূর্তে শান্তার গালে আবির ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ, —'আপনি কি তখন থেকেই আমাদের ফলো করেন নাকি?'

—'করি বৈকি। কাফে-ডি-মনিকোতে তোমরা যখন পরস্পরের আঙুল ছুঁয়ে বসে থাকতে, মনে হত একটা অদৃশ্য তরঙ্গ তোমাদের শরীরে খেলা করছে। গঙ্গার ধারে বসে যখন দু'জনে তাকিয়ে থাকতে দূরে জাহাজগুলোর দিকে, কী সুন্দর একটা ভালবাসার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ত চারিদিকে। বারো বছর একসঙ্গে থাকার অভ্যেসে তার সবটাই...'

শান্তা এবার উদাস যেন। শেষ ঢিলটা ছুঁড়লাম. —'আজ যদি শুভ ফিরে হঠাৎ তোমাকে আগের মত করে আদর করে, তোমার কি একটুও ভাল লাগবে না? সত্যি বলো তো?'

শান্তা ধীরে ধীরে সামলে নিল নিজেকে, —'ভাবতে খারাপ লাগে না। তবে সত্যি বলতে কি ওরকম হয় না।'

—'কি হয় তাহলে?'

—'আমাদের পেছনে সব সময়ই তো ঘুরঘুর করছেন। আজও থাকুন রাত অবধি। কি হয় দেখে নেবেন।'

অতিথিরা কেউ তখনও আসেনি। শান্তা কাজটাজ সেরে ছেলেমেয়েদের একটু পড়িয়ে নিচ্ছে, ডোরবেল বাজল। শুভ ফিরল হাতে কিছু ফুল আর একটা বাদামি প্যাকেট। দরজা খোলার সময় শান্তা আড়চোখে দেখে নিল সেটা। বিকেলবেলা আজ একটু সাজ করেছে। চুল পেঁচিয়ে বাহারী খোঁপা বেঁধেছে মাথায়, মুখে হালকা প্রসাধন, আকাশী নীল তাঁতের শাড়িতে বেশ ঝকমকে দেখাচ্ছে তাকে। চোরা চোখে একবার বউকে দেখে নিয়ে ভেতরে এল শুভ, —'কেউ আসেনি?'

—'নাহ্।'

—'এটা রাখো। পছন্দ হয় কিনা দ্যাখো।'

লালটি দৌড়ে এল, —'বাপি, তুমি দেরি করলে? মা বলছিল তাড়াতাড়ি ফিরতে পারো...'

দারোগার সামনে পড়া আসামীর মতো শান্তার দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলল শুভ।

—'তাড়াতাড়ি তো বেরিয়েছিলাম। বাস্ট্রামের যা অবস্থা, তারওপর আজ তিনটে মিছিল বেরিয়েছে এসপ্লানেডে...'

শান্তা নিঃশব্দে রান্নাঘরে চায়ের জল বসাতে গেল।

রাতে ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, শান্তা যখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে, শুভ পাশে এল, —'অনিমেষদারা এবার এল না কেন বলো তো?'

—'কি জানি!' শান্তা কাঁটা খুলে চুলের গোছা ছড়িয়ে দিল পিঠের ওপর,—'নন্দিনী এবারও এসেছে। ওদের অ্যানিভার্সারিতে কিন্তু যেতেই হবে।'

—'কবে যেন ওদেরটা?'

—'দেরি আছে। ডিসেম্বরে।' শান্তা পাশের টেবিলে পড়ে থাকা পিওর সিল্কে হাত বোলালো।

শুভ ঝুঁকল, —'পছন্দ হয়েছে?'

—'এত দামী কিনতে গেলে কেন? তোমাকে পয়সা কামড়ায়?'

—'দাম নিয়ে ভাবতে হবে না। কেমন হয়েছে বলো।'

—'আরেকটু ডিপ পেলে না? রঙটা বড় ম্যাড়মেড়ে...'

শুভ গোমড়া হল, —'এইজন্যই তোমার জিনিস আমি কিনতে চাই না। কাল অত করে জানতে চাইলাম... অযথা মেজাজ দেখালে!'

—'মেজাজ তুমি দেখাওনি?' শান্তা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসেছে,—'সকালবেলা বাজারটা পর্যন্ত করে দিলে না। এত লোকের আয়োজন, আমি একা একা...'

—'কথা বললে তখন উত্তর দিতে তুমি? রাত থেকে যা একটা মুখ করে রেখেছিলে! মাঝে মাঝে তোমার মাথায় ভূত চাপে।'

—'আমার মত খেটে মরতে হলে দেখতাম কার মেজাজ ঠিক থাকে।'

—'নিজেই যেচে খাটো। কতদিন থেকে বলছি একটা রাতদিনের লোক রেখে নাও...'

শান্তা ফোঁচ ফোঁচ নাক টানল। শুভ সিগারেট নেভাল।

—'শোভনা বৌদি বলছিল হাতে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে। আমি কালই গিয়ে নিয়ে আসব।'

—'না. না।' শান্তা চোখমুখ ঘোরাল। —'রাতদিনের লোক মানেই গাদাগুচ্ছে খরচা। কোন দরকার নেই।'

—'মনে থাকে যেন। আর এ নিয়ে খোঁট দিতে পারবে না।'

—'হ্যাঁ, আমি তো শুধু খোঁটাই দিই! শান্তার ঠোঁট ফুলল, —'তুমি কিছু বলো না!'

এ প্রসঙ্গ আর বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শুভ কথা বদলাতে চাইল, —'তোমাকে আজ সন্ধেবেলা বেশ দেখাচ্ছিল।'

—'খোসামোদ।' শান্তা চুলে চিরুনি চালাল, —'রসমালাই কেমন হয়েছিল?'

—'মন্দ নয়। তবে আজকাল বড় বেশি ভ্যানিলা মেশাও তুমি। আগে আরও ভাল করতে।'

—'খেয়ে তো নিলে চেটেপুটে।' শান্তা ঠোঁট টিপল।

—'খেলাম।' শুভ ঝুঁকে আচমকা একটা চুমু খেয়ে ফেলল বউকে।

লালটি ঘুমের ঘোরে হাত-পা ছুঁড়ছে। ওঁর লাথি খেয়ে বুবলা যে কোন মুহূর্তে জেগে উঠতে পারে। শান্তা হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দিল।

—'কি, দেখলেন তো?'

—'দেখলাম।'

—'বুঝলেন কিছু?'

—'মনে হচ্ছে বুঝেছি।'

—'কচু বুঝেছেন!' শান্তা শুভর বিছানা থেকে চাপাস্বরে হেসে উঠল, —'যান, এবার কেটে পড়ুন। আজ অন্তত আমাদের কিছুক্ষণ একা থাকতে দিন।'

ঘরের ভিতর অন্ধকার যেন অন্ধকার নয়, মাঝসমুদ্রের গাঢ় নীল শান্ত জল। এবার মনে হয় গল্পটা ঠিক ঠিক লিখে ফেলতে পারবো।

রূপকথার জন্ম

মা মরতে বাজান যখন ফের নিকে করে নূরির তখন বয়স বারো। সবে ফুল আসতে শুরু করেছে শরীরের আলে-ডালে। হঠাৎ হঠাৎ মন উচাটন। এমন একটা সময় মাকে হারিয়ে সে বড একা হয়ে যায়। মা তার অনেক হাসি-কান্নার সঙ্গী ছিল। এই গোরস্তানেই মাকে মাটি দিয়েছিল বাজান। গোরস্তানটা যখন তখন হাতছানি দিয়ে ডাকত কাছে। পায়ে পায়ে কখন যে চলে আসত, টের পেত না নিজেই। চুপচাপ বসে থাকত ঢিবিব ওপর। সামনেই মায়ের গোর। ঝুরো মাটি অনেকদিন স্তূপ হয়ে ছিল সেখানে। কাদা ফুঁড়ে মাথা তুলেছিল একগোছা গুলল তুলসী। বাতাসের ঝাপটে কচি ডাঁটাগুলো দোদুল দোল। এখন এদিকটা ঝোপেঝাড়ে একাকার। একসময়ে এখানে বসে মায়ের সঙ্গে কথাও বলত নূরি।—'ওমা তুই কুথায় চলি গেলি?'

—'কুথাও ঝাইনি বাপধন। ইখেনেই আচি।'

—'কুথায় আচিস? আমি ক্যান তোরে দেকত্তি পাইনিকো?'

—'মাটির কোলে আচি বাপ। আকাশ হইয়ে আচি। গাচ হইয়ে আচি।'

—'ভালই হইয়েচে। আর তোরে বাপের ঠেঙানি খেতি হবেনি।'

—'আমারে আর কেউ পাবে নি কো। আমি এখুন পিথিমি হইয়ে গেচি।'

নূরি ফুলে ফুলে কাঁদত,— 'আমারেও কেন তুব কাচে লিযে যা না। সৎমাটা খুপ কাঁটকি। আতদিন খিচমিচ করত্তিচে।'

মায়ের কোলের মতন তখন গোল হয়ে ছড়িয়ে বসত আকাশ। মাটি আঁচল বিছিয়ে দিত। গাছগাছালি বাতাস করত পাতা নেড়ে। মায়ের মত মিহি সুরে গান শোনাত পাখিরা। নূবি চিৎকার করে বলত,—'আমিও পিথিমি হইয়ে যাব। কেউরে ভাল নাগে না আমার। কিছু ভাল নাগে নিকো।'

গোরস্তানের বুকে পোড়ো মসজিদ। ভাঙা পাঁচিল টপকে অনায়াসে চলে আসত এদিকে। এঁদো পুকুরের ধার ঘেঁষে দাঁড়াত। সবুজ জলে থিরথির কিশোরী ছায়া। কচুরিপানার গন্ধ উঠত পুকুর বেয়ে। এক সময় নিজের গা থেকেই কচুরিপানার গন্ধ পেতে শুরু করল নূবি। ঝোপেঝাড়ে ফড়িং ওড়ে। কাঠবেড়ালি ছোটে এ গাছ ও গাছ। তরতরিয়ে ডাল বেয়ে উঠে যেত নূরি। ডালে ঝুলে দোল খেত। ঘোড়ানিমের পাতা সরিয়ে উঁকিঝুঁকি দিত বুড়ো গিরগিটি। গায়ের কাছে পিড়িং পিড়িং ঘুঘু শালিখের নাচ। ফিঙে, মাছরাঙাদের পিছনে উড়ে বেলা যেত। নূরি টের পেত, সেও একটু একটু করে মার মতন পৃথিবী হয়ে যাচ্ছে। ভারি ভাল লাগত। বুক খুশিতে ডগমগ। খিলখিলিয়ে হাসত। হাসতে হাসতে ঝাঁপিয়ে পড়ত জলে। জল-পোকার মত মিশে যেত জলের গায়ে। আঁজলাভরে সবুজ জল ছুঁড়ে দিত পাড়ে।

কতকাল পর আজ আবার শরীরে কচুরিপানার গন্ধ। একবুক জলে দাঁড়িয়ে আঁচল খুলে ভাসিয়ে দেয় নূরি। মসজিদের সবুজ জলে জোড়াপদ্ম পাপড়ি মেলে। জলসপ্‌সপ

আঁচল তুলে আবার কাঁধে ফেলে। পদ্মডাঁটার মত হাত দুটো ছড়িয়ে শান্ত পুকুরে শব্দ তোলে ছপছপ। মাছেদের পাশাপাশি তরতরিয়ে সাঁতার কাটে। এপার থেকে ওপার। আবার এপার। ডুব দেয়। ভাসে। ঝাঁপাঝাঁপি করে। সজনে বাবলার ডাল কাঁপিয়ে বাতাস ঝিরঝির হাসে। উথাল-পাথাল শরীর ভাসিয়ে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটে নূরি। একসময় উঠে আসে ঘাটে। ঘাট বলতে পাড় থেকে ফেলা নারকেল গুঁড়ি। সেখানে দাঁড়িয়ে কাপড় নিংড়োয়। চুল ঝাড়ে। আর তখনই চোখ পড়ে সামনের দিকে। হাই বাপ, ওখানে অতখানি পাকা ঘর উঠল কবে? কটা দিনের ভেতর কত কিছু বদলে গেছে গাঁয়ের! নূরি পরিষ্কার দেখে একজোড়া চোখ টুক করে সরে গেল দোতলার জানলা থেকে। মানুষটা তবে তাকেই গিলছিল। নূরি নড়েচড়ে দাঁড়ায়। ঢেউতোলা ভুরু নাকের কাছে জড়ো। পুরুষমানুষের এ দৃষ্টি এখন চিনে গেছে সে। বছরভোর মঈদুলের ওই চাউনি দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। দিন নেই, রাত নেই যখন তখন মঈদুল খামচে ধরত তাকে। দোরের শিকল তুলত। প্রথম প্রথম নূরির বুকেও ঢেঁকি ঢপঢপ। শরীর জুড়ে কুলকুলে সুখ।

সাদির মাস ফেরেনি তখন, শাশুড়ি বলল,—'এখুন থেকে সোমসারের আঁদা বাড়া তোকেই করতি হবে বউ।'

নূরি ভাত গালতেই শেখেনি তো রাঁধাবাড়া! এই নিয়ে কম গাল পেড়েছে সৎমা! বাজানের কাছে নালিশ করে মার খাইয়েছে কত। উঠতে বসতে ঝনঝনানি,—'এই মেয়ে লিয়ে অনেক দুককু আচে তুমার। কাজকাম কিচু শিকলোনিকো। আতদিন আলেডালে ঘুরতিচে।'

নূরি শুনেও শুনত না। সে তখন পৃথিবী হয়ে গিয়েছিল। মার মত মিশে গিয়েছিল মাটির সঙ্গে। আকাশের সঙ্গে। নিজের মনে ডানা মেলে উড়ে বেড়াত সারাদিন। খিদের টানে ঘরে ফিরত।

তা শাশুড়ি যখন ফরমান দিল ঢুকতেই হল হেঁসেলে। ও সব এতাল বেতাল কাজ তার মোটে ভাল লাগে না। তাব চেয়ে ঢের মজা মাঠে ঘাটে ছাগল চরানোতে। কিংবা শুধুই ছুটে বেড়ানো এদিক সেদিক।

একদিন শহর থেকে তাকে এক শিশি স্নো এনে দিল মঈদুল। হাটে কেনা আনাজপাতি কলকাতার বাজারে বেচতে যেত সে। রাতে গাল টিপে বলল,—'এবার থিকে ওজ সাঁঝের বেলা ছোনো মাকবি। চুল বাঁদবি বাহার করে। কী আক্কুসীর মত আতদিন এলোচুলে থাকিস।'

শুনে একচোট খিলখিলিয়ে হাসল নূরি।

পরদিন শাশুড়ি গেছে ঘাটে। ডাল নামাতে গিয়ে ফোড়নের শিশিখান ছিটকে পড়ল মেঝেয়। পাতলা কাচের শিশি ভেঙে খান-খান। নূরি সিঁটিয়ে গেল ভয়ে। কেন্নো পোকার মত মুখ গুটিয়ে এতটুকু। শাশুড়ি দেখলে চুলের গোছা ছিঁড়বে। তাড়াতাড়ি স্নো-এর শিশি থেকে সাদা সাদা গন্ধওয়ালা জিনিসটুকু সাপটে ফেলে দিল ঝাঁপের ওধারে। ফোড়নগুলো খুঁটে রাখল শিশিতে।

কাজ থেকে ফিরে কাছে টানল মঈদুল,—'ছোনো মাকিসনি যে বড় !'

মানুষটা যত রাগে নূরি তত হাসে ফিকফিক। শেষমেশ বলে,— 'ফেইলে দিচি। শিশির মদ্যি এখুন আঁধুনি আচে।'

হাই বাপ? শুনে মিয়ার সে কি রাগ! ছেলে যত গাল পাড়ে মা তার তিনগুণ। মিঞার গরম মেজাজে ছ্যাঁকছোঁক পড়তে থাকল মায়ের নালিশ। পাখার ডাঁটি লম্বা লম্বা দাগ ফেলে দিল পিঠে। এর পর থেকে প্রায়ই বউকে সিধে করতে ধোলাই দিতে লাগল মঈদুল। ছাগল চরানো বন্ধ। এদিক সেদিক যাওয়া মানা। শুধু ঘর আর ঘাট। ঘাট আর ঘর। সারাদিন কালো মুখে ঘরের কাজ সারে নূরি, আর রাতে মিঞার বায়না রাখে। দিনমানে বারকযেক শুধু ঘাটে যাওয়া। টিলটিলে জলের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেই বুক হু-হু করে। চোখ ঝেঁপে জল নামে। আলেডালে কিচকিচ করে পাখপাখালি। সর সর হাওয়া ছোটে বাঁশবনে। ডুব দিতে নেমে নূরি সংসার ভোলে। পুকুর বলে —'আয় নূরি, পানি হয়ে যা।' ঘাটে গেলে সময় যায়। শাশুড়ি গালমন্দ করে।

শেষে একদিন এক-গা-জল নূরির ঝড় ওঠে চোখের পাতায়,—'আমি আর তুদের ঘরে থাকব নি। তোর ছেলেরে বল আমারে তালাক দিতি।'

শুনে মিঞার চোখে এক উনুন আঁচ গনগন,— তোরে তালাকও দিবুনি, নে ঘরও করব্ নি। আমি আরেকটা বিবি আনব।'

নূরি নিজেই পালিয়ে আসে।

পাকা কোঠাবাড়ির দিকে পিছন ফিরে ভিজে কাপড় রগড়ে গা হাত পা ডলে নূরি। সবুজ শরীর ফেটে তেল গড়ায়। সুপুরি নারকেলের মাথা কাঁপিয়ে একঝাঁক টিয়া উড়ে যায়। নূরি ঘাড় তুলে দেখে। কচি পানপাতা মুখে ঝিকঝিক করে সাদা পাথরের নাকছাবি। ঘোড়ানিমের ডালে মুখ লুকিয়ে কোকিল ডাকে। চিকন শরীরে ঢেউ তুলে সে কোকিলটাকে খোঁজে। রঙের বাহাব লেগেছে গাছগাছালিতে। মসজিদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা রাধাচূড়া গাছে সোনা রঙ-এর ছড়াছড়ি। নূরি খুশিতে পাগল হয়ে যায়। আকাশে দু'হাত তুলে ডেকে ওঠে,—'আমি কোকিল কেন হই নি খোদা?'

দুই

স্টেশনের ধারে জামালুদ্দিনের চায়ের দোকান। চারখানা মোটা বাঁশের খোঁটার ওপর টিনের চালা। তোলা উনুনে দুবেলা আঁচ পড়ে। ভেতরে কাচের বয়ামে সস্তাদামের বিস্কুট। লাল নীল হজমি লজেন্স। কিছু বিড়ি সিগারেটও রাখে দোকানে। জামালের নিজের কোন নেশা নেই। পাতলা ছোটখাট চেহারার মানুষটা ঘোর হিসেবী। বাপ মরতে মা আবার নিকে করেছিল। সেই থেকে একা। ক্যানিং-এ মাছের ঝোড়া বয়ে পয়সা জমিয়েছিল। তার সঙ্গে কিছু ধার-দেনা করে এই দোকান।

পাশের গাঁয়ের মেয়ে নূরি। হঠাৎই একদিন উমনো ঝুমনো চুলে ছুটে এসেছিল

এদিকে। দেখে জামালের বুকে সে কী ঝড়। এত রূপ কোন মানুষের মেয়ের হয়। হুরিপরী নয় তো। খবর নিয়ে জেনেছিল ও গাঁয়ের হারান মোল্লার মেয়ে। দেখেশুনে সাদি করিয়েছিল হারান। মরদটা হাড় হারামজাদা। অমন টকটকে বিবিটাকেও বেধড়ক পেটাতো। জামালের মনে থির থির করে উঠেছিল দুঃখ। এমন একটা পরী পেলে সে বুকে করে রাখতো।

আজকাল প্রায়ই আসে মেয়েটা। আলের পথ বেয়ে স্টেশনে ওঠে। অবাক চোখে চেয়ে দেখে ট্রেনগাড়ি, মানুষজন। আচমকাই নেমে যায় ধানবাদায়, আনাজক্ষেতে। পাখির মত উড়ে বেড়ায় হলুদ রোদ্দুরে। জামাল ব্যবসা ভুলে নিথর চেয়ে থাকে। মাঝেমধ্যে তার দোকানেও এসে ওঠে মেয়েটা। পাটায় পা ঝুলিয়ে বসে কলকল করে। একথা। সেকথা। জামালের বুক তখন টালমাটাল। শরীর জুড়ে চোরা কাঁপুনি।

—'কিরে, চা খাবি?' তোতলা গলায় জিজ্ঞাসা করে জামাল।

সজনে ফুলের মত ঝিরঝিরিয়ে হাসে নূরি,—'চা খাবুনি, লোজেন দাও।'

তাড়াতাড়ি লজেন্স বার করে দেয় জামাল। মনের ভেতর হাজার কথার বুড়বুড়ি। শেষে একদিন বলেই ফেলে—'তুই আমারে নিকে কর না কেন! দুবেলা কত নজেন খাওয়াব!'

—'মারবে নি তো?' নূরি গালে লজেন্স ফেলে পা দোলায়।

—'কখখুনো না। পীরের কিরা।'

—'য্যাখন ত্যাখন কাজ করতে বলবেনি? আমি কিন্তু আঁদাবাড়া করতি পারবু নি।'

—'তোরে কিচ্চু করতি হবেনিকো। খালি আমার আদুর খাবি।'

লালদোপাটি ঠোঁট ছড়িয়ে হাসে নূরি,—'ঠিক কতা?'

—'ঠিক কতা।'

—'আমি পিথিমি হতে চাইলি হতে দিবে তো?'

এবার ঘাবড়ে যায় জামাল। লোকে বলে হারান মোল্লার মেয়েটার নাকি মাথায় ছিট। নিজের খেয়ালে বনেবাদাড়ে ঘোরে। একা একা কথা বলে। গান গায়।

—'চুপ মেরি গেলে যে?' নূরি গাল ফোলায়।

—'না, এমনিই। জামাল ঢোঁক গেলে,—'তা পিথিমি হওয়াটা কিরে?'

—'তাও জানো নি? আমার মা মরে গে পিথিমি হইয়ে গেছে। আম্মও তেমন হতি চাই।'

এবার কিছুটা বোঝে জামাল। আলগা চাপ দেয় নূরির হাতে,—'মরণের কতা বলতে নি রে। মরণ হক তোর শত্তুরের। তুই আমার বিবি হইয়ে থাকবি।'

—'বিবি হতি ভাল লাগেনিকো। আমি পিথিমি হতি চাই।'

—'দূর বোকা মেয়ে!' জামাল এদিক ওদিক দেখে নিয়ে নূরির পিঠে হাত বোলায়, —'সোমসারে কত সুক্ জানিস্?'

—'বেশ। তবে বা'জানরে বলো।' নূরির চোখ উদাস ভেসে যায়,—'মঈদুল মিঞা আমারে তালাক দিবেনি।'

—'সে তো শুনি আবার নিকে করেচে!'

—'তা করেচে। তবে আমারেও তালাক দেয় না।'

জামাল বোঝে এ ব্যাপারে মেয়েব সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। হারান মোল্লাকেই ধরে পড়ে। শুনে হারানের নাকের পাটা ফোলে। ঘাড় শক্ত হয়.—'দশ কুড়ি ট্যাকা দিতি হবে।'

মাথায় হাত দিয়ে বসে জামাল। আগের বছব দোকান সারাতে এককাঁড়ি খরচা গেছে। দেনা শেষ হলেও সুদ বাকি।

হারান বলে.—'দশ কুড়ি ট্যাকার কমে হবেনি। মঈদুল মিঞাব পাঁচ কুড়ি আগে শোধ দিতি হবে। নইলে সে ছাড়ান দিবেনি।'

জামাল কুলুঙ্গিতে তোলা বাক্স ঘেঁটে দেখে। চাব কুড়ি মতন আছে। আরও ছ' কুড়ি চাই।

হাবান তাড়া লাগায়.—'যা করার চপ্পর চপ্পব কোবো বাপু। ক্যানিং-এব একজন নূরিবে দেখে এক্কেরে পাগল। পঁচিশ কুড়ি দিতি আজ্জি আচে। তা তুমি যতি দশ কুড়ি দাও তাতেই মেয়ে দিয়ে দুব। মেয়েরে আর দূরি পাটাতি মন চায়নি কো।'

জামাল খেয়ে না খেয়ে পয়সা জমায়।

তিন

পোড়ো মসজিদেব গা বেয়ে এক-পা এক-পা কবে নেমে আসছে অন্ধকাব। ভাঙাচোরা মসজিদ বছরভোব আলগাই পড়ে থাকে। উঠোনের ফাটা শানে কুকুর ঘুমোয়। বাতে ঘুলঘুলি থেকে পেঁচা ডাকে। আনতাবড়ি নেচে বেড়ায় চামচিকে।

আশপাশেব গাছগাছালিতে পাখিদের ঘরে ফেরাব মেলা। নূরি সেদিকে চেয়ে চুপচাপ বসে থাকে। তাকেও যেন ঘবে ফেরার জন্য ডাকছে কেউ। যুবতী-শরীরে চাপা ছটফটানি।

আকাশের বুকে সিঁদুরের ছোপ লেগেছে। লালটুকটুকে সূর্য যেন নীল কপালের চাকতি টিপ। নূরি দূরের পাকা বাড়িব জানলাটার দিকে চায়। এখন সে জেনে গেছে ওটা শেখেদের বাড়ি। মুন্নু শেখ ও-বাড়ির মালিক। তিন-তিনটে বিবি আছে আর বালবাচ্চা। সৎমা বলে মুন্নু শেখের অনেক পয়সা। মাছেব আড়ত আছে ক্যানিং-এ। তেজারতিতেও রমরমা। যখনই সে পুকুরে আসে. দোতলার জানলা থেকে উঁকি মারে সেই একজোড়া চোখ। ঘাড় ঘুরোলেই গোল মুণ্ডুখানা টুক করে সরে যায়। প্রথম প্রথম রাগ হত। আজকাল হয় না, বরং শরীর শিরশিরিয়ে ওঠে। ঘুবেফিরে পুকুবের আয়নায় নিজেকে দেখে। আগের মতই ঢেঁকির পাড় পড়ে বুকে। মঈদুলের গড়াপেটা শরীরটা মনে পড়ে যায়।

ঘোড়ানিমের ডালে কোকিলটা ডাকছে আবার। পাখিটাকে খুঁজতে উঠে দাঁড়ায় নূরি। তখনই কাঁধের কাছে আরেকটা মানুষের ছায়া। নূরি চমকে পেছন ফেরে। চিনতে অসুবিধে হয় না। শেখেদের জানলার সেই গোল মুণ্ডুওয়ালা লোকটা। একটুও ঘাবড়ায়

না নূরি। যেন কতদিনের চেনা এভাবে তাকায়। ফুলের মত হাসে।

এ পথ দিয়ে ঘরে ফিরছিল মুন্নু শেখ। মেয়েটাকে টিবিতে বসে থাকতে দেখেই বুকের রক্ত ছলাৎ। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে।

নূরি ঘুরে ঘুরে তাকায় মানুষটার দিকে। হাই বাপ! কি বড়সড় শরীরটা গো।

মুন্নু গলা ঝাড়ে,—'একা বসে আচিস, দুটো কতা কইতে এলম।'

—'বেশ করেচো।' সরে বসে টিবির ওপর জায়গা করে দেয় নূরি। আকাশ বেয়ে একঝাঁক সারস উড়ে যায়। সকলেই একসময় ঘরে ফেরে—পাখি, জন্তু, মানুষজন।

মুন্নু চারপাশ দেখে নিয়ে বসে পাশে,—'আমারে চিনিস তুই? তোদের ইদিকে বেশিদিন তো আসিনি। আমার নাম মুন্নু শেখ।'

—'হাই বাপ! তুমিই তাইলে ছেকছাযেব? তা ওজ অমন নুইকে নুইকে দ্যাকো কেন?'

মুন্নু জুলজুলে চোখে মেয়েটার দিকে তাকায়।

—'কি দেকচ?' সবুজ গাছের মত শরীর দুলিয়ে হাসে নূরি।

—'তোরে।' মুন্নু ঢোঁক গেলে,—'তোর মুতন সোঁদরপানা মেয়েছেলে আর এট্টাও দেকিনি রে।'

—'তো কি?' নূরির ভুরুতে ঢেউ।

—'তুই আমারে নিকে কর না ক্যান?'

পাছা বেয়ে নেমে আসা থাক থাক চুল আমালদামাল ওড়ে। তেঁতুলপাতার মত কেঁপে ওঠে চোখের পালক। নূরি উঠে দাঁড়ায়।

—'উটলি যে?'

—'তোমার যে আরও তিনটে বিবি।' নূরি ঠোঁট ফোলায়।

—'তো কি? তুই আমার খাস বিবি হবি।' মুন্নু হাত ধরে বসায় নূরিকে,—'তোরে আমি এখেনে আকবনি। গঞ্জের বাজারে আমার পাকা ঘর আচে। সিখেনে তুই আলাদাভাবে থাকবি। তোরে আমি কত কিচু দুব। এক-গা গয়না দুব। এত উপ গয়না ছ্যাড়া মানায় নাকি? কলকেতা থিকে বাহারী শাড়ি এনি দুব।'

গয়না শাড়ির জন্য একটুও লোভ হয় না নূরির। মুন্নুর শরীরটাই তাকে টানে বেশি।

—'কি ভাবতেচিস?'

নূরি মাথা চুলকোয়,—'তোমারে আমি নিকে করি কি করে? মঈদুল মিঞা যে আমারে তালাক দেয় না।'

—'তাতে কি এসি যায়?' মুন্নু ঠোঁট ওল্টায়, 'আমি তোরে নে ঝেতি চাইলে কোন শালার খ্যামতা আচে আমারে আটকায়?'

নূরি ঠারে-ঠোরে মুন্নুকে দেখে। ঝকঝকে মজবুত শরীর। চওড়া কাঁধ। হাতে-বুকে থাক-থাক পেশী। ভরাট গলার স্বর। জামালের কথা মনে পড়ে। একরত্তি চেহারার ছোটখাটো লোকটাও তাকে বিবি করতে চায়। বেছে নিতে সময় লাগে না। মুন্নুর পাঞ্জাবির ফাঁক দিয়ে ঘন কালো লোম উঁকি মারে। আদিম অরণ্য হাতছানি দেয়।

নূরি মানুষটার লোমশ হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে,—'ইস্টিশনের জামালও আমারে বিবি করতি চায়।'

—'ছোঃ!' মুখ বেঁকায় মুন্নু—'ওটা আবার মরদ নাকি? মেয়ে-মাইনষের মত গলা। চড়ুই-এর মত বুকের খাঁচা। ও তোরে কি দিতি পারে? আমি তোরে সব দুব। ঝা চাইবি সব।'

নূবি মুন্নুব কাঁধে মাথা ঠেকায়,—'নাকছাবিটা পাল্টে দিতি হবে কিন্তুন।'

সাদা পাথরের নাকছাবি কবে থেকে নাকের লতিতে সেঁটে গেছে মনে পড়ে না নূরির। বাহারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত নাকছাবিটাও একটা প্রত্যঙ্গ এখন। তাই বুঝি শুধু ওটার কথাই মনে পড়ে।

—'সোনাব নাকছাবি গড়িয়ে দুব তোকে। অমন বাঁশি নাকে সোনা ছ্যাড়া কিচু মানায় নাকি?'

মুন্নু আচমকা জাপটে ধরে নূরিকে। আঃ, কি সুন্দর গন্ধ মানুষটার শবীরে! ঠিক যেন বুনো ঘাসের ঘ্রাণ! নূরি জোরে জোবে নাক টানে।

গঞ্জেব পাকা বাড়িতে নূরিকে এনে তোলে মুন্নু শেখ। আগে এখানে ফূর্তিফার্তা কবতে আসত। বলে, 'আজ থিকে মেয়েছেলে নে ফূর্তি করা ছেড়ে দেলম। এবার থিকে শুধু তোরে নে আমোদ করব।'

কদিন যেতেই নূরির হাঁপ ধরে যায়। টলটলে চোখে ঘরের কড়ি-কাঠ দেখে। এদিকে শুধু দোকানপাট আর ধুলোবালি। ফড়ে, ব্যাপারিদের চিৎকার শুরু হয় ভোররাত থেকে। চাবদিকে কিচকিচে হিসেবী গলা। নূরি ঝটপট করে মরে। ইট, কাঠ, দেওয়াল, দবজা গলা টিপে ধরে যেন। চাপা গুমোটে নিশ্বাসের কষ্ট। কারণ ছাড়াই গাল বেয়ে জল গড়ায়। মুন্নু ব্যস্ত হয়—'কাঁদিস কেন? গাঁয়ের জন্যি মন কেমন করে?'

নূরি ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলে।

—'তোরে এড্ডা সোনাব হার গড়িয়ে দুব। পায়ে উপোর মল।'

গযনার ভারে নূরি হাঁটতে পারে না। মুন্নু তাকে মাঝেমধ্যে বেড়াতে নিয়ে যায়। নকাবপোশে মুখ ঢাকতে হয় তখন। মুন্নু গাঁয়ের বিবিদের কাছেও রাত কাটাতে যায়। তাছাড়াও দিন-ভোর তার হাজার কাজ। এক বুড়ি পাহারা দেয় নূরিকে। সন্ধের পর নিচের ঘরে ইয়ার বন্ধু নিয়ে আসর জমায় মুন্নু। এদিকের দারোগা তার এক গেলাশের দোস্ত। একা জানালার ধারে তখন বসে থাকে নূরি। চোখের সামনে দিয়ে হু-হু করে নেচে যায় ধানক্ষেত। রুপোলি রোদ পিছলে পিছলে যায় ক্ষেত-খামারে। মানুষের ভিটের চালে লুটোপুটি খায় দামাল বাতাস। সন্ধে হলে বুড়ি তার চুল বেঁধে চোখে কাজল দিয়ে দেয়। কপালে ঝিলমিলে টিপ। মুন্নু রঙিন চোখে তাকায়।

মঈদুলের মত মুন্নুর শরীরটাও একঘেয়ে হয়ে গেছে কখন। রাজ্যের ক্লান্তি ভর করে শরীরে। বুকভরা জমাট দুঃখ। নূরি একদিন বলে ফেলে,—'এখেনে আর ভাল নাগতেছে না। গাঁয়ে যাব।'

শুনে মুন্নু শেখের চোয়াল ওঠা-নামা করে,—'কদিন ধরি দেকতিচি তোর ঝ্যানো কি হয়েচে! কিসের অভাব তোর হতিচে এখেনে শুনি?'

নূরি জেনে গেছে শেখ বড় রাগী। হঠাৎ হঠাৎ আগুন হয়ে ওঠে। তবু সাহস করে বলে,—'ঘরের মদ্যি সারাদিন বন্ধ থাকতি ভাল লাগেনি।'

মুন্নুর ভুরু কুঁচকে ওঠে,—'এ জন্যি বলে ছোটনোকবে নাই দিতিনি। সুখে থাকতি ভূতে মারে তোদেব।'

নূরি হু-হু করে কেঁদে ফেলে।

মুন্নু নরম হয়,—'তোব আর বনে-বাদাড়ে নেচে বেড়ানো হবেনিকো। তুই এখন মুন্নু শেকের বিবি,— বুইলি?'

—'আমাবে তাইলে তুমি ছেড়ি দাও।' নূরি ঝপ করে বলে বসে, —'তালাক দে দাও।'

এ কথায় মুন্নুব চোখ লাল হয়। নাকের পাটা পুটপুট ওঠা-নামা করে,—'খপরদাব। আব ও-কথা বলবিনি। ফেব শুনলে ঠ্যাং ভেঙে দুব। জান নিয়ে লেব।'

নূরি দিন দিন শুকোতে থাকে।

একদিন রাতে ফুলে ফুলে কাঁদে—'শরীলটা ভাল ঠেকতিচে না। শুদু বমি আসে।'

সন্ধেবেলাব আসর সেদিন বেজায় জমেছিল। মুন্নুর মেজাজ কিছু শবিফ। গোলাপী চোখে সে নূরিকে জাপটে ধরে.—'বুড়ি তাইলে ঠিকই বলতেছেল. পেটে তোব ছাওযাল আসতিচে!'

নূরি ফ্যালফ্যাল তাকায়। দুহাতে তাকে বুকে তুলে বনবন ঘোরে মুন্নু—'আমার নূরজাহান বিবির কোলে খোকা আসতিচে। তুই আমাবে খোকা দিবি কিন্তু। সে মাগীগুলোন খালি খুকিই বিইয়ে যাচ্চে।'

নূরির বুক ধড়ফড় করে।

মেয়ের শরীরেব খবর শুনে দেখতে আসে হারান। এখন প্রায়ই আসাযাওয়া। মুন্নু তাকে আড়তখানাব ম্যানেজার করে দেবে।

হাবান বলে,—'ও জামাই, যতি আগ না করো তো নূবিরে কদিন কাচে নে গে আকি।'

বাপের জন্য চা ঢালতে গিয়ে চলকে পড়ে। নূরি টান-টান হয়ে বসে।

—'নে ঝাও।' মুন্নু সিগারেট টানে,—'ছাওয়াল না হওয়া অবদি কাচে নে আকতি পারো। খোকা হলেই ফেরত পাটাতি হবে কিস্তুন।'

—'লেশ্চয়। লেশ্চয়।' হারান হাত কচলায়,—'তা পোয়াতি মেয়ের খরচখরচাটা...'

—'ট্যাকার জন্যি ভাবতি হবেনি। কত নাগবে? ঝা নাগে নে যাও।'

হারান মোল্লার চোখ চিকচিক করে।

চার

আগের মত নূরির সেই সরু কোমর নেই। পেটের খোল ছড়িয়ে পড়েছে উঁচু মুখে। নিখুঁত স্তন-জোড়া নুয়ে পড়েছে ভারে। চায়েব দোকানে বসে জামাল দেখে নূরিকে। বাপেব সঙ্গে গাঁযে ফিরছে। বোবখার ঢাকনা তুলে মুখটুকু শুধু বার করা। সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় নূরি চোখ তুলে চায। জামালেব বুকে ছলছল করে দুঃখ। হায আল্লা. মুন্নু শেখেব বদলে সেই যদি ছেলে আনতে পারত মেযেটার পেটের খোলে। ছ'কুড়ি টাকাব তিন কুড়ি মতন বাকি ছিল!

হাবান মোল্লা হাঁক পাড়ে.—'এই. কুনোদিকে তাকাবিনি। চোখ গেলে দুব এক্কেবে।'

কদিন আগে জোব জলঝড় গেছে। ধানবাদায একহাঁটু কাদা। পোয়াতি মেয়ে নিযে আলপথে যাওয়া ঠিক হবে না। একটু ঘোবা হয তবু বাঁধের রাস্তায় ওঠে হারান মোল্লা। মেযেব কিছু হলে মুন্নু তাকে জ্যান্ত খাবে। পা টিপে টিপে হাঁটে হাবান।

—'ও নূরি. এট্টু সাবদানে আব মা।'

গর্ভিণী নূবি নিঃশব্দে পথ চলে। চাবদিকেব কচি সবুজ বঙ বার বার তাকে উদাস করে দেয়। শিবীষ ডালে দোয়েল ডাকে। ফিঙে লাফায় পিড়িং পিড়িং। বাদায দাঁড়িয়ে হি হি হাসে কাকতাড়ুযা। গাছ-গাছালি দোল খায পৎপৎ। মাথা ছুঁযে একজোড়া কাক উড়ে গেল। নূবি ঘাড তুলে তাকায়। আকাশ হাত বাড়িযে ডাকে.—'আয নূরি, আকাশ হযে যা।' ধানচাবা বলে ক্ষেত হতে। গাছ বলে গাছ হ। নূরির ইচ্ছে কবে এক ছুটে বাদায় নেমে যায। এঁটেল কাদায গোড়ালি ডোবে। পেটের ভেতর খোকাটা নড়েচড়ে ওঠে।

আগে এত আদর করেনি সৎমা এবার যেমন কবে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। দিনভোব বিন বিন উপদেশ দেয় কানে। ভাইবোন পাযে পাযে ঘোরে। নূরির বড় সাধ বাইরে যাওয়ার। পারে না। শরীরে জুত নেই। নড়াচড়া করতে পারে না বেশি। পেটেব খোল দিন দিন ঝুলে পড়ছে নিচে। হাঁটাচলায় হাঁপ ধরে। দুধের ভারে নুয়ে পড়া ধানগাছেব মত ঝুঁকে থাকে শবীব। বাপের উঠোনে মুরগী চরে। সারাদিন দাওয়ায় বসে তাদের দেখে। ধানটা গমটা ছড়িয়ে দেয়। মোরগাটা বড় দেমাকী। সময় অসময় নেই. যখন তখন তাড়া করছে মুরগীদের। কখনো-সখনো ধরা দেয় কেউ। বেশির ভাগ সময় ছুটে পালায়।

তেজী ভঙ্গিতে তখন এগিয়ে যায় মোরগা। কোন একটাকে ধরে ধারালো ঠোঁটে ঠোকবায়। পিঠে উঠে মনের সুখে ঝটপট করে। নূরির চোখ দপদপ করে ওঠে। চোয়াল কঠিন হয়। একদিন সৎমাকে বলে,—'আর আমি ছেকের ঘরে ফিরবুনি।'

সৎমা আঁতকে ওঠে,—'হায় আল্লা! ইসব কি কুকতা বলতিচিস্? ছেকের মত বড় নোকরে কেউ কখুনও ছাড়ে? তাছ্যাড়া মঈদুলের মত তোরে পিটায়ও না ছেক। আদর সুহাগ করে। কত সুকে একেচে তোকে।'

—'ছাই একেচে। আমার ভাল লাগেনিকো।'

শিউরে ওঠে সৎমা,—'ওসব বলতি নি মা। ছেক তোরে কত কিচু দেয় বল দিনি। কত গয়না দেচে, কাপড় দেচে...'

—'উসব আমার ভাল লাগেনি।'

সৎমা খেপে যায়,—'ছেকরে ছাড়লি দুনিয়ার কুথাও ঠাঁই হবেনি তোব। আমরাও আর তোরে ঘরে তুলবনি কুনোদিন।'

—'ছেক যতি মোরে তালাক দেয়?'

—'হায় আল্লা! তালাক দিবে ক্যানো? ঝা বললি বললি. আর কেউরে বলিসনি। তোর বাজান শুনলি পরে কাটবে তোরে।'

নূরি ভেজা চোখে আকাশ দেখে। আপনমনে প্রশ্ন করে.—'মেয়েমাইনষরে কেন তালাক দিবার হক দাওনি খোদা?'

পাঁচ

ইদের দিন দশেক আগে নূরি একটা রোগাসোগা ছেলে প্রসব করে। দুদিন হল হলুদ মুরগীটাও ডিম দিয়েছে। তা দিচ্ছে দিনভোব। সে উঠে গেলে সতীনরা এসে বসে। মুখ ঘুরিয়ে নেয় নূবি। কোলের পাশে ছেলেটা ট্যা-ট্যা কাঁদে। গভীর অনিচ্ছায় স্তন গুঁজে দেয় ছেলেব ঠোঁটে। মুনু এসে খোকা দেখে গেছে। ইদের পরই গঞ্জের কোঠায় ফেরত নিয়ে যাবে।

বাপ-মা দুজনেই উপোস দিচ্ছে। সন্ধের মুখে খাওযাদাওয়া সেবে শুয়ে পড়ে সকলে। ছোট বোনটা শোয় নূরির কাছে। ডোঙা নৌকার মত চাঁদের ফালি ঝুলে আছে ছাইরঙ আকাশে। ছেলে, বোন ঘুমিযে কাদা। পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে আসে নূবি। অনেকদিন পর একটা চেনা গন্ধ নাকেমুখে ঝাপটা মারছে। সাবধানে পা ফেলে বাদায় নেমে পড়ে। বমজান মাস। সব ঘরের বাতিই তাড়াতাড়ি নিভে গেছে। বাদা টপকে পোড়ো মসজিদটার দিকে এগোয়। দূবে কোথাও শেয়াল ডাকে। ডানা ঝাপটে উড়ে যায় সাদা পেঁচা। ঢোলকলমির ঝোপে ঝিঁঝিঁব গান। নূরি জোরে জোরে শ্বাস টানে। শরতের বাতাস তার চুলেমুখে বিলি কাটতে থাকে নরম করে,—'আয় নূরি, বাতাস হয়ে যা।'

চাঁদের আলো উপুড় হয়ে পড়ে আছে গোরস্তানের বুকে। উঁচু ঢিপিটাব ওপর উঠে দাঁড়ায় নূরি। মসজিদের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ছমছমে অন্ধকার। হঠাৎ খুশি চলকে ওঠে শরীরে। চোখ ছাপিয়ে সে খুশি গড়িয়ে যায় গালে। বহুকাল পরে বুক উজাড় করে হাসে নূরি। হেসে লুটিয়ে পড়ে ঘাসের কোলে। মাটির বুক বেয়ে সে হাসি গড়িয়ে গড়িয়ে ফেরে। হাসতে হাসতে কাঁদে হাসে—আবার কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে আকাশের তারাগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। আকাশভাঙা হাসিকান্নায় আছড়ে পড়ে ধুলো, মাটি, আগাছার গায়ে।

রাত গাঢ় হয়। জিনে পাওয়া মানবীর মত বড় বড় পা ফেলে একসময় পাঁচিল টপকে যায় নূরি। চলে আসে পুকুরধারে। পাতলা সরের মত আলোর চাদর ছড়িয়ে

পড়েছে ঘোড়ানিমের মাথায়, নারকেল ডালে। ঝোপেঝাড়ে ছোট ছোট আলোর জাফরি। পুকুরের জলে শালুকপাতা খিলখিল হাসে।

নারকেলগুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে নূরি একটানে খুলে ফেলে লাল ডুরে শাড়িখানা। ছুঁড়ে দেয় দূরের আগাছায়। আঃ, কি আরাম। কতদিন পর আবার কচুরিপানার গন্ধ উঠছে শরীর থেকে। চাঁদের সঙ্গে নূরির শরীরের ছায়া কেঁপে কেঁপে ওঠে সোঁদা গন্ধওঠা জলের আয়নায়। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখে নূরি। একটু দূরে মুন্নু শেখের পাকা বাড়িখানা রাগী ভূতেব মত দাঁড়িয়ে। নূরি একটুও ভয় পায় না। খুশিতে ঝিরঝির বাবলা পাতা, সজনে ডাল। এখান থেকে সোজা গেলে তার বাপের ঘর। তা ছাড়িয়ে বাদার পর বাদা ভেঙে এগিয়ে গেলে জামালুদ্দিনের ভিটে। জামালও তাকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিল। আরও এগোলে মঈদুল মিঞাদেব গাঁ। ঘুরে ঘুরে সব দেখে নেয়। তারপর হঠাৎই চিৎকার কবে তালাক দিতে থাকে সকলকে। মুন্নু শেখ, মঈদুল এমনকি জামালউদ্দিনকেও নাম ধরে ধবে তালাক দেয়। সাক্ষী থাকে চাঁদ, তারা, আকাশ, জল, মাটি। ঠাণ্ডা নবম জলে ঝাঁপ দেওয়াব আগে থমকে দাঁড়ায়। বুক জুড়ে কটকটে যন্ত্রণা। স্তন ভেসে যায় দুধে। রাতবিরেতে খোকাটার বড় ক্ষিধে পায়। হয়ত এখন জেগে উঠেছে ! চ্যাঁ-চ্যাঁ করছে শালিখছানাব মত ! লাল কচি মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কষ !

দুধ-টসটস বুকের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে নূরি। চারদিক থেকে জল, আকাশ, চাঁদ, তারা, গাছ-গাছালি বাব বার ডাক দিয়ে ফেরে, —'আয় নূরি, পৃথিবী হয়ে যা।'

নিজেকে দুহাতে খামচাতে থাকে নূরি। আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। চুল ছেঁড়ে। তীব্র বোবা যন্ত্রণায় ছটফট করে মরে।

বুক বেয়ে গড়িয়ে আসা দুধ। জল, বাতাস, জ্যোৎস্না তখন সব মিলেমিশে একাকার।

ভাতের গল্প

চাবটের ট্রেন ধরবে বলে দ্রুত পা চালাচ্ছিল অছিরনবিবি। কদিন জ্বরে ভুগে আজই প্রথম কাজে বেরিয়েছে। নিজের হাত পা মাথা এখনও নিজের বশে নেই। সারাদিনের ক্লান্তি কামড়ে ধরছে শরীর। ঠিকমতো গাড়ি পেলে ঘরে পৌঁছতে এখনও ঘণ্টা দেড়েক। গাড়ি যদি লেট করল তো আলে নামার আগেই আঁধার নেমে যাবে। কার্তিকের শেষ। এমনিতেই বেলা এখন ফুরোয় তাড়াতাড়ি। বিকেল ফোটার আগেই রোদ গলতে শুরু করে। গলে গলে কখন যে মিশে যায় কাঁচা অন্ধকারের গায়ে।

প্ল্যাটফর্মে উঠে অছিরন দম নিয়ে নিল খানিক। ট্রেন আসতে দেরি আছে। ঘরমুখো মানুষের হা-ক্লান্ত নিশ্বাস আর গাদা গাদা ঝুড়িবস্তায় হাঁসফাঁস করছে গোটা চত্বর। এত মানুষও রোজ শহরে আসে। পেটের তাড়া খেয়ে আশপাশের গাঁ-গঞ্জ থেকে প্রতিদিন পালে পালে ছুটে আসছে মানুষ—মেয়ে-পুরুষ-শিশু-বুড়ো। সেই কোন সাতসকালে ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে পড়ে সব। তারপর হাঁস-মুরগির মতো কামরা বোঝাই হয়ে নাগরিক স্টেশনগুলোতে ছিটকে ছিটকে পড়া। যাদবপুর, ঢাকুরিয়া, বালিগঞ্জ, পার্কসার্কাস—শহরতলির ট্রেনগুলো অভাবি মানুষদের ভিড়ে সর্বসময় থইথই।

টুকুনখানিক ফাঁকা জায়গা খুঁজে অছিরন হাঁটু মুড়ে বসল। আধভেজা পুঁটলিখানা কোল থেকে নামিয়ে রাখল পাশে। কদিন ধরেই শরীরের মতিগতি মোটে ভাল ঠেকছিল না। বুধবার ঘরে ফেরার পর দামাল জ্বরটা এসে একেবারে আছড়ে ফেলল তাকে। প্রথম দুটো দিন হুঁশই ছিল না কোনও। দেহ জুড়ে নিদারুণ ব্যথা। মাথা ঘোরে চরকির মতো। কাজে যাবে কি, ঘর থেকে দালানে যাওয়ারও ক্ষমতাটুকু নেই। শাকিলার ঝিমার দয়ার প্রাণ, সেই পাঁচ-পাঁচটা দিন সামলে দিয়েছে অছিরনের চার-বাড়ির কাজ। বলেছে, ঠেকা তো আমি দিয়েই দিতেছি, তুই আর দুটো দিন গড়িয়ে নে না কেন।

অছিরনের মন চায় নি। নিজের খাটনি খেটে পরের কাজও সামাল দেওয়া চারটিখানি কথা? তার ওপর পাঁচ দিন ধরে মাকে শোওয়া দেখে মেয়েটারও সেই কী রাগ! ভাবতে গিয়ে অছিরনের ঠোঁটের ফাঁকে আপনা-আপনি হাসির ঝিলিক। মেয়ে খালি ঘোরেফেরে আর ধাক্কায় মাকে—ওমা, উটবি নি তুই? আজও কাজে যাবি নি?

প্রথম দু-দিন মায়ের অসুখ দেখে বেজায় ঘাবড়েছিল মেয়ে। মাকে ওভাবে চোখ উলটে পড়তে আগে তো দেখেনি কখনও। নিজেই দৌড়ে গিয়ে ঝিমা, খালাদের খবর দেয়। এঁটুলির মতো দু-দুটো দিন মায়ের গায়ে গায়ে সেঁটে থাকে। শেষে তিন দিনের দিন পড়শীদের মেয়ে-বউরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছে কাজে তখন ভেঙে পড়ে দুম করে।

রাতশেষে ঝিমঝিম ঘোরের ভেতর সবকিছুই টের পাচ্ছিল অছিরনবিবি। হানিফ, মকবুলদের ঘরে মোরগ ডাকল প্রথমে। তারপরে কাক। তারপর একসময় ঝাঁপের এপার থেকে মেয়ে-বউদের কলকলানিও শুনল সে। শুধু টের পায়নি মেয়েটাও কখন জেগে উঠেছে। অন্য দিন এ সময়ে ন্যাতার মতো পড়ে থাকে কাঁথায়। বন্ধ চোখে

গায়ের ওপর কচি হাতের ছোঁয়া পেয়েছিল অছিরন—ওট মা ওট। টেন বেইরে যাবে যে. কাজে যাবি নি?

অছিরনের দু-চোখ তখনও ভারী হয়ে আছে। চেষ্টা করেও অবশ চোখ খুলতে পারছিল না অছিরন।

মেয়ে আরও জোরে ঠেলা দিল তাকে—ওটনারে মা। খিদে নেগেচে যে।

অছিরন জড়ানো স্বরে বলল—কৌটোতে মুড়ি আছে। খেয়ে নে গে।

হাই মা. শুনে মেয়ের সে কী রাগ! বার বার ঠেলে মাকে. আর সরু গলায় কাঁদে—আজও তাইলে তুই কাজে যাবি নি? আজও ভাত খাওযা হবেনিকো?

শাকিলার সেই তীক্ষ্ণ কান্না নতুন করে ধাক্কা মারল অছিরনের বুকে। ঠোঁটের হাসি ঠোঁটেই মিলোল। শাকিলার বাপ যখন অছিরনকে তালাক দেয়. মেয়েটা তখন এত্তটুকুন। হাঁটতে সবে শিখেছে কি শেখে নি। তেলকালো-মুখে ফোলা ফোলা গাল। একমাথা গুঁড়ি গুঁড়ি চুল। কথায় কথায় হেসে ওঠে কলকল করে। অমন ফুলের মতো মেয়েটাকে ফেলেও কেমন চলে গেল মানুষটা! পুরুষমানুষের বুকের খাঁচায় মন বলে কিছু থাকে না. দেহ—সবটাই দেহ। নতুন বিবি অছিরন বাসী হতেই অন্য দেহ টানল লোকটাকে। মাকালতলার ডগডগে ছুঁড়িটার সঙ্গে গফুরের আশনাই হল। তাই নিযে সংসারে দিন ঝগড়া, দিন খিটিমিটি। শেষমেশ সেই ছুঁড়িটাকে নিয়েই ক্যানিংযে গিয়ে ঘর বাঁধল গফুর। চাষবাসের দিনমজুরি ছেড়ে লঞ্চের খালাসী হল। তা সেও তো প্রায় চার বছর আগের কথা। শোনা যায় এখন নাকি আর এক ছুঁড়ির বসে মজেছে। তা মজুক. অছিরনের আর মাথাব্যথা নেই কোনও। মাঝে মাঝে কেন যে শুধু বুকটা এমন হু-হু করে তাব! যুবতী-শরীর রাতবিরেতে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। কান্না ফুরোলে রাগ আসে। রাগ ফুরোলে ঘৃণা। গোটা পুরুষ জাতটাকেই এখন ঘৃণা করে অছিরন। শাকিলাকে বুকে চেপে নতুন করে বাঁচার ইচ্ছে খোঁজে। হাজার কান্না বিবাদ সালিসির পর মোড়ল-মুরব্বিদের রায় মতো গফুর ভিটেটুকু ছেড়ে দিয়ে গেছে অছিরনকে। ভিটে বলতে ভাঙা ফাটা টুকরো একচালা ঘর। একে যদি দেনমোহর বল তো দেনমোহর, ভিক্ষে বল তো ভিক্ষে। এক ফালি ওই ভিটে আর এক রত্তি ওই মেয়ে নিয়েই এখন দিন গুজরান অছিরনের। গাঁয়ের আরও অনেক মেয়েবউয়ের মতো কাকডাকা ভোরে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। মাইল দেড়েক রাস্তা ভাঙলে তবে ঘুটিযারি শরিফ স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে যাদবপুর। তারপর বাবুদের বাড়ির কাজ সেরে ঘরে ফিরতে সেই সন্ধে।

অছিরন কাজে বেরিয়ে গেলে শাকিলাও বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে। সারাটা দিন একা একা ঘাসফড়িংয়ের মতো এদিক সেদিক নেচে বেড়ায়। এর সঙ্গে ভাব করে তো ওর সঙ্গে খুনসুটি। নিজেই নিজেকে স্নান করায়, ঘুম পাড়ায়, খেতে দেয়। ঘরে যদি তেল থাকল তো টুক করে মাথায় ঢেলে নিল সবটুকু, না হলে রুক্ষ চুল উড়ছে সর্বসময়। পুকুরে ডুবটা দিয়েই উঠে পড়ে লাফ মেরে। গায়ে হাতে পায়ে ময়লা বসে। খুব যদি বকল মা তবে সেদিন গা ডোলবে। দুপুরে দু-গাল পান্তা গিলে কোনদিন বা দাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়ল, না হলে সারাটা দিন চরকিবাজি টইটই। ছেলে-ছাওয়ালদের

সঙ্গে বেলাভর হুটোপুটি। শেষে সূর্য যখন হেলে পড়ে বাঁধের গায়ে, রোদ ঝিমোতে শুরু করে, তখন সঙ্গী ছেড়ে শাকিলা একা হাঁটতে থাকে আলপথ ধরে। আধমাইলটাক হেঁটে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে শিরীষতলায়। জলকাদা তেমন না থাকলে বাঁধের পথ ধরে বড় একটা ফেরে না অছিরন। বাদা ধরে এলেই তাড়াতাড়ি হয়। দূর থেকে রোজই মেয়েকে দেখতে পায় সে। ছোট্ট শরীর নিথর দাঁড়িয়ে তার পথ চেয়ে। যত এগোয়, স্পষ্ট হয় কচি অবয়ব। কাছে পৌঁছলে শাকিলা দৌড়ে এসে জাপটে ধরে তাকে। হাতে ধরা তার পুঁটলিটার গায়ে জ্বলজ্বল চোখে হাত বোলায়—হাই মা, আজ শুদু ডাল এনেচিস? মাছ নেই? কোনদিন বা পুঁটলি ছুঁয়ে উল্লাসে লাফায়—ও বাবা, আজ আবার গোস্ত আছে নাকি গো।

বাবুদের বাড়ি থেকে যেদিন যেমন পায়, মেয়ের জন্য বেঁধে আনে অছিরন। দু-মুঠো ভাত, ডাল, রুটি, তরকারি। এক আধ টুকরো মাছ। কালেভদ্রে মাংস। নিজের ঘরের মোটা চালের ভাত পছন্দ নয় মেয়েব। বাবুদের হাঁড়ির ভাতে কী যে আলাদা স্বাদ পায় সে।

মেয়ের কথা ভাবতে গিয়ে আবাব পেট কাঁপিয়ে হাসি এল অছিরনের। আনমনে মুখে আঁচল চাপল সে। শুধু ভাত কেন, বাবুদের ঘরের বিষেও অরুচি নেই শাকিলার। একবার পেটের ব্যামো হতে কাজের বাড়ির বৌদি এক শিশি কালমেঘ দিয়েছিল অছিরনকে। মায়ের আঁচলে সবজেকালো শিশি দেখে মেয়ের সে কী নাচানাচি!

—ওমা, ওর মদ্যি কী আছে আমারে এট্টু দে না।

—ওষুদ আছে বাপধন। এ তুই খেতি পারবি না।

—খুব পারব, দে না তুই!

তা দিয়েছিল অছিরন। ছিপিতে করে এই একটুখানি। খেয়ে দেখুক। একবার গালে গেলে আব ফিরে চাইবে না। হায় আল্লা! পরদিন ফিরে দেখে তেতোর তেতো ওষুধ গিলে বসে আছে মেয়ে! শিশি প্রায় খালি। মাকে দেখে খালি শিশি হাতে মেয়ের সে কী নাচ—খেইয়ে নিছি! খেইয়ে নিছি!

অছিরন তো ভয়ে সারা। একেবারে অতটা ওষুধ খেয়ে নিল, না জানি কী হয়! ওমা, অতখানি কটকটে তেতো বিষ দিব্যি হজম করে নিল মেয়ে। সেই থেকে আর ওষুধ-বিষুধ ঘরে আনলে মেয়ের ধারেকাছে রাখে না অছিরন।

ভাবতে ভাবতে নিজের ভাবনায় নিজেই হেসে মরছে অছিরন। হেসেই চলেছে। খেয়ালও নেই চারটের গাড়ির সময় পেরিয়ে গেছে কখন। স্টেশনচত্বর উপচে পড়েছে মানুষে। শাকিলার ঝিমার ডাকে হঠাৎই হুঁশ ফিরেছে তার,—কিরে, খুব যে দেখি নিশ্চিন্দে বসে আছিস? গাড়ি বন্দ হয়ে গেছে সে খেয়াল আছে?

অছিরন ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল—কেন? কী হল গাড়ির?

—শ্যালদায় গণ্ডগোল। মারপিট লেগেচে বাবুদের। এখন সেখান থিকে কোনও ট্রেন ছাড়বেনি।

—কী করে জানলি?

—মরণ! কান কোথায় আছে তোর? ব্যামোয় পড়ে কানটাও খোওয়ালি নাকি?

—কেন ?

—ওই তো মাইকে আবার বলতিছে। শোন—কান পেতে শোন।

অসংখ্য মানুষের ক্ষোভে বিক্ষোভে চিৎকারে হাহাকারে একটা কথাও ভাল মতন বোঝা যায় না। অছিরন শুধু দেখল এলোপাথারি ছোটাছুটি শুরু করেছে মানুষজন। বৃথা উত্তেজনায় ছটফট করে মরছে।

নিবতে নিবতে দিনের আলোও নিবে গেল এক সময়। কার্তিকের বাতাস শিরশির বইতে শুরু করল।

অছিরনের হৃৎপিণ্ডটা কাটা মুরগির মতো লাফাচ্ছিল। বুকের কাছে ধরা পুঁটলি ভিজে উঠছে ক্রমশ। ভাতের রসে বুক ভিজে গেল। শাকিলা এতক্ষণে শিরীষতলায় এসে গেছে। কদিন ঠিকমতো ভাত জোটেনি মেয়েটার। অছিরনের ননদ-জা এক-আধবেলা ডেকে নিয়ে খাইয়েছিল মেয়েকে। তাতেও মেয়েব শুকনো মুখে হাসি ফোটে কই !

অছিরন ননদের হাত আঁকড়ে ধরল—কী হবে এখন ! শাকিলা যে বড় কানবে গো !

ননদের কপালেও দানা দানা ঘাম জমেছে,—অনেকে বাসের জন্য হেঁটে যেতিছে। গড়ে থেকে কেনিং-এর বাস ধরবে।

—আমরাও যাই চল।

—এখান থিকে বাসে গড়ে। গড়ে থিকে ফের বাস! অত পয়সা আছে কাছে ?

—সে নয় কাজের বাড়িব থিকে চেয়ে আনি।

—তারপর ? এই শরীলে বাসে অতটা পথ যেতি পারবি ?

—খুব পারব। অছিরন ঢোক গিলছে। দুপুরে এক কাজের বাড়িতে খানদুই আটার রুটি খেয়েছিল। টক ঢেকুর চলকে উঠছে গলায—শাকিলা একা দেঁইড়ে থাকবে গো দিদি, ঘরে যাবে না।

অছিরনের ননদের কপালে ভাঁজ—তুই কি ভাবিস বাসে গেলি পর এখুনি পৌঁছুবি ? সব পথই দূর পথ !

ঠিক, ঠিকই। সব পথই দূর পথ। অছিরন কেঁপে উঠল। আবার জ্বর আসছে তাব।

জ্বর থেকে তুলে আনা শরীব আবার জ্বরের হাতেই ছেড়ে দিল অছিরন।

প্রকাণ্ড শিরীষগাছের চতুর্দিকে বাদার পর বাদা জুড়ে শুধু ধানগাছ আর ধানগাছ—মহাজনের জমি, বড়লোকের জমি, গরিবের জমি, ভাগের জমি, ভাগচাষের জমি।

হেমন্তের সোনালি ফসল পেকে উঠেছে। শাকিলার মাথা পেরিয়ে পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে ধানগাছ, তাদের টপকে শাকিলা দূরের কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। শিরীষতলার উঁচু ঢিবিটায় উঠে দাঁড়াল, তাও দৃষ্টি পথ পায় না। অন্যদিন এ সময়ে ট্রেনের ভোঁ কানে আসে। মাঝেমাঝেই। এই বুঝি ক্যানিং লোকাল ঘুটিয়ারি ছাড়ল। এই বুঝি শেয়ালদার গাড়ি এসে পৌঁছল স্টেশানে। নাহ, আজ কোনও সাড়াশব্দ নেই তাদের।

ধানগাছের সরসর ছাড়া আর কোনও আওয়াজ কানে বাজছে না। এত নিঝুম চারদিক! এত উদাসীন!

শাকিলার পেটের ভেতর এক অশান্ত ক্ষিধে ঝমঝম করে বেজে উঠল। কনকনে বাতাস কুঁকড়ে দিল কচি শরীর। শীত তাড়াতে ছোট্ট বালিকা হাতে হাত ঘষল বার বার। তাপ চাইছে। যত উত্তাপ চায়, দিন তত শীতল হয়ে আসে। পৃথিবীর দখল নিল আঁধাব। আঁধাবের গায়ে আকাশ কুয়াশার চাদর বিছিয়ে দিল। ধানখেতে কুয়াশা নামল।

শাকিলা আল বেয়ে এগোনোর চেষ্টা করল এবাব। একটু গেলে একফালি পোড়ো জমি আছে। মেয়েটা সেখানে পৌঁছতে চাইছে। যত এগোতে চায় ধানেব জঙ্গল ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়ে। পাকা ধানেব শিষ খামচে দেয় মুখ গা হাত পা। খামচায়, কামড়ায়, আঁচড়ায়। পাকা ধান নয়, যেন একদল গর্ভিণী রাক্ষসী মানবশিশুকে নিয়ে হিংস্র খেলায় মেতেছে। দেখতে দেখতে ক্ষত-বিক্ষত শাকিলাব শরীর। সমস্ত শক্তি দিয়ে শাকিলা সবাতে থাকে নির্দয় ধানগাছগুলোকে। সরাতেই থাকে শুধু। তারপর একসময় অন্ধকার যখন পুরোপুরি জাপটে ধরে তাকে, আলপথেই গুটিসুটি মেরে বসে পড়ে সে। পাকা ধানের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ উপোসী পেটটাকে অস্থির কবে দেয়। হড়হড় করে বমি করে ফেলে শাকিলা। সে বমিতে ভিজে একাকার দুধেভরা অনন্ত ধানবন।

তাব মা-ব আজ শহর থেকে ফেরা হবে না।

তার মা তাব জন্য ভাত আনতে গেছে শহর থেকে।

পদ্মবুড়ির রোজনামচা

গাজনপুরেব পদ্মবুড়ি এবার যেন কিভাবে জেনে ফেলেছিল আকাশমাটির গোপন খবর। জেনেছিল নাকি সে এই ধরিত্রীটারই গন্ধ পাচ্ছে আজকাল! কে জানে? কে আর তেমন খোঁজ রাখে তার। একা বুড়ি একলা মনেই থাকে দিনভোর। কবেকার সেই আদ্যিকালেব শবীব। বয়সের কোন মাপজোকই নেই তার। সত্তর. আশি, নব্বই কি একশ'ও হতে পারে। কিংবা তারও বেশি। গাজনপুর আসাব পথে বুড়ো মাঠের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে যে প্রাচীন বটগাছটা, বুড়ি বুঝি তাবও আগেব কালের। চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হতে হতে ক্ষীণতর, দাঁড়া গেছে. কোমর অবশ, কান দুখানাও বুজে এসেছে প্রায়. আছে শুধু এক দ্রবতী কণ্ঠ। তাই কাঁপিয়ে দিনরাত বিনবিন করে চলেছে পদ্মবুড়ি। তিন মাথা এক কবে কখনও বা বসে আছে মাটির দাওযায, কখনও বা ডেলামতন শরীরখানা আঙিনার কোলে. রাঙচিতার বেড়াব ধারে সারা সকালটা বসে বসে মানুষের ছায়া খোঁজে বুড়ি, 'কে যাস রে? হরির ব্যাটা নিকি? হ্যাঁরে. কী ধান এবার রুইলি বাপ? রূপশাল?'

কখনও ডাকে, 'বেন্দাবনের বউ নিকি লো? তোর মেয়ে যেন ছেলে বিয়োতে কবে আসছে এখেনে?'

একজন সাড়া কবে তো দশজন পাশ কাটিয়ে যায। সাতকেলে বয়রা বুড়ির সঙ্গে অহেতুক বকে মরাব সময় কোথায় মানুষেব? বুড়ি শেষে একা একাই প্রলাপ বকতে শুরু করে দোরগোড়াব কাঁঠাল গাছটাব সঙ্গে। গরু-ছাগল সামনে এলে ফিকফিক হেসে গল্প জমায়, 'বলি ও ছাগলি. কার ক্ষেতে অমন ডগডগে পালং পেলি বে অ্যাঁ! চিবো, ভাল করে চিবো।'

বকম বকম আব বকম বকম। বসে বসে শুধুই কথার চবকা কেটে চলা। তারপব কথায কথায় বেলা বাড়লে বাবলা ডালেব লাঠিখানায ভর দিয়ে বুড়ি কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়ায়। ঠুকুব ঠুকুর নাতবৌদের উঠোনে গিয়ে গন্ধ খোঁজে। গরম ভাতের গন্ধ। লোভী কাকের মত উঁকি দেয় ঘরের ভেতর। তোষামোদের গলায় বড নাতবৌকে ডাকে —'ও রাঙাবৌ. কাশিটা তোর এট্টু নরম হল?' কোনদিন গলায় নির্ভেজাল উৎকণ্ঠা. 'তোব কচিটার জ্বর নাকি আর নামে না? ও রাঙাবৌ. ওষুধপালা করেচিস কিচু?'

সোহাগবালা ভেতর থেকে ঝনঝনিয়ে ওঠে, 'তার খোঁজে তোর কি দরকার? ফের বুঝি এ ঘরে বিষনজর ঢালতে এসেছিস?'

পদ্মবুড়ি ঝামটাটুকু বোঝে, কথাকটা শুনতে পায় না। দু-হাতে লাঠি চেপে পেঁপেতলায় উবু হয়ে বসে। ঘোলা চোখে পিটপিট তাকায়, 'রেগে যাস কেন? ছেলেপুলের ব্যারামে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। এইবেলা তুলসীপাতা কখান ছেঁচে, আদা দিয়ে খাইয়ে দে দিকিনি।'

'তুলসী গঙ্গাজল তোর মুখে পড়ুক। ডাইনী রাক্ষুসী বুড়ি, খবরদাব যদি কুছায়া ফেলিস আর...দুনিয়াসুদ্দু মানুষ খেয়েও আশ মেটেনি না? মরণখাকি, যমের অরুচি...'

সোহাগবালার চিৎকার শব্দ হয়ে টুকরো টুকরো কানে ঢোকে যেন। পদ্মবুড়ি বোঝে আজ এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। রাঙাবৌ-এর মেজাজ আজ তাতল আঁচ। তবু বসে থাকে কিছুক্ষণ। গত সনের আগের সনে বড় নাতিটা হঠাৎ একদিন ধড়ফড়িয়ে মরে গেল। সেই থেকে রাঙাবৌ এমন পাগলপারা। পদ্মবুড়িই নাকি গিলে নিয়েছে বড় নাতিকে। তা বলুক যা মন বলে, পদ্ম তাকে মাপ করে দেয়। কচি বয়সের বিধবার রাগ গায়ে মাখতে নেই। শাপ দিক, গাল পাড়ুক, মাঝেসাঝে তবু দুটো ভাতপান্তা তাকে দেয়ও বটে রাঙাবৌ। ভাবতে গিয়ে সোহাগবালার দুঃখে হৃদয় কাঁদে। শক্তিমানটা তারও কি কম আদরের ছিল? ছেলের ঘরের প্রথম নাতি বলে কথা! যেমন তার নাম, তেমনি রূপেব জৌলুস। এই সাজোয়ান চেহারা, এতখানি বুকের পাটা। ঠাকমা বলে সামনে এসে দাঁড়ালে আরেকটা কার শরীর যেন মনে পড়ে যেত। কাকে যে মনে পড়ত—ছেলে, না ছেলের বাপ? পুরোনো মুখগুলো ঠিক ঠিক আর মনে পড়ে না এখন। পদ্মবুড়ি ময়লা ছেঁড়া কানিমতন আঁচলখানা তুলে চোখেব পিঁচুটি আর কষ মোছে। সোহাগবালা দাপদুপ ঘরে ঢুকে যায়। আরও খানিক বসে থেকে পদ্মবুড়ি ওঠে। এবার সেজ'র দোবে যাওয়ার পালা।

—'ও সত্য, সত্য ঘরে আচিস নিকি?'

বারকয়েক ডাকার পর হেঁসেলঘর থেকে সত্যবানের ডাগর মেয়ে সুন্দরী ভারী তাচ্ছিল্যে জবাব দেয়—'বাবা ঘরে নেই। বাঁধের কাজে গেছে। কেন, তার সঙ্গে কি দবকার?'

বুড়ি শুনতে পায় না। ফের গলা কাঁপায়, 'ও বৌমা, ও সত্য, গেলি কোথায় সব?'

ভুরে আঁচলে হলুদহাত মুছতে মুছতে বেরিযে আসে সুন্দরী, 'হলটা কি? অত চিল্লাও কেন?'

—'তোর মা-বাপ ঘবে নেই?'

—'কেন? কি চাই তোমার?'

উঠোনটাতে পা দিয়েই গন্ধ পেয়ে গেছে পদ্মবুড়ি। কান যাক, চোখ যাক, নাকটা এখনও ভালই আছে। বরং দিন দিন সরেস হচ্ছে আরও। সেই নাকে ঠিকই ঝাঁপ কেটেছে সত্যবানের ঘরে সেদ্ধচাল ফোটার গন্ধ। মরে যাই, কী মধুর ঘ্রাণ! মুখের লালা টপাটপ গিলে নেয় পদ্মবুড়ি। চাইবে কি চাইবে না ভাবতে সময় নেয় দু দণ্ড। না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবু বলে ফেলে, 'তোদের ঘরে বুঝি এত বেলায় ভাত নামল?'

সুন্দরী মাচা থেকে কুমড়োফুল ছিঁড়ছে। পদ্মবুড়ির ফোকলা গালে হাসি ছড়ায় —'ফুল ছিঁড়িস কেন? ভাজবি বুঝি?'

—'ভাজি না ভাজি তোমার কি?'

—'এক মুঠ ভাতের সঙ্গে দুটো গরম ভাজা যদি দিস...'

—'এহ, বড় নোলা যে!' সুন্দরী অবিকল তার মায়ের গলায় কথা বলে, 'কেন, তোমার পিরীতের ছোট নাতি খেতে দেয়নি?'

—'দিছিল।' হাতের কাঠি কাঠি পাঁচটা আঙুল জড়ো করে দেখায় পদ্ম, 'পান্তা। এই এতটুকুন। তাতে মোটে পেট ভরেনি রে মা...'

—'ভরবে কি করে? পেট তো তোমার পেট নয়—জালা।' সুন্দরী দাওয়ায় ঝোলানো দড়ির দোলনা থেকে কাঁথাসুদ্ধ ছোট ভাইটাকে কোলে তুলে নেয়। ঘুরিয়ে শোওয়ায়। তারপর পদ্মবুড়ির পাশ দিয়ে বেড়ার ধারে এসে গলা চড়ায়, 'ও নুড়ো, ও হেরো, সাবিত্তির বে—ভাত খাবি আয়।'

পদ্মবুড়ির ছানিচোখে ভাতের লোভ ক্রমশ হলুদবরণ ধারণ করতে থাকে, 'ভাইবোনদেব খেতে ডাকিস বুঝি? আহা, বাছাদের খাওয়া হয়নি এখনও? তবে আমি এট্টু বসি...'

—'না না, যাও তো এখন। ভাগো এখান থেকে। মা গেছে শেতলামন্দিরে পুজো দিতে—এসে পড়ল বলে। সেদিনের মত আবার এমন ঝাঁটার তাড়া দেবে...'

সুন্দরী এত কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলে যে শুনতে কষ্ট হয় না পদ্মবুড়ির। কষ্ট আসে অন্যত্র। দলা বেঁধে। গলার কাছে। তাড়া খাওয়া ল্যাংচা কুকুরের মত বাইবে ছিটকে আসে। বিড়বিড় করে কি যেন বকে খানিক। তারপর কাশবন মুণ্ডুখানা প্রায় মাটিতে ঝুলিয়ে বেড়ার গা বেয়ে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে পেছনদিকের পুকুরধারে চলে আসে। শ্যাওলা আর কচুবিপানায় পুকুরটার জল বারো মাসই গাঢ় সবুজ। আশপাশে তেলাকুচো, বাসকপাতার জঙ্গল। সুশুনি, হেলেঞ্চা, কাঁটানটেও হামা টেনেছে কোথাও। পুকুর পেরিয়ে পদ্মবুড়ি আরও কিছুদূরের শিরীষ গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায়। এখান থেকে বহু দূর অবধি দেখা যায় উদাস ধানভূমি। বুক থেকে অভিমান ঠোঁটে এসে রাগ হয়ে যায়। ঝুলন্ত চামড়া কাঁপিয়ে শিরা উপশিরারা দপদপ করে। রাগ যত বাড়ে, পেটেব ভেতর নাড়িভুঁড়িগুলো তত লাফালাফি করে। ছোট নাতিটা আজকাল বড়ই কম খোরাকি দেয়। নিষ্ফল রাগে বুনো ঘাসে লাঠি আছড়ায় বুড়ি। শাপমনিা করে ধানভূমিকে, 'মর মর, মরে যা সব—শুকিয়ে মর!' বাতাসে থুতু ছিটিয়ে ধুলোর সঙ্গে ঝগড়া করে। শেষে কোমর যখন টাটিয়ে আসে, শিরদাঁড়ায় যন্ত্রণা নামে, তখন ধুলোমাটিতে থেবড়ে বসে। ভরদুপুরে খুনখুন সুর তুলে কেঁদে যায়, 'আমারে কেউ দু গাল ভাত দেয় না গো। ওগো আমারে কেউ ভাত দেয় না...'

এরকমই চলে প্রায়দিন। এরকমই খোলা রোদে রোজ কেঁদে চলে পদ্মবুড়ি। কেঁদে কেঁদে নালিশ জানায় ধরিত্রীকে। কোনদিন কোন দয়ালু পড়শী ডেকে দুমুঠো খেতে দেয়ও বা। নরম মনের নাতিপুতিও কেউ ঘরে দিয়ে আসে। নইলে বুড়ি ওমনি পড়ে থাকে আকাশের তলায়। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঝিমিয়ে পড়ে। কালোকুলো পোঁটলামতন দেহটাকে তখন দেখায় ঠিক মাটির ঢিবির মত। তবে বুঝি এভাবেই মাটি হতে হতে একদিন মাটির ঘ্রাণ পেয়ে যায় পদ্মবুড়ি। আকাশের মতলব জেনে যায়। বাতাসের মতিগতি আগাম বুঝে ফেলে।

সুখের মুখে কিসের গন্ধ!

এবার ভাদ্র মাস যেতে না যেতে কেমন যেন এলোমেলো কান্না ধরেছিল পদ্মবুড়ি। সময় অসময় নেই, যাকে পায় ডেকে মনের শঙ্কা জানাতে চায়। ছোট নাতিকে রোজ বলে, 'ও রূপো, কাল রাতে আকাশটাকে দেকেছিলি? কেমন যেন রঙঢঙ করছিল না?'

রূপবানের হয়ত তখন খুব তাড়া। চটপট কাজে বেরোতে হবে। রেল স্টেশনের বড় মিষ্টিদোকানের হেডকর্মচারী সে। কাঁধে হাজার দায়দায়িত্ব। নেহাৎ চাষের সময়টুকু ছাড়া গাঁয়ে থাকার ফুরসত নেই বড়। ভোর না হতে বেরিয়ে পড়ে। ফেরে সন্ধের মুখে, ডুমুরমণির সঙ্গে। একঝলক প্রেমালাপ সারার পর। সকালবেলা বাসি পান্তা বেড়ে রেখে যায় ঠাকমাবুড়ির জন্য। বহুকাল ধরে এ এক বাঁধাধবা ব্যবস্থা। যেদিন থেকে জমি-ভিটে পৃথক করেছে তিন ভাই, সেইদিন থেকেই।

হাওয়াই শার্ট গায়ে গলিয়ে রূপবান ঠাকুমাকে ধমকায়. 'কদিন ধরে কী এক কথা ঘ্যান ঘ্যান করে চলেছ বলো তো! চুপ থাকো একটু।'

—'চুপ কি করে থাকি বাপ? মনে যে বড় ধন্দ...'

—'হয়েছেটা কি?'

—'আকাশ এত গুমসুম কেন লাগে রে ভাই? বাতাস যেন টেরা দিকে বয়...'

—'কচু বয়।' রূপবান ভাবে বুড়ির মাথাটা তবে পুরোপুরি যেতে বসেছে। একেই বলে ভীমরতির শেষ দশা। দিব্যি হালকা বাতাস বইছে চারদিকে। আকাশ জুড়ে সাঁতার কাটছে পালক পালক মেঘ। এবপরই তো রঙ আসবে ধানেব বুকে। রূপবান হিসেব করে দেখেছে এবার তার ফসল মন্দ উঠবে না। ঠাকুমা যতদিন তাব কাছে, জমির দু'দুটো ভাগ তারই। বাকি দু' ভাগ বড মেজর। তবে কিনা পরের সনে বুড়িকে আর রাখা যায় কিনা ঠিক নেই। ডুমুর সাফ সাফ বলে দিয়েছে, 'কোন বুড়ি-ঝুড়ি নিয়ে আমি ঘর করতে পারবনি বলে দিলুম।' আরে বাবা. আখেরে যে ক্ষতিটা তোরই সে কে বোঝে। পদ্মবুড়ির পরমায়ু সহজে ফুরোবার নয়। তো ডুমুর কোন কথাই শুনতে চায না। কাঁচা বয়সেব মেয়েরা এরকমই অবুঝ হয়। রূপবানও বেশি ঘাঁটায় না। দরকার কি বাবা, ডুমুরকে পাওয়ার জন্য সে এখন সব ছাড়তে রাজি। এমনকি জমির একটা গোটা ভাগও। ঠাকুমার ভাগের ধান বেচে আগেই রুলি গড়িয়ে ফেলতে হবে একজোড়া, আর পায়ের মল. নাকের নথ। অঘ্রাণেই বিয়েটা সেরে ফেলবে। কতদিন আর নিজের ভাত নিজে ফোটানো যায়! ভাবতে ভাবতে ডুমুরের ধ্যানে ভারী বিভোর হয়ে যায় রূপবান। সেই ফাঁকে পদ্মবুড়ি কখন বেরিয়ে যায় বাইরে। মেজ নাতির ভিটের মুখে দাঁড়িয়ে ডাকে. 'ও সত্য, সত্য রে, জেগেচিস নিকি? একবার বাইরে আয় তো। বাতাস শুঁকে দ্যাক দিকি, কেমন সোঁদা সোঁদা বাস পাস না?'

সতাব বউ পারুল চা ছাঁকতে ছাঁকতে মুখে আঁচল চাপে, 'ওই আবার দিন না ফুটতে ভুল বকা শুরু হল বুড়ির। তা যাও না গো মেজ নাতি, এত করে বলে যখন একবার নয় বাতাস শুঁকে এস।'

সত্যবান সুখটান দেয় বিড়িতে. 'এবার মনে হয় বুড়ি মরবে।'

—'সে গুড়ে বালি। আরও হাজার বছর বাঁচবে ওই বুড়ি। তোমার চতুর ছোট ভাই ঠিক কল করে বাঁচিয়ে রাখবে তাকে।'

সোহাগবালার বড় ছেলেও একই কথা বলে মাকে, 'ও বুড়ির মরণ নেই রে মা, তুই যা ভাবিস...'

সোহাগবালা ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলে। দাওয়া থেকেই দেখা যায় পদ্মবুড়িকে। লাঠি হাতে টলমল এগিয়ে চলেছে। দিনভোর এখন ঘুরবে পড়শীদের দোরে। পথ আটকাবে মানুষজনের, 'ও আমাব চাঁদ. আকাশটাকে ভাল করে দ্যাক না রে ভাই...'

বাঁধনভাঙা ঝড় এল

ঝড়টা উঠেছিল ঠিক বিকেলের মুখে। আশ্বিনের ধান তখন দিব্যি নওজোয়ান। যেদিকে তাকাও উপচে পডছে ভরাট পৃথিবী। ঘরে ফেরার মুখে গুনগুন গান ধরেছিল রূপবান। কদিন ধরে আকাশ যেন একটু থমকে আছে। তা থাক. অকালের মেঘে কত আর জল থাকে! বুড়ো মাঠ ভেঙে কাঁচা রাস্তায় উঠেছে কি ওঠেনি. একটা দমকা বাতাস এল উত্তরদিক থেকে। আকাশপারের নিরীহমুখ মেঘগুলো চমকে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। রূপবান ঢোলকলমির ঝোপেব পাশে দাঁড়িয়ে গেল। ব্যাপারটা কি বোঝাব আগেই আরেকপ্রস্থ বাতাস দৌড়ে এসেছে। ঝামর ঝামর নেচে উঠল ধুলোবালি। উত্তরকে রুখতে দ্যাখ না দ্যাখ তেজী হাওয়া ছেড়ে দিয়েছে দখিন। বাতাসে বাতাসে যুদ্ধ বেধে গেল। অট্টহাসিতে ফাটছে বাতাস, গাছগাছালির ঝুঁটি চেপে উন্মাদ নাচ নাচছে। রূপবান তাড়াতাড়ি পা চালাতে চাইল। হঠাৎ কী আজব ঝড় উঠল রে বাবা! ঝড় নয় যেন লক্ষ লক্ষ ঘোড়সৈন্য দাপাদাপি শুরু করেছে। তুফানী ঝাপটায় গোটা একটা নারকেল গাছ শুয়ে পড়ল ভুঁয়ে। আকাশও সেই তালে ক্রমে খেপছে। পাগলা ষাঁড়ের মত বারকয়েক হুঙ্কার ছাড়ল। মেঘ ঝলসে ফুঁসে উঠল বিদ্যুৎ। রূপবান ছুটতে শুরু করল। ছুট ছুট। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে ঝড়। আছড়ে কামড়ে ফেলে দিতে চাইছে মাটিতে। ধুলোবালির ঝাপটে চোখ কানা হবার জোগাড়। ঘরে পৌঁছনোর আগেই গলগলিয়ে বৃষ্টি নেমে গেল। দশদিক আঁধারে আঁধার। কাদের যেন ছাড়া ছাগল প্রাণভয়ে কাঁদছে। পাশ দিয়ে ফকির মণ্ডল দৌড়ে গেল. 'পালা রে রূপো. আকাশ মাতাল হয়ে গেছে।' মাতাল বলে মাতাল! অমন ভয়ানক মাতাল বাপের জন্মে দেখেনি কেউ। গোটা রাত অন্ধকারের ঘাড়ে চেপে ঝড়বৃষ্টির সে কী তাণ্ডব খেলা! গাছ ভাঙছে, চাল উড়ছে, কান ফাটিয়ে ধুম ধুম ডাক ছাড়ছে বৃষ্টি। শেষে ভোর এলে পরে একটু যেন শান্ত হল পৃথিবী। আর তখনই মূল দুঃসংবাদটা এসে পৌছল গাজনপুরে। সারা রাতের বর্গী ঝড়ে ভেঙে গেছে দক্ষিণের অনেকগুলো সরকারী ভেড়ির বাঁধ। কতগুলো ভেঙেছে হে? পাঁচ? দশ? কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারে না। সর্বনাশের আতঙ্কে কাঁপছে মানুষ। গ্রামের পর গ্রাম ডুবিয়ে ছুটে আসছে মুক্ত জলের স্রোত। আসছে গাজনপুরের দিকেই। গভীর রাতে কখন গাজনপুরের ঝড় গিয়ে হামা দিয়েছিল ভেড়িগুলোর বাঁধে। ঘাড় ধরে টেনে তুলেছিল বন্দী জলরাশিকে। তারপর ধাক্কা মেরে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে গাজনপুরের দিকেই। যে পথ দিয়ে সে আসে, থাবা মেরে

ভেঙে দেয় ঘরবাড়ি, ডুবিয়ে দেয় সদ্যযুবতী ধানগাছ, ভাসিয়ে নিয়ে চলে গরু ছাগল ভেড়া কিংবা অসাবধানী কোন মানুষজন। মাকালতলা ডুবে গেছে, নবীন পুকুর ডুবুডুবু, গাজনপুর ভাসালো বলে। দিশেহারা মানুষগুলো এলোপাথাড়ি আশ্রয় খুঁজছে। মেয়েবউদের কান্না আর শিশুদের ভয়ার্ত চিৎকারে জল আসার আগেই বানভাসি হল গাজনপুরের মানুষ।

ধানের বদলে মাছ, টাকডুমাডুম ডুম

সাতদিন পর, রাস্তার জল কোমর ছেড়ে যখন হাঁটুতে, রেললাইনের উঁচু পাড় থেকে একে একে ঘরে ফিরল সকলে। সত্যবানের ঘর মুখথুবড়ে পড়েছিল ঝড়ের রাতেই। কিছু বাসনকোসন, বিছানা কাপড় আর গোপন কটা টাকা নিয়ে সে সদলবলে চলে গিয়েছিল রেললাইনে। সোহাগবালারা উঠেছিল বামুনবাড়ির পাকা দালানে। ঠাকুমাকেও সেখানে তুলে দিয়ে এসেছিল রূপবান। ঝড়ের রাতেই একদিকের চাল উড়ে হা-হা করছে তার ঘর। তাই দেখে মড়াকান্না আর থামে না পদ্মবুড়ির, 'ওরে, আমি এখন কোন ঠাঁয়ে ঘুমুবো রে! আমার ঘর নাই রে...কোথায় বসে তবে পান্তা খাই...'

তো বুড়ির কান্না তখন আর কে শোনে। জল নামার পর গাজনপুরের মানুষ তখন বেজায় ব্যস্ত। সরকারী ফিশারির বাঁধভাঙা জল নতুন আশার হাত বোলাতে শুরু করেছে যে। ধানের জন্য কাঁদার সময় পেল না মানুষ। ঘরের দিকেও ফিরে তাকানোর সময় নেই। সময় কোথায় গরু-ছাগলই বা খোঁজার। রূপোলি রাজকন্যার মত ঝাঁক ঝাঁক মাছ চিকমিক নেচে বেড়াচ্ছে সর্বনাশা বেনোজলে। যেদিকে তাকাও শুধু মাছ আর মাছ। পথের ওপর যেখান সেখান বড় বড় তক্তা চৌকি পেতে জাল ফেলতে বসে গেছে গাজনপুরবাসী। এক এক জালে উঠে আসে ইয়া ইয়া রুই, কাতলা, তেলাপিয়া, পাবদা।

—'আরও আসত গো। শালা নবীনপুকুর সব আগে ধরে নিচ্ছে...'

মাকালতলা বলল, 'তিনবিবিতে জল আগে ঢুকেছিল। ওরাই শালা বেশির ভাগটা নিল...'

রূপবান, সত্যবান, এমনকি সোহাগবালার কিশোর ছেলেটাও জলে ছুটেছে মাছ শিকারে। বামুনবাড়ির উঠোনেও জলকন্যের দল তিরতির সাঁতার কাটছে। কচিকাচারা জলপোকার মত গোটা দিন ঘুরতে লাগল জলে। মাটিকাদা মাখামাখি হারানের ছেলে ডুব দিয়েই লাফিয়ে উঠল, 'এই দ্যাখ, আরেকটা ধরলাম!'

দেখাদেখি সোহাগবালার রোগা ছেলেটাও হাত নাচাল, 'আমিও পেয়েছি। সিলভার কাপ।'

পদ্মবুড়ি স্যাঁতানো দালান থেকে শিশুর মত হেসে উঠল, 'আমায় দে। আমায় দে এট্টা।'

সোহাগবালার ছোট ছেলে এইটুকুনি এক পুঁটিমাছ দিয়েছে বুড়ির হাতে। তাই পেয়ে বুড়ি আহ্লাদে ডগমগ,

'ধান পচেছে, ঘর ভেঙেছে, এখন উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর করো,
পুকুর চষেছি।'

কার পুকুর কে এসে কখন ভরে দিয়ে যায়। জল সরার পর গাজনপুরের সব পুকুর মাছে মাছে থৈ থৈ। ধানের বদলে মাছ এসেছে ঘরে। মাছ সামলাতে গাজনপুরের মানুষ ছুটেছে যে-যার পুকুর বাঁধতে। পুকুর বাঁধো হে, আগে নিজের পুকুর বাঁধো। পাঁচজনের মত পদ্মবুড়ির নাতিগুলোও হাত লাগাল পেছনবাগের পুকুরটাকে বেঁধে ফেলতে।

কার মাছ কে খায়

চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে চুপড়ি জালটা খপাত জল থেকে তুলল পারুল। এবাব কয়েকটা সরপুঁটি আব মৌরলা উঠেছে। আগের খেপে উঠেছিল গোটাকয়েক চারা পোনা। মোট আজ মন্দ উঠল না। খুশি খুশি মনে সজনেতলায় পাহারারত মেয়েকে ইশারায় ডাকল, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস নি। এগুলোকেও তাড়াতাড়ি গামছায় বেঁধে ফ্যাল। হেঁসেল নয়, একেবারে ঘরে তুলে রাখবি।'

বাস রে বাস, পাঁচটা মাত্র জালে কত্তগুলো মাছ উঠেছে! সুন্দরীর চোখ ঝিকমিকিয়ে উঠল।

'তবু হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে! চটপট নিয়ে যা। আমি একটা ডুব দিয়ে আসছি।'

—'সব মাছ বেচে দিবি মা?'

—'দুটো দোব অখন তোদেব।' পারুল জলের ভেতর জালসুদ্ধহাত ডুবিয়ে রাখল। আরেকবার মাঝপুকুরে গেলে হয়। আরও কিছু ওঠে। বিকেলবেলা স্টেশনে বেচে এলে কটা টাকা হাতে আসবে। বড়ই অভাবে দিন কাটছে এখন। রোজকার রোজ জনমজুর খেটে ঘরে চাল আনে সত্যবান। কোনদিন দুকিলো, কোনদিন চারকিলো। তারপর হয়ত তিনদিন বসেই রইল। কাজ নেই। থাকবে কোথথেকে? পাঁচ গাঁয়ের মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরছে কাজের জন্য। একদিন জুটল তো দুদিন বেকার। নিরুপায় হয়ে তবেই না পারুল মাছ চুরিতে নেমেছে। তা এ চুবি বোধহয় পুরোপুরি চুরি নয়। মাছ যদি হয় পুকুরের, তবে সে পুকুরে এখন পারুলদের ভাগ পাক্কা পাঁচ আনা। তাও এই ভাগাভাগিতে রূপবান কি সহজে রাজি হয়। তার দাবী জমির মত পুকুরেরও হিসেব হক। ঠাকুমার চার আনা, তার চার আনা, পুরো আটআনাই তাকে দিতে হবে।

সত্যবান বললে, 'তা কি করে হয়? পুকুর ভাগের কথা আগে কোনদিন ওঠেনি —মজা পুকুর নিজের মনেই মজেছিল, তুইও কোনদিন দাবী তুলিসনি।'

—'এখন তুলছি। ন্যায্য ভাগ হক সব কিছুর।'

শেষে কয়েক দফা মিটিং, ঝগড়া বিবাদের পর গাঁয়ের মাথাদের কথামত রূপবান ছ আনায় রাজি হয়েছে। হুঃ, তাও যদি বুঝতাম বুড়িটাকে ঠিকমত দেখিস। আপন মনে গজগজ করতে করতে জল থেকে উঠল পারুল। ছপাৎ ছপাৎ জল ছড়িয়ে ঘরে ফিরছে। ঝোপ পেরোবার সময় দুটো হিংচে শাকও ছিঁড়ে নিল। কি ভাবে কচু

ঘেঁচু খাইয়ে অতগুলো পেটকে ঠাণ্ডা রাখতে হয় ভগবানই জানে। তারপর কাঁধের কাছে লকলক করছে ভরাবয়সের মেয়ে। মেয়ের বাপ বলে, 'ভাবো কেন? মাছ যা এসেছে, ঠিকমত বাড়লে পরে, চোত বোশেখে থোক টাকা ঘরে আসবে। কম করে দু-হাজার টাকার মাছ যদি ওঠে তো আমাদের থাকে ছ-সাতশ। তাই দিয়ে এই বোশেখেই সোঁদরীর বর এনে দেব।'

'আর ভিটে বাঁধার কি হবে? ঠেকনা দিয়ে শীতটুকুন নয় পার হল, বর্ষা এলে কচিকাচা নিয়ে দাঁড়াব কোথায়?'

ভাঙা বেড়ার সামনে এসে আবার একটা বড়সড় শ্বাস ছাড়ল পারুল। কত কষ্টে না মাথাটুকু ঢাকার ব্যবস্থা করা গেছে। মহাজনের কাছে ধার হয়েছে মেলা। কোন দিক রেখে এখন কোন দিক দেখা যায়! ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকে কাপড় বদলালো। তিনটে মাত্র শাড়ি মায়ে-ঝিয়ে পালা করে পরতে হয়। তাও সব শতেক ফাটা।

সুন্দরী ঘরের আবছায়াতে বসে মাছ গুনছে। সিঁথিতে এক টিপ সিঁদুর ছুঁইয়ে পারুল তার পাশে এসে বসল, 'এই কটা মৌরলা নুন-হলুদে ফুটিয়ে ঝোল করে ফ্যাল। ভাজাভাজি যেন করতে যাসনি, গন্ধ ছড়াবে।'

মৌরলার সঙ্গে একটা সরপুঁটিও নিয়ে সুন্দরী ঘর থেকে বেরিয়েছে কি বেরোয়নি, উঠোনে ভাঙা কাঁসি বেজে উঠল, 'ও পারুলবৌ, আমারে এট্টা মাছ দিবিনি?'

হায় রে মা! পারুল কপাল চাপড়াল। শয়তান বুড়ি ঠিক তক্কে তক্কে থেকেছে দ্যাখো। এত কড়া নজরদারির পরও পদ্মবুড়ি মাছের হদিস পায় কি ভাবে?

সুন্দরী চকিতে মাছকটাকে ছুঁড়ে দিয়েছে চৌকির নিচে। পারুল ঠেলে ঠেলে আরও ভেতরে ঢুকিয়ে দিল পোঁটলাটা। বুড়িকে বিশ্বাস নেই। হামলে হুমলে ঢুকে পড়তে পারে ঘরে।

—'ও বৌমা, এট্টু মাছ দে না রে!'

গলা নয়, যেন শাঁকচুন্নি কাঁদছে। পারুল কোমর বেঁধে বেরিয়ে এল দাওয়ায়, 'ফের আমার উঠোনে পা রেখেছিস অলুক্ষুণে পেত্নী? যা বেরো,—বেরো বলছি।'

পদ্মবুড়ি দু পা পিছোল। ঘাড় কাত করে বুঝি শোনার চেষ্টা করল পারুলবৌ কি বলে।

পারুলের গলা আরেক পর্দা উঠল, 'খবরদার যদি তোকে এ উঠোনে দেখি কোনদিন...'

—'মাছ একটা পেলেই চলে যাই।'

—'মাছ পাব কোথথেকে? বিয়োব?'

—'বিয়োবি কি লো?' পদ্মবুড়িরও গলা উঁচু হল, 'মাছ তো তোর ঘরেই রে।'

পারুল থমকে গেল। বুড়ি আজকাল খুব জেরা করতে শিখেছে। শেখায়টা কে? রূপবান? না বুড়ির আদরের নাতবৌ সোহাগবালা? কত শত্তুর যে আছে পেছনে। পদ্মবুড়িকে ঘাবড়ে দিয়ে পারুল হঠাৎ ভেউভেউ কেঁদে উঠল, 'আমি বলে পেটেরগুলোকে দুগাল মুড়িও দিতে পারি না...আমার ঘরে শত্তুরেরা মাছ খুঁজতে আসে গো...ও হো হো হো...'

এমন গলা ফাটিয়ে কাঁদছে পারুল যে পদ্মবুড়ির ঝাপসা কানেও হাহাকারগুলো

পরিষ্কার পৌঁছে গেল। কয়েক পলক হতবাক দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বাইরে। সোহাগবালাও সেদিন এমনধাবা কেঁদে উঠেছিল। দিব্যি মাছের গন্ধ পেযে পদ্ম ঢুকেছিল তার হেঁসেলে। সে এই মারে, সেই মারে, 'আমি বলে কতদিন পর দুটো মাত্র চারাপোনা কিনে আনলুম বাজাব থেকে...'

—'কিনলি কি রে? আমি যে তখন নেতাইকে জলে নামতে দেখলুম?'

—'মরণদশা! কি দেখতে কি দেখেছ, চোখ বলে কিছু আছে তোমার?'

—'তবে বুঝি ওটা নেতাই নয়!' বুড়ি অমায়িক হেসেছিল, 'মরুক গে যাক। তুই আমারে এক টুকরো মাছ দে না রে মা। দিবি?'

'দোব। মাছ নয়, মুখে নুড়ো জ্বেলে দোব তোর। মিথ্যেবাদী, কুচুটিবুড়ি, পেটে তোব এত সন্দেহ? আমাব নেতাই বলে শুধু একটা ডুব দিতে গেছিল পুকুরে...'

কি আর বলে পদ্মবুড়ি। তোরা যেমন খুশি পুকুব থেকে মাছ তুলে খাবি আমি একটু চাইলেই দোষ? হাঁটতে হাঁটতে পদ্মবুড়ি নিজেই নিজেকে নাশ জানাতে থাকে। রূপবানটা পর্যন্ত তার চোখে ধুলো দিতে চায়। তা কানার চোখে ধুলো দিবি, তাব নাকটাকে ঠকাবি কি ভাবে? পর পর কদিন আলো ফোটার আগে ঘরে ঝাপুরঝুপুর আঁশগন্ধ। শুঁকে শুঁকে পদ্ম একদিন বলেছিল, 'ও রূপো, রোজ রোজ কার জন্য মাছ তুলিস রে? একদিন দুটো রাঁদ না, ভাল কবে খাই!' সঙ্গে সঙ্গে রূপবানেব সে কী হুংকাব, 'খবরদার, মাছেব কথা কাকপক্ষী যেন টের না পায়!'

পদ্ম গলা নামিয়েছিল, 'কি করিস তুই মাছ নিয়ে?'

—'বেচি।' রূপবানের সটান জবাব, 'টাকাব দবকার, বুঝলি? ধান কটাকে তো বাণ মেরে শেষ করেছিস...'

পদ্মবুড়িও রেগে উঠেছিল ঝপ করে, 'তবে আমার এক আনা আমাবে দিয়ে যা।'

হাইরে বাপ, শুনে নাতির কী তড়পানি! আশ্বিনের আকাশও বুঝি অমনধারা লাফালাফি করেনি এবার। ভযে চুপ মেরেছে পদ্মবুড়ি। শুধু ভরাদুপুরে একলা বসে পেটের কথা গলগল উগরে দেয় গাছ-মাটির কাছে। চিরকালের হেলাফেলার পুকুরটায় তখন ছলছল ঢেউ তোলে। চঞ্চল মাছ লাফায় ঘূর্ণি দিয়ে। পদ্মবুড়ির দৃষ্টি অতদূরে পৌঁছয় না। কান্নার মনে সে কেঁদে যায়, 'আমারে কেউ এট্টা মাছ দেয়নাগো। ওগো আমার হাত গিয়েচে, চোখ গিয়েচে—কে আমারে মাছ রেঁদে খাওয়াবে গো...।' কাঁদতে কাঁদতে বুড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

বুড়িকে ঘুমোতে দেখলে সোহাগবালা পা টিপে টিপে পুকুরে আসে। এসময় জলের বুক বড় শীতল। পা ছোঁয়ালেই শরীর শিউরে ওঠে। তবে এখন ছাড়া সুযোগ কোথায়? মেজবৌ মেয়েকে নিয়ে স্টেশনে গেছে, দেখে নিয়েছে সোহাগবালা। ছেলেমেয়ের দল সব খেলতে গেছে বুড়োর মাঠে। সোহাগবালা বড় সাবধানে জল সরায়। শব্দ হলেই ডুব দেয় গভীরে। জল থেকে ঘুমন্ত বুড়িকে দেখতে দেখতে একবার বুঝি মায়া হয়। শেষ কার্তিকের দুর্বল রোদে গাছের পাশে আগাছা হয়ে গেছে। ডেকে তুলে একটুকরো মাছ খাওয়াতে সাধ হয়। পরক্ষণে মন পাল্টায়। পাগল নাকি? একবার

দিলেই বুড়ির নোলা বাড়বে। তারওপর যা পেট-আলগা। ভ্যাক ভ্যাক চাউর করে দেবে দশদিকে। তখন সোহাগের মুখ থাকে কোথায় ? সোহাগই না বড় গলায় দেওরদের বলেছে, 'পুকুরের মাছ পুকুরে বাড়তে দিতে হবে। কেউ চুরি করতে পারবেনি। চোত-বোশেখে পুকুর ছ্যাঁচা হলে...'

'হক কথা।' সায় দিয়েছিল সকলেই, 'বাড়তে দিলে মাছ কালে সোনা হবে।'

সোহাগবালা আলতো জল ছড়িয়ে একচোট হাসল মনে মনে। কে কাকে পাহারা দেয়, কে করে চুরি। গাজনপুরের ঘরে ঘরে পুকুর নিয়ে দাঙ্গা লেগে গেছে। মণ্ডলদের ঘরে ভাইযে ভাইয়ে হাতাহাতি হয়ে গেল পরশুদিন। সর্দারদের তো মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ধান ডুবিয়ে এবার মজার কল করেছে বসুমতী। মাকালতলায় কাদের পুকুরে যেন রাতারাতি জাল ফেলে মাছ উড়িয়ে নিয়েছে ডাকাতের দল। সোহাগবালার দুই ভুরু জড়ো হল। তবে তাদের গাঁয়েও কি ডাকাত ঢুকছে আজকাল ? গহীন রাতে মাঝে মাঝেই ছপছপাৎ জাল ফেলার শব্দ হয় যেন। মাছ লুটতে ডাকাত আসে, না অন্য কেউ ! রূপবানটাই কি কম বড় ডাকাত নাকি ! সোহাগবালা পেছনের জানলা থেকে উঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছে। আওয়াজ পেলেই সব চুপ হয়ে যায়। সাহস করে লম্প হাতে একদিন বেরিয়েও ছিল। বোঝার আগে সুড়ুৎ করে সরে গেল তিন-তিনটে বড় ছায়া। তিনজন কেন ? তবে তো রূপবান নয় ! সত্যবান তো নয়ই, সে ভারী ভীরু প্রকৃতির। ভালমানুষ মতন, অনেকটা সোহাগবালার স্বামী যেমন ছিল।

শক্তিমানকে মনে পড়তে জলের কোলে পাথর হয়ে গেল সোহাগ। জাল পাততে ভুলল। সেই লোকটা পাশে থাকলে আজ এই দশা হয় ? নিজেরই ভাগের পুকুরে আসতে হয় সিঁধেল চোরের মত ? নাকি একফোঁটা ছেলে নিতাইকে পাঠাতে হয় পরের দ্বারে কাজ করতে ?

বেলার মনে বেলা নামছে। অবশ শরীরে সোহাগবালা দাঁড়িয়েই আছে হিম-হিম জলে। কার্তিকের সূর্য একটু পরেই ডুব দেবে রেললাইনের ওপারে। পুবের ধানবাদা বেয়ে, পাড়াপড়শীর ভিটে মাড়িয়ে থোক থোক কুয়াশা তখন জড়ো হবে গাজনপুরের বুকে। সে কুয়াশায় এক হাত দূরের কিছু দেখা যায় কি যায় না। সোহাগবালার শরীরটা সিরসিরিয়ে উঠল। সময় এখন বড় নির্জন। জল থেকে উঠে পড়ল সোহাগ। থাক্, আজ আর মাছ তুলে কাজ নেই। বরং দেওর দুজন ঘরে ফিরলে কথা বলতে হবে। রাতের বেলা কারা আসে পুকুরে ? সত্যি কি তবে ডাকাত তারা ?

গা মুছে পদ্মবুড়িকে গিয়ে ঠেলা দিল সোহাগ। কি জানি কি ভেবে ডাকল জোরে জোরে, 'ও ঠাকমা, খুব ঘুমিয়েছিস—ওঠ দিকি এবার। ঘরে চল।'

পদ্মবুড়ি চোখ খুলেই বুজে ফেলল। আবার খুলল। এ কে আজ তাকে ঘরে তুলতে এসেছে ! চেনা চেনা—তবু বড় দূরের যেন।

—'আমি রাঙাবৌ রে, চিনতে পারছিস নি ? ওঠ্, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

কত যুগ পরে সোহাগ বুঝি নরম করে কথা বলছে। পদ্মবুড়ি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল, —'আমারে কেউ দেখে না রে রাঙাবৌ। ভাত দেয় না, মাছ দেয় না...'

অনেক দূরের আকাশ ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে সারসের দল। সেদিকে তাকিয়ে

সোহাগবালা ভারী মধুরভাবে ঠোঁট ছড়াল, 'কাল তোকে গোটা একটা মাছ রেঁধে দেবোখন।'

—'কোথথেকে পাবি ?' পেছনে হাঁটতে হাঁটতে জেরা শুরু করে দিয়েছে পদ্মবুড়ি, 'এখন বুঝি চুরি করলি পুকুর থেকে ?'

—'দূর কানাবুড়ি!' সোহাগবালা আগের দিনের মত করে ভেংচি কাটল দিদিশাশুড়িকে, 'বাজার থেকে শোল মাছ এনে খাওয়াব তোকে। খলবল করবি জ্যান্ত শোলের মত...' বলতে বলতে গলা নামাল, 'ও বুড়ি, তুই আমার কাছে এসে থাকবি ? কালীর দিব্যি, আমি কাউকে ঠকাই না। তাছাড়া রূপবানও তো বিয়ে করলে তোকে তাড়িয়ে দেবে।'

পদ্মবুড়ি ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছে। রাঙাবৌ-এর হঠাৎ এ কী পরিবর্তন ? মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো ?

কাঁঠালগাছের গা বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে হেমন্তের কাঁচা রোদ। একটু পরেই গলে গলে মিশে যাবে আঁধারে। তারপর আঁধার না নামতেই চারদিক নিকষ কালো। শেষ রোদটুকুর দিকে তাকিয়ে পদ্মবুড়ি ভাবছে কার কাছে থাকলে লাভ বেশি—রূপবান, না সোহাগবালা ? সোহাগ হিসেব্ করে দেখছে বুড়ি যদি আরও কটা বছর বাঁচে...ছেলেটা যদি তার মধ্যে আরেকটু ডাগর হয়ে যায়...

ভাবতে ভাবতে দুজনেই হিসেব গুলিয়ে ফেলল। অসম বয়সের দুই বিধবা অসহায় তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

সালতামামি

সকাল থেকেই আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। আজ সত্যবানদের পুকুর ছ্যাঁচা হবে। পাম্প নিয়ে লোক আসছে গঞ্জের বাজার থেকে। তার আগেই রূপবান টাকা চাইল দাদাদের কাছে, 'তিন ঘণ্টা মেশিন চললে লাগবে তিন কুড়ি ষাট টাকা। তা বাদে কিছু রাহা খরচ। আমি আগাম কুড়ি টাকা দিয়েছি। তোমাদেরটা দাও এবার।'

সত্যবান বলল,—'এর বেলা সমান ভাগ কেন ? পাঁচআনা ছআনা হোক।'

রূপবান ঝাপটে উঠল। হিসেবী মানুষদের ন্যায্য কথায় চিরকালই বিরাগ, 'অত করলে নিজেরাই সব ব্যবস্থা কর গিয়ে। কাজের বেলায় আমি...'

—'আহা-হা-হা, তেতে ওঠ কেন ?' এক জোড়া মাছরাঙা উড়ছে পুকুরের মাথায়, সোহাগ তাদের তাড়াতে চেষ্টা করল, 'টাকা আমরা কেউ মারব না...'

—'তবে ছাড় দিকিনি।'

—'দোব, দোব—হাতে এলেই দোব।' পারুল ঠোঁট বেঁকাল,—তোমার মত তো আমাদের মিষ্টির দোকান নেই ভাই।'

পুরনো খোঁচা। রূপবান গায়ে মাখল না। সকাল থেকে সে শুধুই হিসেবের নেশায় মশগুল। প্রথমেই ডুমুরের জন্য সিল্কের শাড়ি কিনতে হবে একটা। তারপর আর যা চাই। এখন তো মাত্র চৈত্রটুকু পার হওয়ারই অপেক্ষা।

গাঁয়ের উৎসাহী লোকজন এসে গেছে পুকুরপাড়ে। সত্যবান ছুটল হরিজ্যাঠাকে

ডাকতে। হারান সর্দার, বৃন্দাবন আর হরিসাধন এই তিনজন আজ জলযজ্ঞের প্রধান তিন সাক্ষী। আগে কয়েক বাড়িতে জল ছেঁচার কালে দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে। সুবোধ দাস তো এখনও পড়ে আছে গঞ্জের হাসপাতালে। পুলিশ কেস হয়ে গেছে ভাইয়ের নামে। নবীনপুকুরে লাশও পড়েছে তিনটে পবিবারের। শেষে পার্টির লোক ফয়সালা ফরমান জারি করে গেছে, যার ঘরেই পুকুর ছেঁচা হোক না কেন, কম করে গাঁয়ের তিনটে মাথাকে সাক্ষী রাখতে হবে। ভাগবাঁটোয়ারার সময় আর যেন না লড়াই বাধে। তবে সাক্ষ্য তো আর কেউ শুধুমুখে দেবে না। তার ব্যবস্থাও করতে হয় পুকুর মালিকদের। সাক্ষী পিছু পাঁচটাকা ধার্য হয়ে আছে। মাছ ভাল উঠলে পার্টির কমিশন আলাদা। ভোর থেকে সজনেতলায় শরীর গুটিয়ে নীরবে বসে আছে পদ্মবুড়ি। তার দিকে ফিরে দেখছে না কেউই। কচিকাচারা তার গায়ের ওপব দিয়েই ছুটছে, নাচছে। কেউ যেন একবার মাড়িয়েও গেল। আশ্চর্য। তবু বাক্যি নেই বুড়ির ঠোঁটে। বকবকে বুড়ি অদ্ভুত রকমের শান্ত আজ। জুলজুল চোখে শুধু তাকিয়ে আছে টিলটিলে পুকুরটাব দিকে।

প্রথম গ্রীষ্মের নবীন তাপ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। চৈত্রের দামাল ধুলো উড়ছে যেমন তেমন। বড় নিঃশব্দে ঘন হচ্ছে রোদ। শেষে আরও বেলায়, সকলে যখন অধৈর্যপ্রায়, তখন এল মেশিন। চোঙা প্যাণ্ট পরা, টেরিবাগানো মেশিন চালক এসেই জায়গামত বসিয়ে দিল পাম্পসেট, জেনারেটার। যান্ত্রিক ভাবে তাকাল সবার দিকে, 'জল ক'ভাগ হবে?'

—'মোট তিন ভাগ। প্রথম ঘণ্টা জল যাবে বড়র জমিতে, দ্বিতীয় ঘণ্টা মেজর, বাকিটা...'

—'তা কি করে হয়?' রূপবান আপত্তি জানাল, 'তিন ঘণ্টা পাম্প চললে বেশি সময় আমার জমিতে দিতে হবে।'

বিজ্ঞ মেশিনচালক ঘাড় ঝাঁকাল। জলভাগ নিয়েই যে প্রথম বিবাদের সূচনা হয়, তা সে হামেশাই দেখছে।

—'তিন ঘণ্টার বেশিও চলতে পারে পাম্প। যেমন জল থাকবে...'

—'ঠিক আছে। তবে না হয় শেষের ভাগটাই আমার।'

—'তা কেন?' সোহাগবালার ঘাড় শক্ত হল, 'ঠাকমাকে সে যদি আর নাই রাখে...'

—'রাখব কি না এখন তার বিচার হবে কেন?'

—'আরে বাবা, থামো দিকি তোমরা।' সাক্ষীদের মধ্যস্থতায় দ্বিতীয় দফার ঝগড়া শুরুতে থামল, 'ঠাকমাকে নিয়ে পরে নিকেশ কোরো বসে।'

পারুল সত্যবান কোনদিনই পদ্মবুড়ির দায়িত্ব নিতে চায় না। তারাও আগ্রহ দেখাল না বিশেষ, 'মেশিন চালু করে দাও হে। বেলা যায়।'

ভটভট মেশিন ডাকতে শুরু করেছে। জল উঠে আসছে বানের স্রোতের মত। পাইপ থেকে ছিটকে যাচ্ছে সোহাগবালার জমিতে। ভিজে উঠছে মাটির শরীর।

জল কিছুটা নামতে ইয়া বড় এক খ্যাপলা জাল পড়ল পুকুরে। মাকালতলার ইয়াসিন জেলে চার-চারটে লোক নিয়ে জলে নেমেছে। তাদের দিতে হবে মোট চার

দশ চল্লিশ টাকা। হেঁইও, হেঁইও. এবার জাল গোটাচ্ছে জেলেরা। পাড়ে উঠল। কাঁটা আগেই টাঙিয়ে রেখেছিল ইয়াসিন। খোল, শামুক, ঝাঁঝি আর কচুরিপানা বেছে ফেলে মাছ চড়ল পাল্লায়। মাঝারি কাতল দুকিলো। কুড়ি টাকা করে মোট দাম চল্লিশ। কালবোস দেড় কিলো...খলসে এক কিলো আড়াইশ...সিলভার কাপ এক কিলো তিনশ...শোল সাড়ে আটশ গ্রাম...প্রথম দফায় মাছ উঠল একশ তিপ্পান্ন টাকার।

—'প্রথম ঝাঁকে মাছ কমই ওঠে হে। জল বেশি...'

—'তা-বলে এত কম?' রূপবানের অবিশ্বাসী চোখ দাঁড়িপাল্লা ঘুরে জলের দিকে স্থির।

দ্বিতীয় দফায় বড় মাছ তিনশ বারো টাকার। এবার একটু বেশি। জল ক্রমশ কমছে। পাইপের মুখ শক্তিমানের জমি ঘুরে সত্যবানের ক্ষেতে। মাছ দেখতে হুড়মুড়িয়ে ভিড় করছে বাচ্চারা। রূপবান কেঁকিয়ে উঠল. 'এখানে এখন গোল করিস না তো! ভাগ সব. সরে যা।'

পুরুষরা উবু হয়ে বসল পুকুরপাড়ে। সোহাগবালা, পারুলদের দৃষ্টি ঝুলন্ত কাঁটার দিকে পলকহীন।

—'এ খেপে আরও যেন মাছ ওঠার কথা ছিল?'

—'যেমন আছে তেমনই তো উঠবে বাপু।' তৃতীয় দফায় চুনোজালে মৌরলা দুকিলো একশ, চুনোপুঁটি দেড়কিলো. কই-তেলাপিয়া তিন কিলো চারশ. ছোট ট্যাংরা এক কিলো ছ'শ।...

পাইপ ঘুরেছে রূপবানের ক্ষেতে। জলের টানে ছিটকে আসছে কিছু বেওয়ারিশ কুচো চিংড়ি। তিড়িংবিড়িং লাফ কাটছে ভেজা মাটিতে। কুচোকাচার দল দৌড়ল সেদিকে।

চতুর্থ দফায় জালে কটা মাত্র মাছ। বাকি শুধু কাদা শামুক. জলঝোপ. ঝিনুকের খোল। কী কাণ্ড, অত মাছ তবে গেল কোথায়? কম করেও যে দুহাজার টাকা...

ইয়াসিন দাঁত বার করে হাসছে, 'সব পুকুরেই এক দশা গো। কার মাছ কে খেয়েছে ঠিক কি তার?'

কথা নয়, যেন ফুটন্ত তেলে জলের ছিটে। যেন এই বাক্যটুকুরই অপেক্ষায় ছিল হতাশ মুখগুলো। সোহাগবালা ডুকরে উঠল. 'এমন হবে আমি জানতুম গো...ওগো. এ কী সব্বোনাশ হল গো-ও-ও...'

পারুল চিলচিৎকার জুড়ল, 'চোর চোর, চোরের ব্যাটা চোর...'

রূপবান গর্জে উঠল, 'কাউকে ছাড়ব না শালা। সব জানি কারা মাছ তুলেছে. জানতে বাকি নেই।'

হিংস্র চোখ জোড়ায় জোড়ায় ঘুরছে পরস্পরের দিকে। পড়শীরা একে একে সরে পড়তে লাগল। রূপবান কখন কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! তবে গাজনপুরের কে কোন রাতে কার পুকুরে জাল ফেলেছে তার দলিল কোথাও নেই। সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া ধরা যায় না কাউকেই। পদ্মবুড়ির নাতি-নাতবৌ আর কচিকাচা বাদে পুকুরধারে আছে আর মাত্র তিনজন। তিন সাক্ষী। জোট বেঁধে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তারা। কথার লড়াই মারপিটে

পৌঁছলে তবে নাক গলাবে। এইরকমই নিয়ম। পুকুরের জল একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। আঁশটে গন্ধে ঝমঝম চতুর্দিক। মেশিনচালক পাততাড়ি গোটাচ্ছে। ইয়াসিন ঝটপট মাছ ভরতে লাগল ঝুড়িতে, 'নাও গো, কাঁদাকাটি পরে হবে, হিসেবটা বুঝে নাও।'

রূপবান গটগট এগিয়ে এল, 'যা টাকা হবে সব আমি নেব শালা। কাউকে এক পয়সা দেব না।'

—'কেন মানিক? মগের মুলুক পেয়েছ নাকি?'

—'মুলুক-ফুলুক বুঝি না। যারা শালা মাছ ঝেঁপেছে তাদের এক পয়সাও ভাগ নেই।'

—'তবে তো তুইই আগে বাদ যাস রে হারামজাদা। নিত্যদিন অন্ধকার থাকতে...আমরা কিছু দেখিনি ভেবেছিস?'

—'দেখলেই হল? প্রমাণ কি?'

—'প্রমাণ লাগে না রে শালা। কোন মেয়েছেলের গভভে সব ঢেলে আসিস...'

—'বাজে কথা বললে মুখ ছিঁড়ে নেব।'

—'নে না দেখি।' সত্যবান ব্যাঙের মত দু ধাপ লাফাল।

—'মাছ যদি ঘরের কেউ চুরি করে থাকে তো সে হল তুই আর ওই নেতাই-এর মা...'

—'ইইইহ', সোহাগবালার মুখ ভেঙে-চুরে গেল, 'আমার নাম মোটে নেবেনি বলে দিলুম। খপরদাব!'

—'ক্যান রে? তুই কোন মহাজনের বিটি?' পারুলের চোখ দপদপ জ্বলছে, 'হাতেনাতে পাঁচবার আমি ধরেছি তোকে...'

—'সে তো তুইও কতবার ধরা পড়েছিস। জলে নামার নামে চুপড়ি ফেলে...'

—'আহাহা, চোরের মায়ের বড় গলা বে...'

—'আরে থাম।'

নিদাঘবেলার সূর্য যত প্রকট হয়, বিবাদ তত উঁচুতে ওঠে। উঠতেই থাকে। ফাঁকা পুকুরের ঘোলাজলে ছটফট করে পাঁকাল মাছের দল। ছোটরা উদোম দেহে ঝাঁপ দেয় সেই জলে। পিছলে পিছলে মাছ ধরতে চায়। মাগুর, শিঙি, চ্যাং, চিংড়ি। সজনেতলা থেকে লোলচর্ম বুড়িটা তাই দেখে বসে বসে। পেটে তার বড় চনচন ক্ষিধে। বুঝতে পারে এ ক্ষিধে আজও মিটল না। বাবলাডালে ভর দিয়ে জীর্ণ শরীর উঠে দাঁড়ায়। পৌঁছে যায় বুড়ো শিরীষ গাছের কাছে। খাখা ধানভূমির দিকে তাকিয়ে ক্ষুধার্ত ঠোঁটদুটো নড়েচড়ে, 'ওরে ভাত বড় মিঠে রেএএএ...মাছে বড় সোয়াদ' —বলতে বলতে ঘন ঘন ঢোঁক গেলে। কান্নার দমকে চামড়া ঢাকা হাড়ের খাঁচাটা ধুপধুপ কাঁপে। ছাইরঙা চোখ আকাশে তুলে জোরে জোরে শ্বাস টানে। চৈত্রশেষে আবার নতুন কোন গন্ধ পায় কি গাজনপুরের পদ্মবুড়ি। ভাত বা মাছের! জল বা মাটির! বা আকাশের! কে জানে?

ঝড়বাদলে ধূধূ মাঠে...

ঝড়বাদলে ধূ-ধূ মাঠে যে যায় সে পায়... ছেলেবেলায় ঝড় উঠলেই ঠাকুমা দুলে দুলে গাইত ছড়াটা। তবে ওই টুকুনই। নাতিরা বার বার প্রশ্ন করত,—'তারপর? ও ঠাম্মা, বলো না তারপর? গেলে কি পায়?' ঠাকুমা উত্তর দিত না। শুধু ঠোঁট টিপে ভারি রহস্যের হাসি হাসত।

অনেক অনেকদিন পর আজ এই নির্জন স্টেশনে দাঁড়িয়ে রহস্যময় সেই ছড়াটা কেন যে মনে পড়ে গেল শঙ্খর।! ট্রেন থেকে নামতেই সামনে সেই বিশাল প্রান্তর। ঘন মেঘ জড়ো হয়ে বড়সড় আসর পেতেছে সেখানে। বৃষ্টি বুঝি নামে নামে। আজ বোধহয় না বেরোলেই ভাল হত। অসময়ে এমন আষাঢ়ে মেঘ কোথথেকে এল কে জানে! নির্ঘাৎ বঙ্গোপসাগরে ডিপ্রেশান! তবে আজ না এলে কবে আবার আসা হয়। রাখিকে সংসারের গণ্ডী থেকে বার করাটাই এক বিরাট সমস্যা। আজ এই ঝামেলা, কাল ওই ফ্যাচাং। আগের দিনও তো বেরোব বেরোব, দুম করে খড়দার মাসিমা এসে হাজির। কি, না সারাদিন থাকবেন। আরেক দিন রাত অবধি সব ঠিকঠাক, সকাল থেকে হঠাৎ ঝুমপার গা ছ্যাঁকছ্যাঁক। দরকারী কাজে এভাবেই শুধু পরপর বাধা আসে।

মেঘলা মাঠে বারকতক চোখ বুলিয়ে রাখির দিকে আড়চোখে তাকাল শঙ্খ। অনিচ্ছায় এসেছে বলে এখনও মুখ ভার। আঁচল তুলে চেপে চেপে ঘাড়গলা মুচছে। দু ভুরুর মাঝে জমাট বিরক্তি।

কথা বলার জন্যই কথা বলল শঙ্খ,—'আকাশের সাজগোজ দেখে মনে হয় জোর নামবে, কি বলো?'

রাখি কোন কথা বলল না।

শঙ্খ আকাশের দিকে মুখ করে কোমরে হাত রাখল,—'তবে বোধহয় নামছে না। দ্যাখো, পশ্চিম দিকটা খালি খালি আছে। পুরো ভরাট হওয়ার আগে আমাদের কাজ হয়ে যাবে।'

রাখি এবার সোজাসুজি তাকাল,—'তোমার লোক কোথায়?'

লোকটা যে সামনাসামনি কোথাও নেই তা আগেই দেখে নিয়েছে শঙ্খ। ঢোক গিলল তাই, —'ওদিকটায় থাকতে পারে। চলো না, ওপারে যাই।'

দুই প্রাচীন স্টেশনের মাঝখানে, খোলা মাঠের কোলে, মাত্র কিছুকাল আগে জন্ম নিয়েছে ছোট্ট স্টেশনখানা। এখনও ওভারব্রীজটা পর্যন্ত হয়নি। রেললাইনের উঁচুনিচু খোয়া টপকে ওরা এপারে এল। কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। কেমন যেন হু হু করছে গোটা এলাকাটা। কাঁচা মাটির গা-বরাবর একা একটা ল্যাম্পপোস্ট। রাখি সেই অবধি পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল,—'কই, কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না।'

শঙ্খর ব্যস্ত চোখ বৃথাই পুরো প্ল্যাটফর্ম ঘুরল আবার,— 'বুঝতে পারছি না। দশটার আগেই তো এখানে এসে দাঁড়াবে বলেছিল।'

—'দ্যাখো কখন আসে। দালালদের কোন কথার ঠিক থাকে না।'

—'দেখি আরেকটু।'

রাখি ঠোঁট ওল্টালো। ট্রেনটা তাদের নামিয়ে দিয়ে যে পথে চলে গেছে, সেইদিকে তাকিয়ে আছে। ভাবটা এমন গাড়িটা যদি ভুল করে উলটো দিকে চলে আসে, টুক করে ও ফিরে যাবে কলকাতায়। কী যে মোহ ওর কলকাতার ওপর। দীর্ঘদিন খাঁচাবন্দি থাকলে বোধহয় এরকমই হয়। খাঁচার পাখি আকাশই ভুলে যায় তখন।

শঙ্খ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে টিকিট কাউন্টারের দিকে এল। খুপরি মতন টিকিট ঘরটির ঝাঁপ যথারীতি অর্ধেক নামানো। ভেতরে কেউ আছে কি নেই বোঝা যায় না। আগে যে ক'দিন এসেছে. কোনদিনই কাউন্টারের ঝাঁপ পুরোপুরি খোলা দেখেনি শঙ্খ। শহরতলির বেশিরভাগ লোকাল এখানে দাঁড়ায় না। হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকারে দশদিক তোলপাড় করে ঝমাঝম চলে যায়। সেই অভিমানেই কি কাউন্টাব ঘোমটা টেনে রাখে? শঙ্খ ঝুঁকে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। টেবিলে মাথা গুঁজে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে টিকিটবাবু। আয়েস করে ঘুমোবার দিন বটে আজ। আর কেউ কি আছে ভেতরে? দেখা যাচ্ছে না। বাইরে বেবোনোর মুখে লাল সিমেন্টেব চওড়া বেঞ্চি। একটা মাদী কুকুর খানচারেক বাচ্চা নিয়ে সেখানে নিঝুম বসে। শঙ্খ বাইরেটাও দেখে এল। নাহ. লোকটা আসেইনি। কোন মানে হয়? অত দূব থেকে, এমন একটা আকাশ বয়ে তারা আসতে পারল. আর তুই ব্যাটা কাছেই থাকিস, জমি কেনা-বেচাতে দাঁও মারবি মোটা... শঙ্খ পায়ের ডগায় এসে পড়া ইটের টুকরোয় ফুটবলের শট মাবল একটা।

স্টেশনের বাইরে কাঁচা রাস্তা। রাস্তার গায়ে এখানকার সবেধন একটিই দোকান। ঠিক দোকান নয়, দোকানের মত। বাঁশের খুঁটির মাথায় টিনেব চালা, তিনদিকে দরমার দেওয়াল। পাম্প দেওয়া কেরোসিন স্টোভে কখনও-সখনও এখানে চা বানানো হয়। তবে কখনও-সখনই। অফিস টাইমের টুকরোটাকরা দু-চারজন ছাড়া বড় একটা চায়ের খদ্দের নেই এলাকায়। অন্যান্য দিন তাও এক-আধজন বসে থাকে বেঞ্চিতে। বেশিরভাগ বাসরাস্তার দিকের বাসিন্দা। বসে বসে আড্ডা মারে, কাগজ পড়ে, বোফর্স কিম্বা শ্রীলঙ্কা চুক্তি নিয়ে তর্ক জমায়। আজ চারদিক সুনসান। এমন গোমড়া দিনে কে আর শখ করে বাইরে বেরোয়! ছোট্টমতন কাচের বাক্সে গড়াগড়ি যাওয়া গুটিকতক অনাথ দরবেশ আর দানাদার সামনে রেখে দোকানিটাও ঢুলছে। তার খুব কাছে গিয়ে গলা ঝাড়ল শঙ্খ,—'দাদা শুনছেন?'

ধড়ফড় করে সজাগ দোকানি —'টুটুবাবুকে দেখেছেন? এখানে এসে দাঁড়ানোর কথা ছিল...'

ঘুমন্ত চোখ টানটান করল লোকটা। হাতের উল্টোপিঠে ঘুমের রস মুছছে। একবার ঝুঁকে আকাশও দেখে নিল.—'সে কি আজ আর ঘর থেকে বেরোব্যা? জমি দেখাবার কথা ছিল বুঝি?'

টুটুবাবু এ অঞ্চলে মোটামুটি সবার পরিচিত। মুখের আগে তার চোখ কথা বলে। এসব লোকরা স্বভাবতই কথা দিয়ে কথা রাখে না। প্রশান্তদাই এই লোকটার সঙ্গে শঙ্খর আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। শঙ্খ তখন কলকাতার বুকে নিজস্ব একটা ফ্ল্যাটের স্বপ্ন দেখছে। ফ্ল্যাট না হোক, নিদেনপক্ষে এক ফালি জমিও যদি পাওয়া যেত। এখানে

ওখানে কথা বলে বেড়ায়, কিছুতেই সুবিধে হয় না। সাধ আর সাধ্যের মধ্যে দূরত্বটা যে বড্ড বেশি। শেষে প্রশান্তদা বলল, —'কি তোমরা কলকাতা কলকাতা করে মরো? একটু বাইরে যাও, দেখবে কত চমৎকার সব জায়গা পেয়ে যাবে।'

রাখি আপত্তি জানিয়েছিল, —'ও বাবা, কলকাতা থেকে দূরে গিয়ে আমি থাকতেই পারব না। এখানে আজীবন থেকে...'

—'দূর কোথায়? নরেন্দ্রপুর তো কাছেই। তোমাদের বালিগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরলে মাত্র কুড়ি মিনিট। স্টেশন হওয়ার পর পূর্বদিকের ধানীজমিগুলোও সব হৈ-হৈ করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ছুটির দিনে গিয়ে দ্যাখো গে যাও, তোমাদের মত ভূমিহীন বাবুবিবিরা কেমন রঙিন প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে ফাঁকা মাঠে নিজেদের সীমানা মাপছে। দামও তোমাদের নাগালের মধ্যেই।'

কথাটা ঠিক। বাসরাস্তা থেকে এ জায়গাটা যদিও দূর তবে স্টেশন হয়ে যাওয়াতে অনেকেরই ধারণা এখানেও শহর পৌঁছতে আর দেরী নেই। গড়িয়ার দিক থেকে ঝাঁক ঝাঁক বাড়ি এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। সোনারপুর আসবে ওদিক থেকে। শহর আর শহরতলীর মিলন হবে। এভাবেই তো নগর ডালপালা ছড়িয়ে দেয় নানাদিকে, ঝুরি নামিয়ে নতুন শিকড় গাড়ে। টুটুবাবু ছাড়াও আরও দু'একজন দালালের সঙ্গে আলাপ হয়েছে শঙ্খর। ইদানীং কিছু হাউসিং এজেন্সিও এদিকে ব্যবসায় নেমে গেছে। দিনকেদিন নিচু ধানজমির দামই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। আজ পাঁচ হাজার কাঠা তো কাল ছ হাজার, পরশু আট হাজার।

শঙ্খ প্ল্যাটফর্মে ফেরার আগে সিগারেট ধরাল। আলগাভাবে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠছে মাঝে মাঝে। কোথায় হয়ত বৃষ্টি নেমে গেছে। চাপা গুমগুম শব্দে আকাশ ডেকে উঠল। ডাকতে ডাকতে গড়িয়ে গেল দূরে আবছাপ্রায় ঘরবাড়িগুলোর দিকে। এই পশ্চিম পারটায় তবু যা হোক জনবসতি আছে। মেঠো পথ বেয়ে খানিক গেলেই বাসরাস্তা, রামকৃষ্ণ মিশন। পূবদিক একেবারেই জনহীন। যতদূর চোখ যায় শুধু হা-হা মাঠ। খামচা খামচা ভাবে চাষও হয়েছে কোথাও কোথাও। মাঠের শেষ প্রান্তে গ্রাম। এখান থেকে শুধু তার সবুজ আভাস পাওয়া যায়।

টুটুবাবু ওই কামরাবাদের দিকেই থাকে। এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে খুঁজলে কেমন হয়? ধ্যুৎ, বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তার থেকে ফিরে যাওয়া ভাল।

প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে ডানদিকে তারজালে ঘেরা সদ্যকিশোরী এক গুলমোহর গাছ। তার ওধারে চুপচাপ দাঁড়ানো রাখিকে দেখাচ্ছে ঠিক নির্বাসিত রানীর মত। শঙ্খ মনে মনে হেসে ফেলল। সত্যি, এসব জায়গায় রাখির মত শহুরে মেয়েদের একেবারে বেমানান লাগে। তাকেও কি ঠিক মানায়? এই বিশাল প্রাকৃতিক পটভূমিতে? না মানাক, জায়গাটা শঙ্খর ভীষণ ভাল লেগে গেছে। কলকাতার এত কাছে, বলতে গেলে প্রায় নাগালের মধ্যে, এমন বিশাল নির্জনতা পাওয়া যায় ভাবলেই গা ছমছম করে ওঠে। এ ধরনের নির্জনতার আলাদা একটা চোরা টান আছে।

প্রথম দিন এখানে এসেই অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়েছিল তার। চারধারের অনন্ত নীল আর সবুজের মাঝখানে তাকে দাঁড় করিয়ে টুটুবাবু বলেছিল,—'এই দেখুন, এই

আপনার জমি। পছন্দ হয়?'

মাঠের গায়ে টালমাটাল ঢেউ উঠেছে তখন। সোনালি রোদে ভেসে গেল কিছু শুকনো ধুলোমাটি। গাছগাছালি তিরতির নাচছে।

লোকটা বলল,—'স্টেশনের কাছেও দু'একটা প্লট আছে। দাম একটু বেশি পড়বে। দেখবেন?'

উত্তর দেবে কি, শঙ্খ কোথায় চলে গেছে তখন। সে যেন সে নয়, সে হয়ে গেছে পৃথিবীর সেই আদি পুরুষ যে প্রথম অধিকার করেছিল ভূমিকে, তারপর প্রথম ঘর বেঁধেছিল মাটির ওপর। কথাটা রাখিকে গিয়ে বলতে সে তো হেসে কুটিপাটি, —'আশ্চর্য কল্পনাশক্তি যা হোক! ওসব কাব্য আমার পোষায় না।'

—'আহা, তুমিও একটু ভাবো না। মনে কর ওখানে গিয়ে প্রথম আমরাই ঘর তৈরি করলাম। ভেবে দ্যাখো, চারদিকে কোন হট্টগোল নেই, প্রতিবেশীদের রেষারেষি নেই, ধূ ধূ মাঠের ভেতর আমরাই শুধু থাকি। যে দিকে তাকাও, আকাশ মাটি আর সবুজ গাছপালা। ছেলেমেয়ে দুটো উদ্দাম খেলা করবে ধুলোতে। যেমন তেমন বাতাস দৌড়বে আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে। সে বাতাসে ধোঁয়া নেই, ডিজেলের গন্ধ নেই...'

—'তুমি ভাবো বসে বসে।' রাখি মুখ বেঁকিয়েছিল, —'একটা কথা মনে রেখো, ওসব পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বাড়ি করলে তুমিই গিয়ে থাকবে। আমরা কেউ যাব না।'

শঙ্খ পা দিয়ে চেপে সিগারেট নেভাল। রাখি একমনে হাতের নখ খুঁটছে। একটু দূর হলেও শঙ্খ বুঝতে পারল ওর নিচের ঠোঁট বেশ কাঁপছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলেই রাখির ঠোঁট অভিমানী বালিকা হয়ে যায়। আহা বেচারি, কত সাধই যে ওর অপূর্ণ থেকে গেল। নিজস্ব এক ফালি বাড়ির জন্য কবে থেকে শুধু কল্পনার জাল বুনে চলেছে আর উদ্বাস্তুর মত বাসা বদল করতে হচ্ছে একের পর এক। কোথাও একটু পুরনো হলেই বাড়িওয়ালা বাঁকা হয়ে যায়। অন্যের তৈরি ঘরে কী যে শংকা আর আড়ষ্টতায় দিনযাপন করতে হয় মানুষকে! কেমন হীনমন্যতা বোধও এসে যায় মনে। আসতে বাধ্য। তার নিজেরই আসে।

শঙ্খ বউ-এর কাছে এগোল,—'লোকটা এরকম ঝোলাবে ভাবতেও পারিনি। যাক গে, এরপর যে ট্রেনটা দাঁড়াবে তাতে ফিরে যাব।'

রাখি ঠাণ্ডা চোখ তুলে তাকাল,—'শখ মিটে গেল?'

কথাটায় যথেষ্ট খোঁচা আছে। শঙ্খর সামান্য রাগ হচ্ছিল। তার কি নিজের কোনই ইচ্ছে-অনিচ্ছে, শখ-আহ্লাদ থাকতে নেই? রাখি ধরেই নিয়েছে সে যা চাইবে তাই হবে। তার যদি এখানে জমি পছন্দ না হয়...। শঙ্খর গলা ভারী হল,—'আজ না হল তো কি আছে? কিনব মনস্থ যখন করেছি, আরেকদিন আসব।'

—'আমি আর আসব না।'

—'এসো না। আমি একাই বায়না করে যাব।'

আকাশ বেয়ে হুড়মুড় করে মেঘ ছুটতে শুরু করেছে। বিদ্যুৎ চমকাল বারকয়েক। রাখি গুম হয়ে আছে। হাওয়ার দিকে পেছন ফিরে আরেকটা সিগারেট ধরাল শঙ্খ,

—'কলকাতা কলকাতা করে মরছ, চেষ্টা তো করা হল। আমাদের জন্য ওখানে জায়গা আছে কোথাও? থাকলেও তুমি ছুঁতে পারবে?'

—'তেমন চেষ্টা আর হল কই। এই তো ইস্টার্ন বাইপাসের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল...'

—'ওখানে লটারি হবে। আমাদের কোনদিন লটারি উঠবে না।'

—'এটাও তোমার কল্পনা।'

—'কল্পনা নয়, বাস্তব। লটারি পাওয়ারও কপাল থাকা দরকার।'

—'লেজিদের কপাল কখনও খোলে না।' রাখি যেন ঠিকই করেছে তর্ক চালিয়ে যাবে, —'লটারি ছাড়াও কতরকম স্কিম হচ্ছে চারদিকে। মধ্যবিত্তদের জন্যও...'

—'তারাও কেউ তোমাকে প্রপাব কলকাতায় জায়গা দিতে পাববে না। এরকম শহরতলিতেই...'

—'সে যেমনই হোক, এমন ভূতুড়ে জায়গা তো হবে না।'

—'আশ্চর্য! শঙ্খ হতাশভাবে দু'দিকে মাথা নাড়ল,—'এমন একটা সুন্দব পরিবেশ তোমার ভাল লাগছে না? কলকাতাতে মাথা খুঁড়লেও এমন নির্মল জায়গা পাবে তুমি?'

—'নাহ, পাব না।' রাখির ঘাড় শক্ত হ'ল,—'তা সুন্দরবনে গিয়েও তো বাড়ি করা যায়। সেখানে প্রকৃতি আরও সুন্দর।... উঠোনে বাঘ-ভাল্লুক হামা টানবে। কুমড়ো-ডগায় সাঁপ ঝুলবে, তবে না নিজের বাড়ি!'

—'ভুল করছ। এ জায়গা ক'দিন পরে মোটেই এরকম থাকবে না।'

—'অসম্ভব। দশ বছরের আগে এখানকার কোন ডেভেলপমেণ্ট হতেই পারে না। কবে ইলেকট্রিসিটি আসবে, জলের ব্যবস্থা হবে...আমি বাজি ধরতে পারি...

—'বেশ তো।' শঙ্খ নরম হল, —'তখনই না হয় তুমি এসে বাড়ি করো। এখন যখন সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে, কিনে বাখতে ক্ষতি কি? কাঠা চারেকে কত সুন্দর মনের মত বাড়ি করা যাবে ভাবো তো।'

—'ভাল। এভাবেই ফাঁকা মাঠে কষ্টের টাকাগুলো ব্লক করে রাখো আর বাড়িঅলাদের তোয়াজ করতে করতে কাটিয়ে দাও জীবনটা।'

এ কথার পিঠে কথা হয় না। শঙ্খ চুপ করে গেল। প্রচণ্ড দাপটে একটা ডাউন ট্রেন ছুটে যাচ্ছে চোখের ওপর দিয়ে। শিশু প্ল্যাটফর্ম দুটো ধুকধুক কেঁপে উঠল। গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই চতুর্দিকে ধুলোঝড়। রাখি নাকে আঁচল চাপা দিল। অনেকক্ষণ পর দুটো জাগন্ত মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছে। স্টেশনের ঢাল বেয়ে আধাশহুরে দু'জন লোক উঠে আসছে প্ল্যাটফর্মে। তাদের বিস্মিত চোখ শঙ্খ-রাখির দিকে। যেন এরকম দিনে স্টেশনে কাউকে দেখবে ভাবেনি। শঙ্খ তাদের দিকে গটগট এগিয়ে গেল, —'দাদা, এরপর কোন গাড়ি দাঁড়াবে?'

ধুতিপরা লোকটি বগল থেকে ছাতা নামাল,—'কোনদিকে যাবেন?'

যেন রাখি শুনতে পায়, সেভাবে গলা চড়াল শঙ্খ, —'কলকাতায়।'

—'এখন কলকাতায়?' পাশের লোকটি আরও অবাক, —'যখন তখন দুর্যোগ নামতে পারে...'

শঙ্খ শুকনো হাসল, —না, না। যাব না—ফিরব।'

—'এখন তো গাড়ি নেই। ক্যানিং থামবে সেই বারোটা পাঁচে।...তবে হেঁটে যদি সোনারপুর চলে যেতে পারেন...'

শঙ্খ ঘড়ি দেখল। এগারোটা বাজতে পঁচিশ। তার মানে দেড় ঘণ্টার কাছাকাছি। আকাশ নেমে এসেছে আরও। একটু আগেও ঝিমঝিম আলো ছিল, আর এবার বোধহয় বৃষ্টিকে ধরে রাখা গেল না। লোক দুটো প্ল্যাটফর্ম বেয়ে নেমে যাচ্ছে। ভুল। ওরা ট্রেন ধরতে আসেনি। রাখি সরে দাঁড়িয়েছে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ফোলডিং ছাতা বার করেও রেখে দিল। শঙ্খর হঠাৎ খুব মনখারাপ হয়ে গেল। কি দরকার ছিল অযথা ঝগড়া করার? প্রতিদিন একই কথা ছোঁড়াছুঁড়ি...? শঙ্খ সামনের বেঞ্চিতে বসে পড়ল। সোনারপুর অবধি এখন আর হেঁটে যাওয়া যায় না। রাখি হাঁটতেও পারবে না অতটা। এবার একটা আপ ট্রেন পাশ করছে। অনেক দূর চলে যাওয়ার পরও তার ধাতব রেশ শুনতে শুনতে শঙ্খ মত বদলে ফেলল। মরুক গে যাক, এখানে কিনবেই না জমি। ঘর বাঁধা নিয়েই যদি স্বামী-স্ত্রী একমত না হতে পারে...

শঙ্খ যখন এভাবেই বিমর্ষ, তখনই আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটে গেল। বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটা রাখির শরীরকেই ছুঁলো আগে। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কেমন আলুথালু হয়ে গেল রাখির মনটা। বৃষ্টির সম্ভাবনা আর বৃষ্টি আসা এ দুটোর মধ্যে এত তফাত! রাখি আকাশের দিকে চোখ তুলল। আবার একটা ফোঁটা ঝরল। আরও একটা। চোখ নামিয়ে রাখি শঙ্খর দিকে তাকাল। আচমকা ভেতরে একটা গোলমাল বেধে গেছে। একটু আগের ক্ষোভ, বিষাদ সব যেন ধুয়ে যেতে চাইছে। বৃষ্টি আর মাটির মিলনে বুনো সুখের গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে। শঙ্খ উঠে দাঁড়ানোর আগেই তার কাছে ছুটে গিয়েছে রাখি,—'এই ওঠো, উঠে পড়ো।'

শঙ্খ উঠে ফিরে দাঁড়াল। টিকিটঘরের দিকে যাচ্ছে।

—'ওদিকে নয়।' পিছন থেকে টানল রাখি, —'ওইদিকে চলো। তোমার পছন্দ করা জমিতে—মাটিতে।'

রাখির স্বরে কি ব্যঙ্গ? শঙ্খ বুঝতে পারছিল না। চোখদুটো তবে ঝিকঝিক হাসে কেন? মেয়েদের মনের রঙ কখন কিভাবে যে বদলায়। বৃষ্টির ফোঁটারা ঘন হচ্ছে ক্রমশ। শঙ্খ নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল,—'ধূর! রোববারের সকালটাই মাটি হয়ে গেল। এমন জানলে কোন শালা...ওদিকে ছেলেমেয়ে দুটোও হয়ত না খেয়ে বসে থাকবে...'

—'থাকবে না।' চাপা অস্থিরতায় গলা কাঁপছে রাখির,—'আমি আশার মাকে ওদের খাইয়ে দিতে বলেছি।'

—'লন্ড্রী থেকে জামাকাপড়গুলো আনা হ'ল না...দুপুরে বাবুলের অ্যাডমিশানের জন্য ব্যানার্জিবাবুর কাছে যাওয়ার কথা ছিল...কেরোসিনও ধরা হ'ল না মাঝখান থেকে...'

মেঘে মেঘে যুদ্ধ বেধে গেছে। এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল আকাশ যেন শুধু

ধমকেই থামিয়ে দেওয়া যায় বৃষ্টিকে। রাখি শঙ্খর হাত চেপে ধরল,—'কথা বোলো না। তাড়াতাড়ি চলো।'

—'কোথায় ?'

—'বললাম তো আমাদের জমিতে...ঝড়ে. বৃষ্টিতে...' শঙ্খ ফ্যালফ্যাল তাকাল। রাখির কথাগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ঝোড়ো হাওয়ার তালে নাচছে বৃষ্টি। রাখি আচমকা সেদিকে ছুটে গেল। ছুটতে ছুটতে নেমে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম বেয়ে।

—'আরে কি হ'ল ?' শঙ্খ হতচকিত,—'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ? এই রাখি...এই .মিছিমিছি ভিজছ কেন ?'

রাখি উত্তর দিল না। ঝমঝম বৃষ্টি মাথায় একেবারে খালপাড়ে চলে গেছে।

শঙ্খও এক ছুটে পৌঁছে গেল সেখানে,—'কী আজব খেয়াল মাথায় চাপল, অ্যাঁ ?'

রাখি শুনেও শুনল না। প্রকাণ্ড আকাশ জুড়ে নাচছে হিসহিস বিদ্যুৎ। সেদিকে চোখ ভাসিয়ে দিয়েছে,—'জানো. সেদিন না আনোয়ার শাহ রোডের দিকে গিয়েছিলাম। তোমাকে বলিনি। ...আমাদের সেই ফ্ল্যাটটায় না লোক এসে গেছে !'

টাপটুপ জল গড়াচ্ছে রাখির চুল বেয়ে, কপাল বেয়ে। শঙ্খ ওর হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে ছাতা বার করতে চাইল।

—'নিশ্চয়ই সেই ডাক্তারটা কিনেছে, তাই না ? রাখির চোখ থেকে বৃষ্টি ঝরল, —'অথচ ফ্ল্যাটটা প্রথমে আমাদের নামে অ্যালটেড হয়েছিল। বাড়তে বাড়তে শুনলাম দু'লাখ আশিহাজারে বিক্রি হয়েছে।'

হাওয়াতে ছাতা উলটে পালটে যাচ্ছে। শঙ্খ প্রাণপণে সোজা রাখার চেষ্টা করছে সেটাকে। রাখি দেখেও দেখল না,—'ওরা প্রথমে যা এসটিমেট করে, তা আর কিছুতেই ঠিক রাখে না। নইলে বলো দেড়লাখ টাকার ব্যবস্থা তো আমরা করেছিলাম। আশি হাজার লোন... আমার গয়না...তোমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড...'

রাখির গলা ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। ভয়ংকর শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। মেঘেরা প্রায় ঘিরে ফেলেছে দু'জনকে। খানিক তফাতে, বাঁপাশে কারা আধখানা ঘর বানিয়ে ফেলে রেখে গেছে। হয়ত শেষ করতে পারেনি। ঘর নয়, ঘরের খাঁচা। একটা গরু ভীষণ ভয় পেয়ে লাফাতে লাফাতে আশ্রয় নিতে যাচ্ছে খাঁচাটার দিকে। যেন ওখানে পৌঁছলেই বাঁচা যায় তাণ্ডবের হাত থেকে। রাখি সেদিকে তাকিয়ে খিলখিল হেসে উঠল বাচ্চা মেয়েদের মত। লাফিয়ে বাঁশের সাঁকো পার হ'ল। আবার বাজের শব্দ। শঙ্খ এবার ভয় পেয়ে গেল,—'কী পাগলামি করছ রাখি ? এসো—ফিরে চলো।'

রাখি তাকাল না। হাওয়ায় হাওয়ায় দুলে বৃষ্টি ছুটছে পূবদিকে। সেই বৃষ্টিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল,—'বাড়িঅলা কাল কি বলছিল জানো ? বলে ছেলের বিয়ে দেবে। ওদের আর ওপরের ঘরে কুলোচ্ছে না। শীগগির মনে হয় আমাদের উঠে যেতে বলবে।' বলতে বলতে জোরে হেসে উঠল,—'বাজে কথা! বাড়িঅলা মাত্রই ভাড়াটে ওঠাতে ও কথা বলে। আমরা চলে গেলে আবার বেশি ভাড়া, আবার মোটা অ্যাডভান্স...শিবুদালাল মাঝেমাঝেই আজকাল যাতায়াত করছে...' বৃষ্টির সঙ্গে রাখি ছুটে চলেছে পাল্লা দিয়ে।

কখনও আগে, কখনও পেছনে,—'এই, তোমার মনে আছে আগের বাড়িঅলা কিরকম কায়দা করে...ইস, জল নিয়ে ওরা কষ্ট দিয়েছিল খুব। আর প্রথম যে বাড়িটায় ছিলাম...সেই যে গো ঢাকুরিয়ায়...তিনঘর ভাড়াটের কমন বাথরুম...'

চরাচরে বুঝি রাত নেমে আসছে। কামরাবাদের দিক থেকে এদিকের বৃষ্টিকে তাড়া করে আরেক দল বৃষ্টি ঝাপটে এল ছিপছিপ শব্দে। শূন্য মাঠে ঝড়ের শব্দ কী ভয়ংকর। শঙ্খ দু'হাতে কান চাপল। রাখি কেমন অনায়াস ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে। যেন আজই সমস্ত গ্লানি আর হতাশা ভাসিয়ে দেবে জলঝড়ে। খুব নিচু দিয়ে একটা কাক উড়ে গেল। রাখি পা থেকে চটিজোড়া খুলে ছুঁড়ে দিল দূরে। এমন তরতর হাঁটছে যেন এ পথে রোজই আসা-যাওয়া। শঙ্খর বুক কেঁপে উঠল। বৃষ্টির ধোঁয়ায় রাখিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। নিজের বউকেই এই মুহূর্তে কেমন অলৌকিক লাগছে। যেন মানবী নয়। যেন বৃষ্টি কিম্বা আকাশ মাটি। আবছায়া হাতড়ে শঙ্খ চিৎকার কবে বলতে চাইল—দোহাই রাখি, এবার ফেরো। মাথায় যখন তখন বাজ ভেঙে পড়তে পারে।—কিছুই বলতে পারল না। বৃষ্টির ধোঁযায় শব্দরা হারিয়ে গেছে। সেই ধোঁয়াতে আবছা রাখিও। প্রকাণ্ড মাঠে ভাসছে শুধু অশরীরী নারী। শঙ্খর পছন্দ করা ভূমিতে নিজেকে ছড়িয়ে দিল। একটা জমি দখল করে অন্য জমিতে যাচ্ছে। তারপর আবার একটায়। আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। এবার বুঝি ধারণ করে নেবে আকাশটাকেও।

শঙ্খ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল। রাখি যেন ভাবেভঙ্গিতে বলতে চাইছে,—ভয় কিসের গো ? ঝড় তো নিত্যি উঠছে। বাজও পড়ছে। শুধু হঠাৎ এই কুড়িয়ে পাওয়া বৃষ্টিটা...এই বৃষ্টিটা...

ভাবতে ভাবতে শঙ্খও দু হাত বাড়িয়ে দিল আকাশেব দিকে। পুরনো ছড়াটার মানে খুঁজে পাচ্ছে যেন—...ঝড়বাদলে ধূ ধূ মাঠে...।

ঘুমন্ত ভয়

ঘুমের মধ্যেই শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল সুপ্তি। ডাইনিং স্পেসে কে যেন এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছে। আচমকা শব্দটা জোর হতেই তন্দ্রা কেটে গেল। কে। কে। কে যেন ধাক্কা খেলো ফ্রিজে! সুপ্তি কান খাড়া করে রইল। পা ঘষে ঘষে কেউ রান্নাঘরের প্যাসেজের দিকে যাচ্ছে। আবার ফিরল। হুড়মুড় করে চেয়ার পড়ার আওয়াজ। স্টিলের গেলাস গড়িয়ে গেল। তীব্র আতঙ্কে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল সুপ্তির। মশারির চালে ফেলা বেডসুইচ খুঁজল এলোপাথাড়ি। সভয়ে ধাক্কা দিল মৃন্ময়কে, —এই শুনছ? তাড়াতাড়ি ওঠ—ওঠ না!

মৃন্ময় ক্লান্তিহর গভীর ঘুমে অচেতন।

মশারির চাল বারকয়েক খামচানোর পর সুপ্তি সুইচ পেল হাতের মুঠোয়। উজ্জ্বল আলোয় মনে সাহস ফিরল কিছুটা। কাঁপা গলায় চিৎকার করাব চেষ্টা করল,—কে-এ-এ? কে ওখানে?

আর শব্দ নেই। আগন্তুক থমকেছে বোধহয়। সুপ্তি মৃন্ময়কে খামচে ধরল,—শোন না... এই... ওঠ না...

কয়েকবার ঝাঁকুনি খেয়ে তবে মৃন্ময় জাগল, —কী হয়েছে?

—কে যেন আওয়াজ করছে বাইরে—শোন!

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা চেয়ার পড়ার শব্দ।

মৃন্ময় ধড়ফড় করে উঠে বসল বিছানায়,—কিসের আওয়াজ?

—বুঝতে পারছি না। অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে।

—ইঁদুর বেড়াল কিছু ঢুকেছে বোধহয়।

—কী করে ঢুকবে? চারদিক তো বন্ধ।

—তাই তো!

দুহাতে মশারি তুলে মৃন্ময় নামল খাট থেকে। পিছন পিছন সুপ্তি। বেড়াল না পারলে, মানুষই বা পারবে কী করে! ঢুকতে গেলে জানলার কাঠ গ্রিল সব ভাঙতে হবে আগে। এক যদি বাথরুমের স্কাইলাইট দিয়ে...

শোবার ঘরের পরে ডাইনিং স্পেস। উল্টোদিকে তুতু-মিতুর ঘর। এপাশে ড্রয়িংরুম। ড্রয়িংরুমের মুখোমুখি সরু প্যাসেজ, রান্নাঘর, বাথরুম। একেবারে কমপ্যাক্ট ফ্ল্যাট। কোনভাবেই কারুর ঢোকার উপায় নেই, যদি না বাইরের দরজা খোলা থাকে।

ডাইনিং স্পেসের আলো জ্বালিয়ে ভালভাবে দেখল মৃন্ময়। কেউ নেই তো! ড্রয়িংরুম খুঁজে প্যাসেজের দিকে গেল। নাহ্, কারুর চিহ্ন নেই কোথাও। রান্নাঘর দেখল, বাথরুম—দরজা-জানলা ভালভাবেই বন্ধ। তবে!

চারদিকে ঘুরে মৃন্ময় ডাইনিং স্পেসে ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে যখন, সুপ্তিই আবিষ্কার করল মেয়েটাকে। কাচের বাসন রাখার আলমারিটার পাশে, দেওয়াল আর আলমারির মধ্যবর্তী ফালি কোণাটুকুতে গুটিসুটি মেরে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে।

আরে এর কথা তো এতক্ষণ খেয়াল হয়নি! সবে কাল দুপুরে এসেছে বলেই হয়ত মেয়েটার অস্তিত্বের কথা ঘুমচোখে ভুলে গেছে দুজনেই। কিন্তু এখানে এল কী করে! ওকে তো শুতে দেওয়া হয়েছিল বাথরুম-রান্নাঘরের সামনের প্যাসেজটায়! একজন শোওয়ার পরেও ওখান দিয়ে যাতায়াত করতে তেমন অসুবিধে হয় না। প্রথম রাত বলে মশারি দিতে পারেনি, ঠিক করেছিল পরে যা হোক ব্যবস্থা করে দেবে।

সুপ্তি মৃণ্ময় মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কয়েক মুহূর্ত। সুপ্তিই এগিয়ে গেল দুপদাপ। উবু হয়ে বসে পড়ল মেয়েটার সামনে,—এই ভাদুরি... অ্যাই... কিরে... এখানে এভাবে ঘুমোচ্ছিস কেন?

অবিরাম ধাক্কায় চোখ খুলল মেয়েটা। বোবা ঘুমন্ত চোখ উদ্দেশ্যহীনভাবে সুপ্তির মুখের ওপর ঘুরল দু'চার সেকেণ্ড। আবাব বন্ধ হল। কাঠির মত সরু শীর্ণ ঘাড় ঝুলে পড়ল বুকের ওপর।

—এই ওঠ—উঠে পড়! নিজের জায়গায় গিয়ে শুবি যা।

মেয়েটার নিশ্বাস ঘনতর হল।

—ওঠ রে। এই ভাদুরি? ভাদুরি? বিছানায় শুবি, যা।

সুপ্তির স্বর সামান্য নরম এবার। মেয়েটা চোখ বন্ধ করেই উঠে দাঁড়াল। বন্ধ চোখেই মাতালের মত এগোল কয়েক পা।

মৃণ্ময় হাঁহাঁ করে উঠল,—পড়ে যাবি যে! চোখ খুলে হাঁট!

ভাদুরি চোখ খুলল না। সেভাবেই ঘাড় ঝুলিয়ে, টলমল পায়ে ঠিক পৌঁছে গেল প্যাসেজে। নিজের বিছানার কাছে। সতরঞ্চিতে দু'হাঁটু মুড়ে কুঁকড়েমুকড়ে শুয়ে পড়ল। কী যেন বললও বিড়বিড় করে। বোঝা গেল না। বলতে বলতে তলিয়ে গেছে গাঢ় নিদ্রায়।

ঘরে ফিরে সুপ্তি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল,—বাবাঃ, যা ভয় পেয়েছিলাম...

মৃণ্ময় জল খেয়ে ঢুকে পড়ল মশারির ভেতর।—আশ্চর্য! ও বিছানা ছেড়ে ওখানটায় গিয়ে শুয়েছিল কেন বল তো?

—মশাটশা কামড়াচ্ছে বোধহয়। মৃণ্ময় বড় হাই তুলল।

—যাহ্। এমন কিছু মশা নেই। দেশে যেন ওরা কত মশারির ভেতর শোয়!

—কী করে জানলে শোয় কিনা?

—জানি। সুপ্তির সামান্য ঝাঁঝ এল গলায়,—কালকের আগে ট্রাংক থেকে পুরোনো মশারি বার করতে পারব না।

মৃণ্ময় আর জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে শুল।

সুপ্তি বসেই রইল,—আমার মনে হয় ভয়টয় পেয়েছে... নতুন জায়গা... প্রথম রাত তো... বাড়ির সকলকে ছেড়ে...

—হতে পারে। মৃণ্ময় পাশবালিশ জড়াল আয়েস করে,—ভাল করে খোঁজটোজ নিয়ে নিয়েছ তো?

—হুঁ। সুপ্তি একটু অন্যমনস্ক যেন। মেয়েটা ডাইনিং স্পেসে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঘুরছিল না তো! না, না, তাহলে ওভাবে ঘুমিয়ে পড়বে না। ছেলেমানুষ মেয়ে...

শোবার সঙ্গে সঙ্গে মৃণ্ময় ঘুমিয়ে পড়েছে। সুপ্তির ঘুম এল না অনেকক্ষণ।

দুপুরবেলা। সবে তখন একটু গড়িয়ে নিচ্ছে, তিনটে নাগাদ উঠে মিতুকে স্কুল থেকে আনতে যাবে, তখনই মেয়েটাকে নিয়ে এল নিমাই-এর মা।

—বৌদি, তুমি রাতদিনের লোক খুঁজছিলে! এই নাও, তোমার জন্য নিয়ে এলাম দেশ থেকে।

—ওমা এ তো একেবারে বাচ্চা! এ কী কাজ করবে?

—বাচ্চা কিগো? এই ভাদ্দরে বাবো পুরে তেরোয় পডেছে। নিমাই-এর মা চোখ ঘুরিয়েছিল,—গরিবের ঘরে তেমন খাওয়াদাওয়া জোটে না তো! এক বেলা খায় তো এক বেলা উপোস—বাড় আসবে কোথথেকে?

—যাহ, তেরো কী বলছ?

—হ্যাঁগো বৌদি, বিশ্বেস করো। আমার জ্ঞাতি দেওরের মেয়ে। একে নিয়ে মোট ছটা মেয়ে দেওরের। শেষে এক ছেলে। তা এ ধরো গিয়ে তিন নম্বর। আগের দুটোর এখনও বিয়ে দিতে পারেনি। দেবে কোথথেকে? নিজেদেরই পেছনেব কাপড় নেই। যেটুকুন জমি ছিল, তা এব মা রোগে পড়তে সেটুকুনও গেছে। দিনমজুর খেটে বাপ একদিন আয় করে তো দুদিন বসা। বড় কষ্টে আছে গো—নিত্যি অভাব, নিত্যি যাতনা। এবার দেশে গিয়ে দেখি ঘরে ঘরে সব...

হাত-পা নেড়ে নেড়ে দেশগ্রামের দুঃখ-অভাবের কাহিনী শোনাচ্ছিল নিমাই-এর মা। মেয়েটা তখন জড়সড় হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে। খসখসে কালো গায়ের রঙ। প্যাঁকাটির মত সরু হাত-পা। একমাথা চুল, রুক্ষ লালচে জটলা মতন। ঢলঢলে মোটা ছিটের ফ্রক পরনে। বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আছে এতটুকুন এক পোঁটলা। নিমাই-এর মা'র কথার ফাঁকে মেয়েটাকে আলগোছে দেখে নিচ্ছিল সুপ্তি। এত রোগা যে মনে হয় শরীব গড়তে গিয়ে হাডেব খাঁচায় শুধু চামড়া জড়িয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর। শিখিয়ে নিলে এদের দিয়েই অবশ্য কাজ করানো যায়।

—কাজটাজ সব করতে পারবে তো, দ্যাখো।

—কেন পারবেনি? একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে...

—কত দিতে হবে?

—সে তুমি বিচের করে যা দেবে তাই।

—তবু তুমি বলো!

—একশো দিও।

—ওরেঃ বাবা! একশো! অত আমি দিতে পারব না। তার ওপর আনকোরা একেবারে। সব শেখাতে হবে। পারবে কিনা তাও জানি না। সুপ্তি মাথা নেড়েছিল, —এখন সত্তরের বেশি পারব না।

—বেশ, তাই দিও। তবে আর কটা টাকা বেশি দিলে পরিবারটার বড় উপকার হত গো। বড় কষ্টে আছে সব। সাধ করে কি আর কেউ নিজের মেয়েকে দূর বিদেশে খাটতে পাঠায়?

সুপ্তি আবার ভালভাবে জরিপ করেছিল মেয়েটাকে, —কী রে? সব কাজ করতে

পারবি তো? খাবার জল আনা, মশলা করা, ঘরদোর ঝাড়া, টুকটাক ফাইফরমাস... পারবি তো?

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার চিবুক প্রায় বুক ছুঁই-ছুঁই।

—নাম কী তোর?

উত্তর নেই।

—কী রে, নাম বলবি তো? নিমাই-এর মা ঠেলা দিয়েছিল—লজ্জা কিসের? মামীর কাছে ভাল হয়ে থাকবি...কথা শুনবি.. দেখবি তাইলে কত কিছু দেবে মামী... জামা, প্যান, চুড়ি... না জিগিস করে কিছুতে যেন হাত দিবি নি। বদনাম যেন না হয়...

মেয়েটার চোখ ছাপিয়ে তখন অঝোরে জল নেমেছে। শব্দহীন গাঢ় কান্না। সুপ্তির মায়া হয়েছিল। আহা, কতটুকুন একটা মেয়ে, তুতুর সমবয়সী প্রায়, বিদেশবিভূঁইযে একা একা চাকরি করতে এসেছ। তুতুটা এখনও এক রাত্তিরও সুপ্তিকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতেও শেখেনি। স্কুল যাবার সময় জামা-জুতো এগিয়ে দিতে হয়।

সুপ্তি পাশ ফিরে শুল। একটা রাতদিনের লোকের বড় দরকার ছিল। একা হাতে সব সামলে ওঠা যায় না। শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে কদিন লাগবে ঠিকই, মনে হয় শিখে যাবে। বেশ তো রুটি বেলে দিল সন্ধেবেলা। তবে হ্যাঁ, একটু চোখে-চোখেও রাখা দরকার। গেঁয়ো ভূত হোক আর যাই হোক, এভাবে রাতবিরেতে উঠে খাবার ঘরে ঘুরে বেড়াবে এটাও ঠিক না। কালই মশারির ব্যবস্থা করতে হবে একটা।

মশারির ব্যবস্থা হলেও সমাধান কিন্তু হল না। দুদিন পরেই মাঝরাতে আবার শব্দ ডাইনিং স্পেসে। খটাখট চেয়ার পড়ার আওয়াজ। সুপ্তির সঙ্গে মৃণ্ময়েরও ঘুম ভেঙেছে আজ।

—মেয়েটা আবার উঠে এসেছে মনে হচ্ছে? বিছানা ছেড়ে?

—তাই তো মনে হচ্ছে। কী ব্যাপার বলো তো?

—বাইরের দরজায় তালা বন্ধ করেছ?

—বাইরের দরজায় আবার কবে তালা লাগাই আমরা?

—লাগিও না, টের পাবে একদিন। মৃণ্ময় চিত হয়ে শুল, আমাদের অফিসের চক্রবর্তীর কী হয়েছিল জানো তো? কাজের লোক রাতারাতি নিঃশব্দে গোটা বাড়ি একেবারে সাফ করে দিয়ে...

—যাহ্। ও ওসব কিছু করবে না। মুখ দেখলে বোঝা যায়।

—ভাল। মৃণ্ময়ের স্বরে হালকা ব্যঙ্গ, —এখন দ্যাখো উঠে কী করছেন তিনি!

সুপ্তি পর্দা সরিয়ে ডাইনিং স্পেসে এল। অন্ধকার ছমছম করছে চারদিকে। দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে আলো জ্বালল। টেবিলের বুকে তুতুর চেয়ারটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে—টেবিলে এঁটো থালা, বাটি, গেলাস। টিটিক্‌টিক শব্দ করে ফ্রিজটা চলে উঠল। নির্জনতায় শব্দটা এত বেশি কানে লাগে। এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই কাচের আলমারির পাশটা দেখল। নেই তো! পা টিপে প্যাসেজে এল। বিছানা খালি। আধো

অন্ধকারেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। গেল কোথায়! অকারণে ফ্রিজ খুলে বন্ধ করল একবার। বাথরুমে গেছে? বাথরুমের দরজা তো খোলা। দ্রুতপায়ে বাইরের ঘরে এল। আলো জ্বালিয়ে শ্বাস ফেলল বড় করে। নিশ্চিন্ত। বাইরের দরজা বন্ধ—ছিটকিনি, খিল দুটোই তোলা। মেয়েদের ঘরে গিয়েছে কি? ঠিক, যা ভেবেছিল তাই। তুতু-মিতুর খাটের সামনে আবছায়ায় অশরীরী আত্মার মত দাঁড়িয়ে স্থির।

—এই ভাদুরি, এ ঘরে কী করছিস?

চিৎকারেও ছায়া নড়ল না একটুও। সুপ্তি আলো জ্বালল। তুতু-মিতু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদের বিছানার সামনে দাঁড়ানো ভাদুরিও ঘুমন্ত। এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা! সত্যি ঘুমোচ্ছে না কি ভান! কী মতলব আছে! সুপ্তির সন্দিগ্ধ চোখ নিষ্পলক। আশ্চর্য, সত্যিই তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। আলতো ঠেলা দিতেই চমকে তাকাল। পরক্ষণে চোখ বন্ধ। জড়ানো স্বরে কী যেন বলছে বোঝা যাচ্ছে না। সুপ্তি মেয়েটার কাঁধ ধরে ঠেলা দিল,—কী বলছিস? কী হয়েছে তোর?

বাক্যগুলো স্পষ্ট নয়। স্খলিত কটা শব্দ শুধু বোঝা গেল,—বিছানা... গদি... হাওয়া... মা... আদর...

—খুব হয়েছে। যা নিজের জায়গায় যা। সুপ্তি হাত ধরে টানল।

অবিকল আগের দিনের মত শূন্যদৃষ্টিতে মেয়েটা তাকিয়ে রইল কয়েক পলক। তারপর চোখ বুজেই টলতে টলতে ফিরে গেল প্যাসেজের দিকে। সেদিনের মতোই।

ঘরে ফিরে, চিন্তিত মুখে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে রইল সুপ্তি। কী হয় মেয়েটার রাত্রিবেলা? এমনি তো সারাদিন দিব্যি চুপচাপ। খুবই শান্ত। কাজ শেখার আগ্রহও আছে।

—ও মামী, গ্যাস কী করে ধরায় গো?

—জলের বোতলগুলো ফিচে তুলে দেব মামী? নিচের তাকে?

ভাষায় যে কত অপভ্রংশ শব্দ! কতরকম বর্ণবিপর্যয়! তুতু হেসে কুটিপাটি যায়,--ফিচ নারে ভাদুরি, ফ্রিজ বল্। ফ্রি-ই-ই-জ।

মিতু শেখায়, —স্যালাশ নয়, স্যালাড!

ভাদুরি প্রাণপণে অনুকরণের চেষ্টা করে। রোগা মুখের কালো দুই চোখ তারার মত জ্বলতে থাকে তখন। তুতু-মিতুর সঙ্গে ভাবও হয়েছে বেশ। ফাঁক পেলেই ওদের সামনে ঘুরঘুর করে। ওরা পড়তে বসলে মাটিতে বসে বাবু হয়ে,—আমিও পড়তে জানি।

ছোট্ট মিতু উৎসাহিত হয়,—সত্যি? পড় তো এটা কী?

ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে অক্ষরটাকে দেখে তখন। পুরোনো পরিচিত কাউকে চিনে নেওয়ার মত, —এটা হল চ'এ আকারে চা, মুরধোনো ষ'এ আকারে চা-চাষা।

—রাইট্। অ্যাবসোলিউট্লি রাইট্। তুই স্কুলে পড়েছিস কখনও?

—হুঁ। কেলাশ থিরিতে উঠেছিলাম। তারপর ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন?

—আমরা যে বড় গরিব। ইস্কুলে গেলে ঘরের কাজ কে করবে? দিদিরা যায় বাইরে খাটতে, মাকে কে দেখবে? ভাইবোনদের কে দেখবে?

—এখন তাহলে কে দেখছে তাদের?

একথার উত্তর বোধহয় ভাদুরির জানা নেই। চুপ করে থাকে।

তুতু টিচারের মত মুখ করে, —ঠিক আছে। এবার থেকে আমার কাছে পড়বি তুই। আমি তোকে ইংলিশ শিখিয়ে দেব।

ঠিক তখনই সুপ্তি হয়ত ডেকে ওঠে,—ভাদুরি এদিকে আয়, দুটো পেঁয়াজ কুচিয়ে দিয়ে যা তো দেখি।

বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে আসে মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে মন দিয়ে নিখুঁতভাবে কাজ করার চেষ্টা করে। সব ঠিক ঠিক মনোমত হয় না সুপ্তির। না হোক, কাজে সাহায্য তো হয়—তাই অনেক। আস্তে আস্তে দক্ষ হয়ে যাবে।

সুপ্তি ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে বিছানায় ফিরল। সবই ঠিক আছে। শুধু মেয়েটা রাত্রে কেন যে ওরকম! কী সব বিড়বিড়ও করছিল! মেয়েদের ঘরে গিয়ে কেন দাঁড়িয়েছিল? হিংসে করছে তুতু-মিতুকে? শুয়ে শুয়ে আপ্রাণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে সুপ্তি। তখন ভাদুরিকে দুধ দেয়নি বলেই কি...!

তুতু-মিতু তখন খেতে বসেছে টেবিলে। পাশে দাঁড়িয়ে ভাদুরি। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে সুপ্তি বকছে তুতুকে,—না, তোমাকে দুধ খেতেই হবে। খাও!

—প্লিজ মা, ভাল্লাগছে না!

—কোন কথা নয়। খেয়ে নাও। একটুও ফেলবে না।

তুতু অসভ্যর মত ওয়াক তুলল।

ভাদুরির হিন্দেলিয়ামের থালায় গোটাচারেক রুটি দিয়ে দিল সুপ্তি। সঙ্গে তরিতরকারি। এক টুকরো মাছও, —যা, তুই খেয়ে নেগে যা।

বাধ্য মেয়ের মত রান্নাঘরে যাচ্ছে ভাদুরি, চকিতে মিতু পাকার মত বলে উঠল, —ভাদুরিকে একটু দুধ দাও না মা।

মিথ্যে চোখ পাকাবার চেষ্টা করল সুপ্তি।

তুতুর চোখে অনুরোধ,—আমার থেকে দেব মা?

না'টা কি বেশি জোরে বলে ফেলেছিল সুপ্তি! তাই ভাদুরির অভিমান হয়েছে!

সুপ্তি পাশ ফিরে মৃণ্ময়কে ঠেলল,—শুনছ?

মৃণ্ময় জেগেই ছিল বোধহয়। এক ডাকে সাড়া মিলল,—কোথায় ছিল?

তুতু-মিতুর ঘরে। সুপ্তি ঢোঁক গিলল।

—কী করছিল?

—ঘুমোচ্ছিল। সেদিনের মতোই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

—মেয়েটা বোধহয় সমনমবুলিস্ট, বুঝলে! কিংবা সমনোএলোকোয়েন্ট।

—মানে?

—মানে ওই যারা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটে কিংবা কথা বলে...

—তারা কি খুব বিপজ্জনক?

—না, না। ওটা এক ধরনের ডিজিজ। মৃণ্ময় ছুঁল বউকে, —দেখাই যাক না আব কয়েকদিন। ঘুমিয়ে পড়ো।

দেখব বলা সহজ। সত্যি দেখা সহজ নয় মোটেই। ভাদুরি ধীরে ধীরে একটা জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে উঠেছে। সুপ্তির কাছে তো বটেই। মৃণ্ময়ের কাছেও। ইদানীং ঘুমন্ত অবস্থায় হেঁটে বেড়ানোর সঙ্গে কথা বলাও বেড়েছে। হঠাৎ হঠাৎ চিৎকারও করে ওঠে। খারাপ গালাগালি দেয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাত-পা ছোড়ে। সেদিন ড্রয়িংরুমে টিভিটা ভেঙে ফেলছিল প্রায়। সুপ্তি-মৃণ্ময় দুদিক থেকে ধবে রেখেও সামলাতে পারে না। তুতু-মিতু ভয়ে হতবাক।

—এই ভাদুরি. করছিস কী?

ভাদুরি তখন লাথি ছুঁড়ছে টিভিব দিকে, —গান... নাচ... যাত্রা...

সজোরে একটা থাপ্পড় কষিযে দিয়েছিল সুপ্তি। তাতেই কাজ হল। শূন্য দৃষ্টিতে দেখল খানিকক্ষণ, যেমন দেখে। তাবপর টলে টলে চলে গেল নিজেব বিছানায়।

মৃণ্ময় বিরক্ত ভীষণ—অনেক হয়েছে। তাড়াও এবার। কোথথেকে একটা পাগল জুটিয়েছে!

যথার্থই কি পাগল! যে মেয়ে সারাদিন অত ঠাণ্ডা, সে বাত্রে অমন হিংস্র হয়ে ওঠে কী করে। ঘুমেব ঘোরে। সকাল হলে নিজেই কিন্তু মনে করতে পারে না। সুপ্তি কতভাবে প্রশ্ন করে দেখেছে—না, বাতের আচরণ দিনে কিছুতেই স্মরণে আসে না ভাদুরির।

—সত্যি করে বল না, কেন অমন করিস?

ভাদুরি ফ্যালফ্যাল তাকায়।

—তুই কি আগেও এরকম ঘুমেব মধ্যে হাঁটতিস? কথা বলতিস?

—জানি না তো!

দিনকুড়ির মধ্যে বেশ কাজেকর্মে দক্ষ হয়ে উঠেছে ভাদুরি। সুপ্তিকে আর বলতে হয় না। পাকা গিন্নির মত নিজেই গুছিয়ে সব কাজ কবে। খেলা কবে তুতু মিতুব সঙ্গে। গল্প করে। সাজিয়ে কথা বলতেও শিখেছে,—জানো মামি. তোমাদের বান্না যেমন সুন্দর হয়, আমাদের তেমন হয় না। হবে কী করে বলো, তোমাদের মতো তেলমশলা পড়ে না তো। কী স্বাদ তোমাদের তরকাবিতে! কী সুন্দব বাস।

একদিন বলল, —ও মামী, আমাকে একটা তুতুদিদির পুরোনো সালোয়ার-কামিজ্ব দেবে?

দেবে বলেছিল সুপ্তি। তবুও কেন যে তুতুর নতুন কামিজটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ল ভাদুরি! ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে যেটুকু সময়, তার মধ্যে প্যাসেজের তারে ঝোলানো কামিজটাকে চারটুকরো করে ফেলেছে। ওইসব সময়ে কী ভীষণ যে শক্তি আসে মেয়েটার গায়ে! আরেকদিন রাতে আক্রোশ গিয়ে পড়ল মিতুর ড্রয়িংখাতা আর কমিকসগুলোর ওপর। ঘুমের ঘোরেই টেনে বার করেছে মিতুর টেবিল থেকে। মিতু জেগে উঠে কেঁদেকেটে একসা। ভাদুরির যথারীতি সকালে কিছুই মনে নেই,—আমি ছিঁড়েছি? এমা! কখন গো মামী?

সুপ্তি ভেংচে উঠেছিল,—জানো না যেন। ন্যাকামি কোরো না।

ব্যাস, তারপর সারাদিন কী করুণ মুখ মেয়েটার। কাচুমাচু মুখে একবার মিতুর কাছে ক্ষমা চায়, একবার সুপ্তির কাছে। মৃণ্ময় পর্যন্ত বলে ফেলেছিল,—থাক, আর কিছু বোলো না। মেয়েটা সত্যিই ডিজিজড। সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা দরকার।

অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত নিমাই-এর মাকেই খবর পাঠাল সুপ্তি। যাক বাবা, ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যাক। সুপ্তির একটু অসুবিধে হবে—কদিনেই অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে বেশ—তবু সুখের থেকে স্বস্তি ভাল।

ভাদুরি কাল চলে যাবে। রাতের আতঙ্ক কাল থেকেই শেষ। তবু কিছুতেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিযে পড়তে পারছিল না সুপ্তি। না, ঠিক ভাদুরির জন্যও সজাগ নয়, বুকেব ভেতরে কোথায় যেন একটা বিশ্রি অস্বস্তি! নিমাই-এর মা প্রথমটা সব শুনে একেবারে থ। বেশ কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে ছিল, তারপর ডাকল ভাদুরিকে,—কিরে, এরা যা বলছে সত্যি?

ভাদুরি ঠিক প্রথমদিনের মতই ঘাড় ঝুলিয়ে দিল। সেদিনের মতো হাঘরে চেহারা আর নেই। কদিন পেটভরে খেয়েটেয়ে বেশ চকচকে। জড়তাও নেই আগের মতো। তবু কেঁদে ফেলল টপটপ করে,—জানি না।

—জানি না তো এরা বলছে কেন?

—সত্যি জানি না। মেয়েটা ফুঁপিয়ে উঠল।

নিমাই-এর মা'র চোখমুখ আরও কঠিন তখন। ঘুরে তাকিয়েছে সুপ্তির দিকে, —মিথ্যে বদনামকে আমরা বড় ভয় পাই বৌদি। ও বলছে কিছু জানে না, এদিকে তুমি বলছ...

সুপ্তি রেগে উঠল ঝপ করে,—আমি কি মিথ্যে বলছি নাকি? তুমি বাপু কালই নিয়ে যাও একে, আমার দরকার নেই।

এরপর সারাটা দিন ধরে কী কান্না মেয়েটার! খেল না, দেল না—ভেজা-মুখে বসে রইল রান্নাঘরে। সুপ্তিও সাধাসাধি কবেনি। থাক যেমন আছে নিজের মনে। মিতুটাই স্কুল থেকে ফিরে গণ্ডগোল পাকিয়ে দিল সব,—কেন তোমরা ভাদুরিকে তাড়িয়ে দিচ্ছ মা? কেন ওকে ডাক্তার দেখালে না?

কিছুতেই বোকা মেয়েটাকে সামলানো যায় না। সুপ্তি মিথ্যে চোখ পাকাল,—সব সময় পাকা পাকা কথা বোলো না তো! যা বোঝ না...

মিতু তবু কেঁদে অস্থির,—তোমরা ভাল না, একটুও ভাল না।

ওইটুকুনি সাতবছরের মেয়ে কেন বলল ও কথা? ধুৎ! একটা পুঁচকে মেয়ের কথাকে এত পাত্তা দেওয়ার কোন মানে হয় না। তবু মনটা কেন খচখচ করে! কেন ভয় করে ভাদুরিকে—ভাদুরির অসুখকে! তবে কি...! ছটফট করতে করতে মৃণ্ময়কে ঠেলা দিল সুপ্তি,—এই শুনছ? শোন না...

—কী হল?

সুপ্তির স্বর কেঁপে গেল,—আমরা কি ভাদুরির চিকিৎসা করাতে পারতাম?

—আহ, ঘুমোও তো! মৃণ্ময় প্রচণ্ড বিরক্ত,—বাজে চিন্তা ছাড়ো!

—বলো না।

—না, পারতাম না। পৃথিবীসুদ্ধ লোকের চিকিৎসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়নি আমাকে। এবার ঘুমোও।

—ঘুম আসছে না।

মৃণ্ময় এবার এদিক ফিরল,--কী চাও তুমি বলো তো? শান্তি না অশান্তি?

—কেন?

—শোন, মৃণ্ময় আলতো হাত রাখল সুপ্তির পিঠে, মিছিমিছি মিতুর মতো মন খারাপ কোরো না। খারাপ আমারও লাগছে। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। মেয়েটা দিনে দিনে যা বেড়ে উঠছিল...

—এমনিতে কত শান্ত...

—হুঁ। ওরা এরকমই। কে যে কেমন... বলতে বলতে সুপ্তিকে কাছে টানল মৃণ্ময়, —তোমার অসুবিধে হবে ঠিকই, তবু কত নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে বলো তো! কাল আর রাত থেকে...

সুপ্তি কোন কথা বলল না। মৃণ্ময়ের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তেও মন পড়ে আছে বাইরের দিকে। আজ রাত্রে আরও ভয়ঙ্কর কোন প্রতিবাদ জানাবে কি ভাদুরি! শেষবারের মত!

নাহ! ভাদুরিকে তার নিজস্ব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল সময় থাকতে। তাতেই হয়ত মঙ্গল সকলের—সুপ্তির, তুতু-মিতুর—মৃণ্ময়েরও।

প্রতিবন্ধী

ছেলে বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি রে মা?'

'সে অনেক দূর। তোর দিদমার বাড়ি।'

'কী আছে সেখানে?'

'কত কী আছে...গাছপালা, পুকুর, ধানক্ষেত, দিনভর কতরকম পাখ-পাখালি।'

'হি হি. কী মজা! আমি তবে খুব খেলব সেখেনে। ঝাপঝুপ মাছ হয়ে ডুব দেব পুকুরে!'

'না বাপধন, না। জলে যেন একদম নামতে যেও নি। জলের নিচে জলরাক্ষস থাকে, সেই সেবার টান দিয়েছিল তোর পা ধরে...'

ছেলে নয়. যেন চোখ পাকিয়ে নিজেকেই ভয় দেখাচ্ছে চঞ্চলা। নিজের বাক্যে নিজেরই বুক অসাড়। ছেলের যে তার এতটুকু বোধগম্যি নেই—এতটা বয়স গেল এখনও জলস্থলের তফাত বুঝল না, কী যে শেষে আছে কপালে! দিনরাত চোখের পাতায় বেঁধে রাখতে হয়। সেদিনই তো কারখানার পুকুরটা গিলে ফেলত নেড়ুকে। ভাগ্যে পটলমিস্ত্রী সাঁতার দিচ্ছিল সেখানে! ঝুঁটি ধরে কোনমতে টেনে এনেছিল ডাঙায়। জল খেয়ে পেট জয়ঢাক। পাঁচপাড়ার মানুষ জড়ো পুকুবপাড়ে। তা বৃত্তান্তটা কী? না রবারের বল বুঝি ছিটকে গেছে জলে! তাই ধরতে ছেলে সটান জলের কোলে। রবারের বল হয়ে সে-ও যেন হাঁটতে পারে পুকুরে। ভাবতে ভাবতে সর্বশরীরে কাঁটা উঠল চঞ্চলার। এভাবেই বুঝি কবে মরে যায় নেড়ু। কপাল, কপাল, সব তাব পোড়া ভাগ্যের দোষ। নইলে সাত নয়, পাঁচ নয় একটাই নাড়িছেঁড়া ধন, তাও কিনা জড়বুদ্ধি হয়! বযসের তালে শরীরটুকুই যা ঝাড়া দিয়েছে ছেলের, মনেব বাড় আসেনি এতটুকু। কালো কোদাল দেহে ইয়া বড় এক মাথা. ড্যাবা চোখ মরা কাতল মাছের যেমন। জিভ নাড়লে ঠোঁট ভেঙে কষ গড়ায়। জন্ম থেকেই এরকম—নেলাখেপা মতন। একসময় নানা ওষুধপালা করেছিল—যে যা বলে করতে ছোটে। তাবিজ কবচ শেকড় জলপড়া কত কী! ছেলে নিয়ে কমদিন গোবরা হাসপাতালে ছোটেনি নেড়ুর বাপ! তো শেষে ডাক্তার বললে, এ রোগ নাকি সারার নয়। গর্ভকালেই এ রোগ ঢুকে যায় শিশুর মাথায়। সেই গর্ভদোষেই নেড়ু এরকম। শোনার পর বহু ভেবেছে চঞ্চলা। কার দোষে ছেলে এমন হল? বাপ না মা'র? ছেলে যখন জন্মায়, তখনও তো দিব্যি টগবগে জোয়ান ছিল নেড়ুর বাপ। তারপর কী কালরোগে যে ধরল তাকে! দেখ না দেখ, তরতাজা শরীর শুকিয়ে পোড়াকাঠ। টানা তিনটে বছর বিছানা কামড়ে থেকে শেষে সেই শরীর রওনা দিল শ্মশানে। ঘরে তখন পড়ে শুধু একপাহাড় দেনা।

বাইরের এজমালি কলে নিত্যদিনের ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। চঞ্চলা আলগোছে জানলায় চোখ রাখল। আলো ফুটলেই রোজ এক দৃশ্য। আজকাল মানুষ মানুষকে কয়েক দানা সময় ছাড়তেও রাজি নয়। কে আগে জল ধরে তাই নিয়ে নিয়ত চিৎকার, মারামারি। রাধার মা কার বুঝি বালতি উলটে দিয়েছে। গবগব জল ছুটছে নালার

দিকে। এঁটো শালপাতার ঠোঙা মাড়িয়ে, কাদের ঘরের বাচ্চার নোংরা ভাসিয়ে, মটর-মেকানিকের দেওয়াল ছুঁয়ে এইমাত্র চলে গেল কাঁচা নালার গর্ভে। আচমকা মনে হয় কোনও কালকেউটে বুঝি হিসহিসিয়ে পাক দিল উঠোনটা। পাশের ঘরের নস্যিবুড়ি উনুনে আঁচ দিয়েছে। ঝাঁঝালো ধোঁয়া পিলপিল দৌড়ে আসছে এদিকে। নাহ, বুড়ির সঙ্গে কোঁদল করে আব পারা যায় না। সাঁঝসকাল এই জানলার ধারেই উনুন রাখবে। চঞ্চলা শব্দ করে টিনের পাল্লাদুটো বন্ধ করে দিল। নেড়ু একমনে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে মুড়ি চিবোচ্ছে। যত না খায়, ছড়ায় বেশি। টেবিলফ্যানের বাতাসে ডুমো ডুমো মুড়ি মাছিব মত নাচছে গোটা ঘর জুড়ে। চঞ্চলা ধমকাতে গিযেও নরম হল। আর বকে কী লাভ। ফেলেই যখন দিয়ে আসছে...

নেড়ু অবশ্য এখনও বোঝে নি কিছুই। বোঝাব মত মাথা থাকলে তো! চঞ্চলার বুক ডুবডুব করে উঠল। টের পেলেই ছেলে ধুন্দুমার বাধিয়ে দেবে। গলা কাঁপিয়ে এমন কান্না ধববে যে দশ ঘর মানুষ ভেঙে পড়বে ঘরে। হাবা হওয়ারও সুবিধে কিছু আছে। দুঃখব্যথা চাক বাঁধতে পারে না মনের খোলে। উথালপাথাল শোকতাপ হাউহাউ উগরে দেওয়া যায়। তবে বুঝি চঞ্চলা নেড়ুর থেকেও দুঃখী বেশি। এই যে বুকেব খাঁচায় আছাড়িপিছাড়ি কান্না এমন, তাব কথা আর জানতে পারে কে বা!

চঞ্চলার দুখিনী চোখ ছেলের শরীব ছুঁল, 'ওঠ বাপ, আর খেতে হবে নি। বেলাবেলি পৌঁছুতে হবে যে।'

হাত দুমড়ে শরীব ভাঙল নেড়ু, 'নতুন বাপ যাবে নি সঙ্গে?

'না। শুধু তুই আর আমি।'

ছেলে খুশিতে হাততালি দিল, 'সত্যি?'

'সত্যি।'

'তারপর দুজনেই থেকে যাব সেখেনে, তাই না? নতুন বাপ কিছুতেই খুঁজে পাবে নি!'

চঞ্চলা ঢোঁক গিলল। বুকটা ফের ডুবড়ব ডুবডুব। মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এল। তবে আজ থাক না হয়, আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যাক। এলোমেলো হাতে টুকটাক হাঁড়িকড়া নাড়ানাড়ি করল। নাহ. মনটাকে বাঁধা দরকার। উঠোনের গায়ে হুশহুশ বেড়ে উঠছে শিশু সকাল। আর দেবি করলে বোড়ালে ছেলে রেখে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। চঞ্চলা ঘরে ফিবে টিনের তোরঙ্গ খুলল। থমথম মুখে বার করল নতুন গোলাপরঙ সিল্কের শাড়ি। অঙ্কুর এবার পুজোয় দিয়েছে। নেড়ুকেও দিযেছে দু'সেট জামাপ্যান্ট। লোকটা মানুষ তো মন্দ নয়। যখন যা চায় এনে দেয়। মুখের কথা পড়ার আগে সুখ কিনতে ছোটে। সে থাকাতে দুঃখ-অভাবগুলো কোথায় যেন হাঁটা দিয়েছে। প্রাণের কত সাধআহ্লাদ মনভরে মেটানো যায়। শুধু নেড়ুটাই যদি একটু বুঝেশুনে থাকতে পারত! খরচাপাতি করে তোর জন্য বাইরের দাওয়া ঘিরে কেমন একখানা ঘর বানিয়ে দিল মানুষটা, ভাল ছেলের মতো সেখানেই থাক, তা নয় রাত বাড়লেই রোজ ধাক্কা!—'ওমা, দরজা বন্ধ করলি কেন? ও মা, খুলে দে।'

প্রথম প্রথম মোটেই রাগত না অঙ্কুর। নতুন বিয়ের গন্ধমাখা মুখে মিটমিট হাসত, 'আহা, অত করে ডাকছে...'

চঞ্চলা তখন সংকোচে গুটিয়ে এতটুকু, 'থাক। ডেকে ডেকে একসময় ঘুমিয়ে পড়বে'খন।'

পেটা শরীরের লোমশ মানুষ মুখ ঘষতো ওর খোলা বুকে। চঞ্চলার যুবতী অঙ্গে নতুন করে ফুল ফুটত। দুলত ঝিরঝির।

ছেলে জোরে জোরে ঘা দিত, 'ও মা, দরজা খোল,—আমার ভয় করছে।'

শেষে কতদিন অঙ্কুরই উঠে দরজা খুলেছে, 'আহা, বাপমরা ছেলে...ভয় পাচ্ছে। আসুক ঘরে। একবার ঘুমিয়ে গেলে আর তো জেগে দেখতে আসবে না।'

চঞ্চলাব গলা কাঁপত, 'যদি জাগে?'

'জাগলেও আঁধারে বুঝবে না কিছু।'

বুঝবে আবার না। দিনে যে ছেলে মাথামোটা, রাতে সে কেমন বুদ্ধিধর দেখ! আর কিছু না থাক, বুকভর্তি হিংসে আছে এত এত! দুদিন না যেতে ঠিক ঘুম থেকে উঠে বসেছে মেঝেতে।

'ওমা, তুই কোথায় চলে গেলি?'

সবে তখন লোকটা নতুন করে খুঁড়তে শুরু করেছে দেহটাকে। চঞ্চলা ক্রমশ বিবশ। রাতগভীরে পুরুষদেহের স্বাদই আলাদা। সে স্বাদ পৃথিবী ভোলায়। তুচ্ছ করে জগৎসংসার। তবু ভয় পেয়েছে চঞ্চলা। কুলকুল স্রোত নেমেছে শিরদাঁড়া বেয়ে। নেড়ু যেন নেড়ু নয়, রোগাভোগা নেড়ুর বাপ ছেলের গলায় ডাকছে অন্ধকারে।

আমাকে ফেলে কোথায় গেলি তুই?

কোথায় আর যাব! আমাকে নরকে ডুবিয়ে তুমিই তো চলে গেলে! নিজে তবু উপোস দিতে পারি, ছেলেটা বাঁচে কীভাবে? এদিক সেদিক খেটেখুটে যা হোক প্রাণধারণ করছিলাম, তাও কারুর সহ্য হল? পাওনাদাররা এসে ছিঁড়ে খেতে চায়। রাতবিরেতে কারা টোকা দেয় দরজায়, ফিসফিসিয়ে ডাকে। মৃত্যুঞ্জয় মাঝি একগলা মদ গিলে তো একদিন ঢুকেই পড়ল ঘরে। কোথায় যে তখন পালাই! পালাবার জায়গা আছে এই দুনিয়াতে? বোড়ালে গেলাম, দাদা বলল, 'আমাদেরই চলে না, তোদের খাওয়াব কী?'

কেঁদে পড়লাম, 'খাওয়াতে হবে নি। খেটে খাব। একটু শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই চাই।'

বউদি বলল, 'আমাদেরই বা থাকার জায়গা কোথায়? এক ফালি ভিটেতে এতগুলো কচিকাচা নিয়ে কোনমতে আছি...।'

ঝরঝরে বুড়ি মা'টা কেঁদে সারা, 'ওরে, আমাকে কে দেখে তার ঠিক নেই।'

'তবে তুমি আমার কাছে গিয়ে থাকবে চলো মা। ছেঁড়া-ফাটা যেমন হও, মাথার ওপর ছাতা তো হবে।'

'খেতে দিবি কী? তোদের মা-বেটারই পেট চলে না, তারওপর অত দেনা...এখানে তবু লাথিঝাঁটার সঙ্গে দু'মুঠো পান্তা পাই।'

'তাও বটে। তবে আমি কোথায় যাই মা?'

মেয়েমানুষ আর কোথায় যায়! ভগবানের দেওয়া এই শরীরখানা নিয়েই যত দুর্ভোগ। পেট কাঁদে, বুক কাঁদে, সর্বঅঙ্গ জুড়ে কান্না। পুরুষ-বিনা বয়সের মেয়ে ডাঙায় ছিটকে আসা মাছ যেন। খালি খাবি খায় আর লেজ ঝাপটায়। কাকচিলে ঠোকরাতে আসে।

নেড়ুর ভাঙা স্বরে তবু নেড়ুর বাপের হিংসে ঝরতেই থাকল, 'আমার কাছে চলে আয়, আয় বলছি।'

অঙ্কুরের গরম শ্বাস তখন বাষ্প হয়ে যাচ্ছে ঘাড়েমুখে। চঞ্চলা অন্ধকার হাতড়ে শাড়ি খুঁজল, 'একটু দাঁড়াও। ওকে ঠাণ্ডা করে আসি।'

এভাবেই একরাত, দুরাত—রাতের পর রাত। ক্রমে অঙ্কুরের মুখের হাসি নিবল। ছেলেটাকে এমন দুরদুর করে যেন সে ওই গলির মোড়ের ঘেয়ো নেড়িটা। আকণ্ঠ মদ গিলে ঘরে ফেরে। হল্লা জমায়। দেখে দেখে ঘাবড়ে গেল চঞ্চলা। লোকটা যদি দুম করে তাদের ফেলে চলে যায়। পুরুষমানুষের ভ্রমরার মন। ফুলে যদি মধুই না পেল, তবে সে ফুলে আর থাকা কেন? রাজ্যের রাগ গিয়ে পড়ল ছেলের ওপর। হায় রে কপাল, সুখের মর্ম বুঝলি না তুই! চারবেলা ভরপেট ভালমন্দ খাওয়া, সিল্কের জামাকাপড়, ইলেকট্রিকের আলোপাখা... যখন-তখন দমাদম রাগ আছড়ে পড়তে লাগল ছেলের পিঠে, 'মর মর, মরে যা।'

নবুর মা দৌড়ে এল, 'আহা. করিস কী? হাবা ছেলে কী বোঝে?'

চঞ্চলা কেঁদে ফেলল, 'কী করি এখন বলো দেখি? এ ছেলে নিয়ে...'

'শোন তবে বুদ্ধি দিই।'

'কী?'

'বলি ছেলেটাকে রেখে আয় তোর মায়ের কাছে। মাস গেলে থোক টাকা দিয়ে আসবি। সেই ফাঁকে চোখের দেখাও হয়ে যাবে। টাকা ছিটোলে সব দেখবি...'

প্রস্তাব মন্দ নয়। অঙ্কুরের আয় ভালো। সব দিক রাখতে এর চেয়ে ভালো পথ আর কোথায়?

অঙ্কুর শুনে প্রথমটা নিমরাজি. 'কাজটা কী উচিত হবে?'

'খুব হবে। কত মানুষের ছেলে তো বোর্ডিং-হোস্টেলেও থাকে।'

'তা থাকে। তবে তাদের ছেলে নুলোহাবা নয়।'

বুকের শ্বাস বুকে গিলেছিল চঞ্চলা। অঙ্কুরও মত দিয়েছিল শেষে।

ত্বরিত হাতে ঘরদোরের কাজ সারছে চঞ্চলা। সে ফেরার আগেই হয়ত ফিরে আসবে মানুষটা। দিন না ফুটতে বেরিয়ে যায়, ছুটি সেই বিকেল এলে। সুতোকলের মিস্ত্রী বলে কথা। দুনিয়ার তাবৎ লোকের কাপড় তাকেই না বুনে দিতে হয় মেশিনে। ভাবলে যত গর্ব হয়, বুকখানাও যেন ঝিনঝিন করে তত। নেড়ুর বাপটা বড় গরীব ছিল। দিনআনা দিনখাওয়া মানুষ। এই অঙ্কুর পাড়ুইএর কাছেই তার দেনা জমেছিল কম! সে ধার আর মেটানো হল না জীবনে। চঞ্চলাদাসীর ঋণ দিনে দিনে বাড়ছেই শুধু।

যত্ন করে অঙ্কুরের লুঙ্গি গেঞ্জি দড়িতে ঝুলিয়ে দিল চঞ্চলা। লোকটা ফিরে পরবে। দুটো রুটি করে রেখে গেলে হত। থাক, কৌটোতে মুড়ি আছে আর কটা নারকেল-

নাড়ু। পথের জন্য চারটি মুড়ি বেঁধে নিলে হয়। ছেলেটার পেটে বড় দ্রুত ক্ষিধে আসে। তখন তাকে রোখা দায়। কদিন আগেও কী কষ্টে না ছেলের পেটের জোগাড় করতে হয়েছে। ভাবলে বুকে রোঁয়া ওঠে।

ছেলেকে সাজাতে বসে নতুন কবে বুক ভাঙছে চঞ্চলার। কাল থেকে যে নেড়ু কী করবে! এখনও নিজে জামাটা পরতে শিখল না। দশবছরের ছেলে, দেখে মনে হয় কত জোয়ান! এরকমই নাকি হয়। হাবা ছেলের বয়সের আগে শরীর ছোটে। শবীর যত দৌড়োয়, মন তত শিশু হয়। এখনও গায়েব কাছে শুয়ে এমন বায়না ধবে নেড়ু...

ছেলের জামা প্যাণ্টের ব্যাগটা আরেকবার দেখে নিল চঞ্চলা। কাল রাতেই গুছিয়ে রেখেছে। রবারেব বল, ডাংগুলি আর মার্বেল ভরে নিল বেতঝুড়িতে। সোয়েটার একটা নেবে নাকি? প্রথম কার্তিকেই এবার বেশ ঠাণ্ডাভাব। দেশগাঁয়ের দিকে শীত আবাব আগে নামে। নানান রঙের উল বেঁধে নেড়ুর জন্য বাহারী সোয়েটার বুনেছে গত বছর। সেখানা বার করেও রেখে দিল। তাড়া কিসেব। শীত নামার আগে সে কী আব যাবে না!

দরজায় তালা দিতেই খুশি বুঝি ধরে না ছেলের। ব্যাঙেব মত লাফ কেটে কেটে উঠোন পেরিয়ে যাচ্ছে। চঞ্চলা কয়েকমুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইল। বেলা বাড়ার কোলাহল গুনগুন করছে চতুর্দিকে। শব্দরা এখানে একেক ঘরে একেক রকম। কোথাও কখনও নিঝুম শান্তি নেই। কল থেকে নবুর মা ফিরছে, চঞ্চলাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল, 'চললি তবে?'

কাঁধে তোলার পর ঝোলাব্যাগ যেন দশমণী বোঝা। চঞ্চলা কাঁধ বদলালো, 'দেখি কদিন রেখে।'

'হুঁ। তাতে যদি শান্তি আসে...'

শান্তি যে ঠিক কোন পথে আসে! চঞ্চলার চোখে ঝিঁঝিঁ ধবল। পাতাদুটোকে সজোবে ছুঁড়ে পা চালাল তাড়াতাড়ি।

দুই

শীর্ণ রাস্তা বেয়ে সার সার শুধু কানা ল্যাম্পপোস্ট। বাতি নেই একটাতেও। গলি ফুঁড়ে লাফিয়ে ওঠা দৈত্যবাড়িটা যা ছিটেফোঁটা আলো দেয় এদিকটাকে। সন্ধ্যা-রাতের কুয়াশা ভেঙে ক্লান্ত পায়ে ফিরছে চঞ্চলা। আচমকা প্রাণীটা সামনে দিয়ে দৌড়ে যেতে থমকে দাঁড়াল। আশ্চর্য! বেড়ালটা পাড়ায় ফিরল কীভাবে? কদিন আগে বস্তায় বেঁধে এটাকেই না গঙ্গায় ফেলে এসেছিল খালপাড়ে! চঞ্চলা নিথর। দু চোখ শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ালটাকে খুঁজছে। বেড়াল যদি পারে, মানুষ কেন পারবে না? কোনও ম্যাজিকে যদি এখন ফিরে আসতে পারে নেড়ু। পাগল, তা কী করে সম্ভব! মানুষ কি বেড়াল? তাছাড়া এখান থেকে বোড়াল বহু দূরের পথ। প্রথমে অতটা হেঁটে এসে বাস ধরো। তারপর গড়িয়া থেকে ট্রেন। শেয়ালদায় নেমে ফের বাস। তারও পর কত লক্ষ গলিঘুঁজি। নেড়ু কোনদিন একা বাসরাস্তাতেই যায়নি।

চঞ্চলা ঘাড় হেঁট করে উঠোনে ঢুকল। ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে। পাঁচ নম্বরের বাবলু পড়া মুখস্থ করছে গলা ছেড়ে। গঙ্গাদের ঘর ফেলে এজমালি কলঘরের দিকে গেল। যদিও এসময়ে তেমন উষ্ণ নয় পৃথিবী, তবু জ্বলে যাচ্ছে শরীর। ভাল করে জল ঢালা দরকার। দরজা আবজে হুড়হুড় জল ঢালল মাথায়, গায়ে। হৃদয়টাকেও যদি কোনভাবে ধুয়ে শীতল করা যেত! ভেজা কাপড়ে পা টিপে টিপে ঘরে ফিরল। যেন কত বড় অপরাধ কবে এসেছে, এভাবে চোরের মতো নিঃশব্দে তালা খুলল দরজার।

ছেলেটা আসাব সময় টেব পায়নি কিছু। অমন একটা প্রকাণ্ড আকাশ পেয়ে ছেলে একেবাবে দিশাহারা। একবার ধানক্ষেতে যায় তো একবার পুকুরপাড়ে। হাঁ করে টিয়ার ঝাঁক দেখে। গরু-ছাগলেব পিছনে হ্যাট হ্যাট তেড়ে যায়, কোমর থেকে খসে পড়ে হাফপেন্টুলুন। বউদি তো দেখে হেসে কুটিপাটি, 'ও ঠাকুরঝি, তোমার ছেলের আমোদ দ্যাখো।'

দাদা-বউদি ইদানীং মাকে ভিন্ন করেছে। খেজুরপাতাব খোলপা তুলে ভাগ করেছে একরত্তি ভিটে। দাওয়াব কোণে শরীর গুঁজে মা থাকে কোনরকমে। বয়স দাঁত বসিয়েছে আরও। কাশবন চুল ফাঁকাফাঁকা। ধানের একটুক ভাগ বুঝি মাকে দেয দাদা, তাই দিয়ে বুড়িব দিন-গুজরান।

মা বলল, 'শাকপাতা কুড়িয়ে খেয়ে দিন কাটে আমার, তোব ছেলের কী সে সব সহ্য হবে?'

'ভাবছ কেন? মাস মাস ঠিক এসে টাকা দিয়ে যাব। সে তোমাদের দুজনেবই খোরপোস দেবে বলেছে।'

মায়েব চোখে তবু দ্বিধা সন্দেহ। মেয়ে বুঝি উটকো আপদ গছিয়ে সরে পড়ছে। মনেব থেকেও পেটের জ্বালা বেশি অবিশ্বাসী করে মানুষকে। দুপুববেলা নেড়ু ঘুমোতে সে যখন পালিয়ে আসছে তখনও মাব গলায় শঙ্কা, 'আসবি তো তুই? সত্যি?'

'পেটের ছেলে ফেলে দিয়ে আমি কী থাকতে পারি মা? পরের হপ্তাতেই চলে আসব দেখো।'

ছেলেটা এতক্ষণে কী করছে কে জানে! নিশ্চয়ই অতিষ্ঠ করে তুলেছে দিদিমাকে। অভিমান বেশি হলে নেড়ু যেন কেমন অদ্ভুত সুরে কাঁদে। গরগব শব্দ ওঠে গলা থেকে। শেষে পুকুরে ঝাঁপটাপ দেবে না তো। গায়ে ওর পালোয়ানেব শক্তি, হাতের একটা ঝাপটাতেই ছিটকে যাবে মা।

ঘরের আলো জ্বলে উঠল চিক করে। অঙ্কুর ফিরেছে। চঞ্চলা মুখ ঘুরিয়ে নিল। পোড়া চোখের জল যেন দেখতে পায় না কেউ।

অঙ্কুর চারদিক দেখছে। বুঝি যাচাই করে নিতে চায় নেড়ু সত্যি গেছে কিনা।

চঞ্চলা উঠে বাইরের ঘেরাটোপ থেকে মুখ মুছে এল গামছায়, 'রেখে এসেছি।'

'কাঁদে নি?'

'টের পায় নি। চুপি চুপি ফেলে এসেছি।'

অঙ্কুর চৌকিতে বসে শ্বাস ফেলল। কী যেন ভাবছে। চঞ্চলা আড়চোখে তাকাল, 'বসে রইলে যে?'

'ভাবছি।'

'কী?'

'কাজটা বোধহয় ভাল হল না। লোকে আমাকেই দুষবে।'

বাইরে গিয়ে স্টোভ জ্বালাল চঞ্চলা। ভাত বসাতে হবে। অন্যদিন দু কৌটো চড়ায়। এক কৌটোয় সে আর অঙ্কুর। আবেক কৌটোর প্রায় সবটাই লাগে নেড়ুর। ছেলেটা একটু খায় বেশি। সেই কথায় বলে—বোঝে কম খায় বেশি, সেই-ই হয় গলার ফাঁসি।

নেড়ু ঠিক গলায় না বুকে কোথায় ফাঁস টেনেছে বুঝতে পারছিল না চঞ্চলা। দুটো বালিশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সাজাল পাশাপাশি। নেড়ুব বালিশটা ছুঁড়ে দিল চৌকির নিচে।

ঘরে ঢুকে দু'দণ্ড থমকে বইল অঙ্কুর, 'তুমি একটু কিছু খেলে না?'

চঞ্চলা কথা বলল না।

অঙ্কুব চুলে চিরুনি চালাল, 'জানি তোমার মন মানছে না।'

চঞ্চলা এবারও নীরব।

'কথাও বলবে না?'

'কী বলব?'

'আমাব ওপব রাগ কবছ কেন? নিজেই তো জোর কবে...'

চঞ্চলা ধীবে ধীরে নিজেকে সামলে নিল। মানুষটাকে বেশি উস্কানোব দবকাব কী! যদি ঝপ করে বলে বসে, থাকো তুমি ছেলে নিযে, আমিই চললাম। যদি বলে, যদি বলে...

চঞ্চলা নতুন স্বামীর পাশে এসে বসল, 'রাগ কবব কেন? প্রথম প্রথম তো, তাই একটু কষ্ট হচ্ছে। পবে সব ঠিক হযে যাবে দেখো। তারও সেখানে মন বসে যাবে ক্রমে ক্রমে।' বলতে বলতে আবার উঠে আয়না পেড়ে সাজতে বসল। চাবগুছিব বিনুনি পাকিযে খোঁপা বাঁধল বড। চোখে হালকা রূপটান, কপালে সিঁদুরেব চাকা টিপ।

আজই বুঝি প্রথম রাত যেদিন ঘরের আলো নেবাতে হল না অঙ্কুরকে। আজ সারারাত সে বউকে দেখতে পাবে। ছলছল-মুখ এই মেয়েটার প্রতি তার বহুদিনেব চোরা টান। সেই সাধন বেঁচে থাকার আমল থেকেই। হাজার শোকেও যে মেয়ে পাপড়ি মেলে ফুটে থাকতে পারে, তাকে ছিঁড়তে কার না লোভ হয়।

ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি খুলে সবে ব্লাউজেব সেফটিপিনে হাত বেখেছে অঙ্কুর, দরজায় কিসের শব্দ।

চঞ্চলা ছিটকে গেল সঙ্গে সঙ্গে, 'কে?'

'ও কিছু না। হাওয়া মনে হয়।'

আধখোলা পিন বুকের ঠিক মাঝখানে বিঁধে রক্ত ফুটিয়ে তুলেছে এক ফোঁটা। চঞ্চলা কান পেতে রইল। আবার শব্দ হচ্ছে। আবার—পরিষ্কার দরজায় আঁচড় টানার শব্দ।

'না গো না, কেউ এসেছে নিশ্চয়ই।'

'কে আসবে এখন ?. এত রাতে ?'

হয়ত সে। বলতে গিয়েও ঠোঁটে কুলুপ টানল চঞ্চলা। অঙ্কুর শুনলে হোহো হাসবে। অসম্ভব—নেড় হতেই পারে না। তবে বুঝি ওই হ্যাংলা বেড়ালটা এসে আঁচড়াচ্ছে দবজা। এক সময় নিজের খাবাব থেকে ওকে ভাগ দিত নেড়। হয়ত খাওযাব লোভেই...। চঞ্চলাব শরীব শক্ত হল। বাপের বাড়িব কেউ তাকে ফেরাতে আসে নি তো!

একটু থেমে আবার বাজছে শব্দ। এই বুঝি সে ডেকে উঠল, 'দরজা খোল মা। আমি এসেছি।'

অঙ্কুবকে একরকম ঠেলে সবিযে ব্যাকুল চঞ্চলা দবজার খিল নামিয়েছে। হাযরে. কেউ নেই কোথাও—বেড়াল না, নেড় না, কেউ না। থমথম কবছে নিশুতরাত। শূন্য বাবোযাবী উঠোন। চঞ্চলাব শবীব হিম হয়ে এল। বুঝতে পাবছে ওই ক্ষুধার্ত শব্দটা থেকে তার রেহাই নেই কোনদিন। ওটা বাজবেই।

নিষাদ জানে না

বলেছিল আসতে পারে। যে কোন দিন। সত্যিই আসবে কে জানত! দেবাদিত্যর ডাকাডাকিতে রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এসে আমি একেবারে হাঁ। এ কি দেখছি! ঠিক দেখছি তো! আমারই ঘরে, আমারই সোফায় বসে শৈবাল! হ্যাঁ, শৈবালই। অবিকল সেই আগের মত বসার ভঙ্গি। পায়ের ওপর পা, হাত ছড়ানো সোফার হাতলে, মুখে সেই চিরন্তন টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন—কি রে, খুব চমকে গেলি তো? বলেছিলুম চলে আসব...

চমকে গেছিই তো! বিশ্বাস হচ্ছে না, কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

—ওভাবে দেখছিস কি? আমি রে আমিই। তোর সেই গ্রেট হিরো শৈবালদা। তোর একমাত্র নায়ক।

কথার ছিরি দ্যাখো! দেবাদিত্য রয়েছে না সামনে। তাড়াতাড়ি সামলে নেবার চেষ্টা করলাম, থাক। হয়েছে।

দেবাদিত্য অবশ্য নির্বিকার। শৈবালের কাঁধ-ঝাঁকানো দেখে উল্টে মজা পাচ্ছে যেন।

—আরে কি কাণ্ড! এত বড় খবরটা তো জানতাম না!

—সেকি রে? বেমালুম চেপে গেছিস বরের কাছে?

—ইস। হাসতে গিয়ে গলাটা কেমন কেঁপে গেল, কি আমার উত্তমকুমার ছিলেন রে...

—যাহ। তাহলে তো তোকে সুচিত্রা সেন হতে হয়। তুই মোটেই অতটা সুন্দরী নোস।

শৈবালের সঙ্গে দেবাদিত্যও হাসছে হ্যা-হ্যা করে। মুখটা কেমন বোকা-বোকা হয়ে গেল। ওদের মত হাসতে পারছি না কিছুতেই। ফুসফুস দুটো এখনও চমকের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কেন এসেছে শৈবাল? নিশ্চয়ই বাড়ি বয়ে শুধু আমার পেছনে লাগতে আসেনি! তাহলে? বিয়েবাড়িতে সেদিন বলেছিল বটে। হাল্কাভাবেই। —কেমন ঘরসংসার করছিস গিয়ে একবার দেখে আসতে হবে!

—সত্যিই? কবে আসবে বলো?

—ঠিকানা দিয়ে রাখ। যে কোনদিন চলে যাব।

শৈবাল এখনও একই রকম। চার বছর পরেও। হাসিখুশি। ঝলমলে। জড়তাহীন। কী সহজে ভাব জমিয়ে ফেলেছে দেবাদিত্যর সঙ্গে। সেই বিয়েবাড়ি থেকেই। দেবাদিত্যও দিব্যি অসংশয়। ছোট সোফাটায় ছড়িয়ে বসে উপভোগ করছে শৈবালের কথাগুলো।

—আপনার বউটা বোধহয় আর সেরকম বোকা নেই, বুঝলেন? খেপালেও খেপছে না!

—একদম ভুল রিডিং। এখনও কথায় কথায় চোখ দিয়ে টপটপ...

—ইজ ইট? স্যাড—ভেরি স্যাড! আমি ভেবেছিলুম...

শৈবাল ভাবে? আমার কথা? মিথ্যে বলছে। প্রতিবাদ জানানো দরকার। মাঝখান থেকে বলে উঠলাম, অনেক হয়েছে আমাকে নিয়ে গবেষণা, এখন কি খাবে বলো —চা? কফি? সরবত?

—চা-ফা তো হবেই। তার আগে একটু জল খাওয়া দেখি।

—শুধু জল কেন? একটু সরবত করে দি?

—দিবি? দে। বেত না আসা পর্যন্ত কানমলাই চলুক।

সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে. শোবার ঘর পেরিয়ে, সোজা একেবারে ডাইনং স্পেসে। ফ্রিজের ডালা খুলে চুপচাপ দাঁড়িযে রইলাম কিছুক্ষণ। কেমন একটা নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। গলা শুকিয়ে মরুভূমি। ঠাণ্ডা জলের বোতল খুলে ঢকঢক ঢাললাম গলায়। কেন এমন হচ্ছে? এতদিন পরও? ভেতরে ভেতরে বিশ্রী এক অস্থিরতা। তুলতুলিব বিয়ের দিনও ঠিক এরকমই হয়েছিল। সবে তখন উপহার তুলে দিচ্ছি তুলতুলির হাতে, মালা কোত্থেকে এসে টানল হাত ধবে। আচমকা।

—এত দেরি করে এলি যে?

—দেরি কোথায়? ও অফিস থেকে ফিরলে তবে তো আসব।

—হয়েছে। হয়েছে। আমার সঙ্গে একটু আয় তো এখন।

—কোথায়?

—আয় না। ছোড়দাভাই তোকে কখন থেকে খুঁজছে।

ছোড়দাভাই শব্দটাতে এখনও এত জাদু আছে কে ভেবেছিল। চাব বছর পরেও! শিরদাঁড়ায় শক খেলাম যেন। মস্তিষ্ক পলকে অবশ। গলা থেকে আপনাআপনি শব্দ ছিটকে এল।—কবে এসেছে শৈবালদা?

—কাল। হঠাৎই। আমরা তো ভেবেছিলাম তুলতুলির বিয়েতেও বোধহয় আসতে পারল না। আমার বিয়েতে তো পারেনি জানিসই।

জানি। অনেক দূরে উড়ে গেলে ফেরা কঠিন। সকাল-সন্ধেটাই সে দেশে বদলে যায়। ভাবতে ভাবতে একটু বুঝি দূবমনস্ক হয়েছি, মালা আবার টানল আমাকে। —চল। আমার কাছে অনেকবার তোর খোঁজ করেছে। বলতে বলতে চোখ ঘোরাচ্ছে, রহস্যটা কি রে? ছোটদাভাই-এর সঙ্গে তোব কোন ব্যাপার-স্যাপার ছিল নাকি? গভীর... গোপন...?

—থাকলে তুই জানতে পারতিস না?

এ ছাড়া আর কি-ই বা বলতে পারতাম মালাকে। গোপনীয়তা কিছু থাকলেও সে যে শুধু আমারই। আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব। কাউকে বলা যায় না। ভালবাসায় হেরে যাওয়ার মত লজ্জা আর কিছুতে নেই। নিজেকে প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণা বোধহয় আরও কষ্টের। সে কষ্ট আমি জানি। তবু চেষ্টা একবার করেছিলাম। বেহায়ার মত। শৈবালের নিউইয়র্কে যাবার তারিখ তখন একেবারে কাছে। ঠিক দুদিন পরে।—তুমি তাহলে সত্যিই চলে যাচ্ছ শৈবালদা?

—কেন? এখনও তোর সন্দেহ আছে নাকি?

—তা নয়, চলে যাবে?

—ইউনিভারসিটি স্কলাবশিপটা যখন পাইয়েই দিল, দেখাই যাক না... ঘুরে আসি...

—একা একা ওখানে খুব মন খারাপ লাগবে তোমার, দেখো! মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, এই সবাই মিলে এখানে হৈচৈ...এত নাটক-টাটক করা...

খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও শৈবাল সেই প্রথম যেন উদাস হয়েছিল একটু। সময় স্থির হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্য। ব্যাস. সেই টুকুনি। তারপরই দুনিয়াওড়ানো হাসি। স্বভাবমতন।

—যাওয়াটা তাহলে ক্যানসেলই করে দিই. কি বল।

—আমি কি সে কথা বলেছি নাকি? নিশ্বাস চেপে বলে ফেলেছিলাম, গ্রুপ তো ভেঙে যেতেই বসেছে। আমাকেও হয়ত চলে যেতে হবে শিগগিরই...

—কোথায় যাবি? প্রশ্ন করেই মনে পড়ে গেছে শৈবালের। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠেছে, বাঁচি।

মালা বলেছিল. বটে।

—কতদূর এগোল রে ব্যাপারটা? দিন ঠিক হয়ে গেলে আমাকে খবর দিবি কিন্তু। তোর বিয়েতে আসতে না পারি. শুভেচ্ছা তো পাঠাতে পারব!

এরপর আর কত নির্লজ্জ হওয়া যায়। প্রাণপণে শুধু নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করছি. কিছুতেই যেন কেঁদে না ফেলি।

সেই কান্নাটা কি এখনও রয়েছে বুকের ভেতরে। গলার কাছে তবে এত বাষ্প জমছে কেন! ঢোঁক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। গ্লাসে জল ঢেলেও স্কোয়াশ দিতে ভুলে গেছি। বাইরের ঘর থেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে দেবাদিত্য যে এসে দাঁড়িয়েছে. সে হুঁশও নেই আমার।—কি হল? সরবত করতে এত দেরি?

দেবাদিত্যর মুখে বিস্ময়। নাকি সন্দেহ? তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিলাম নিজেকে. দ্যাখো না কি বিশ্রী ব্যাপার! কৌটো খুলে দেখি চিনি নেই। কি করি বলো তো?

বিশ্বাস করল কিনা বোঝা গেল না। ভুরু কুঁচকে তাকাল।—এনে দোব?

—থাক। ওর হাত চেপে ধরতে যাচ্ছিলাম প্রায়। ভাগ্যিস ধরিনি। বাড়াবাড়ি হয়ে যেত। অভিনয় নিখুঁত করার চেষ্টা করলাম। রান্নাঘর থেকে দৌড়ে বাটি নিয়ে এলাম একটা, তুমি বরং শৈবালদার সঙ্গে ততক্ষণ কথা চালিয়ে যাও, প্লিজ। আমি চট করে পেছনের দরজা দিয়ে কল্পনাদির কাছ থেকে...

চিনির বাটি হাতে টেবিলের কাছে ফিরে এসেও হাঁপাচ্ছি। বুক টিপটিপ করছে। আরেকটু হলেই ধরা পড়ে যেতাম। কি ভাবত আমাকে ঘরের মানুষটা? ছি ছি! এখন আর এ ধরনের যুক্তিহীন আবেগের কোন মানেই হয় না। আমার সংসার সুখী। নিরুদ্বেগ। সুন্দর। কোথাও ফাঁকি নেই এখানে। দেবাদিত্যর সঙ্গে সম্পর্কেও না। আরেকজনও এসে যাচ্ছে শিগগিরই। মাসতিনেক আগে তার আসার সূচনা হয়ে গেছে আমার শরীরে। আমি তাকে প্রতি পলে অনুভব করি।

সরবত নিয়ে যাবার সময় শোবার ঘরের আয়নায় চোখ পড়ে গেল। ট্রে নামিয়ে

আটপৌরে আঁচল সাজিয়ে নিলাম কাঁধে। চুলে আলতো চিরুনি বোলালাম। একটুও অগোছালো যেন না লাগে। মুখে যেন ভাবান্তর না ফোটে।

শৈবাল যথারীতি জমিয়ে গল্প করে চলেছে দেবাদিত্যর সঙ্গে।—দিন সাতেক আছি আর। ফিফটিনথ ফিরছি। যাবার আগে বম্বেতে একটা ইন্টারভিউ আছে...

—ওদেশে তাহলে সেট্‌ল করছেন না?

—নাহ। তেমন একটা ভাল চান্স পেলেই...

—হ্যাঁ। এবার এখানে এসে একটা বিয়ে-থা করে ফ্যালো। পর্দা সরিয়ে নিপুণ হাসি ঝুলিয়ে নিলাম ঠোঁটে, আমরা বেশ পাত পেড়ে নেমন্তন্ন খাব।

—তোর বিয়ের খাওয়াটা খাওয়া আগে।

—এনি ডে। এসো। কবে খাবে বলো?

—মাথা খারাপ! এক গ্লাস সরবত খাওয়াতেই যা করলি...পাক্কা আধঘণ্টা... খেতে ডেকে হয়তো...

—না... মানে... আসলে কি হয়েছে, জানেন তো? দেবাদিত্য সহসা ত্রাণকর্তার ভূমিকায়। বউ-এর দোষ ঢেকে দিতে চাইছে—সরবত বানাতে গিয়ে দেখে চিনি নেই।

—সো হোয়াট? তোর আঙুলটা একবার ডুবিয়ে দিলেই পারতিস।

—উফ। শৈবালদা তুমি না... বিশুদ্ধ ভাঁজ আনলাম ভুরুতে,—নাও, খেয়ে নাও।

—দরকার নেই। তোর কর্তা প্লেন জলে আমার তেষ্টা মিটিয়ে দিয়েছে।

তার মানে আমি যখন চিনি আনতে গেছি, দেবাদিত্য আবার গিয়েছিল ভেতরে। জল আনতে! হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল বেয়াড়াভাবে। রান্নাঘরে গিয়ে চিনির কৌটো খুলে দেখেনি তো! দেখলেও আর কিছু করার নেই। অস্বস্তি চাপা দেবার জন্য কথা ঘোরাতে চাইলাম।—তারপর আর কি খবর বলো? মালা শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেছে?

—এই তো কালই গেল। তুলতুলিরাও।

সরবত শেষ করে সিগারেট ধরিয়েছে শৈবাল। প্যাকেট বাড়াল দেবাদিত্যর দিকে। আগুন দেওয়া-নেওয়ার পালা চলছে। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। এখনও ঝাড়পোঁছ হয়নি। টিউবলাইটের কোণে পাতলা ঝুল। বই-এর র‍্যাকে ধুলো। পর্দাগুলোও নোংরা হয়েছে। বেশ এলোমেলো সব কিছু। শৈবাল সত্যি আসবে জানলে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যেত। পরিবেশের অবিন্যস্ততা নিজেকেও বড় আলুথালু করে দেয়।

দেবাদিত্য আর শৈবাল আবার গল্প শুরু করেছে। আমেরিকা থেকে রাজনীতি ঘুরে ভারতে এল। বুশ থেকে ভি পি সিং। আবার ঘুরে পোল্যাণ্ড, জার্মানি, রাশিয়ায়। সেখান থেকে ইরাক, কোয়েত, সৌদি আরবে। ওদের বিশ্ব-পরিক্রমায় মাঝে মাঝে ফুট কাটছি আমিও। পেট্রোলিয়াম সমস্যা নিয়ে বেশ খানিক মতামতও জানিয়ে দিলাম। মূল্যবৃদ্ধি লোডশেডিং নিয়ে বিরক্তিও। ক্রমে শান্ত হয়ে আসছে ভেতরটা। মোটেই আর ঝটপট করছে না। এক সময় দেবাদিত্যই দেশবিদেশ থেকে ঘরের মাটিতে চলে এল দুম করে।—এই, তুমি যে বসে বসে গল্পই করে যাচ্ছ! ভদ্রলোককে কিছু খাওয়াবে-টাওয়াবে না?—শৈবালদা, আজ দুপুরে এখানেই খেয়ে যাবে। না হয় দুপুরের খাওয়া সন্ধের মুখে...

—ওরে বাবাহ! কথা পুরো শেষ হবার আগেই শৈবাল মাথা ঝাঁকাচ্ছে সজোরে, বৌদি আজ দুপুরে হেভি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে। ওটা মিস্ করে এখানে রিস্ক নিতে একদম রাজি নই আমি!

ব্যাস, হয়ে গেল। বলার ধরনই এমন যেন পৃথিবীর শেষ রায় দেবার অধিকাব শুধু ওরই। তার ওপর কোন অ্যাপিল চলবে না। দেবাদিত্য তবু গৃহকর্তার সৌজন্য দেখিয়ে চলেছে, ঠিক আছে। কিছু অন্তত তো খাবেন। প্রথম দিন এসেছেন...

—সুদে বাড়ুক না। পরে একদিন উশুল করা যাবে।

—তা কি করে হয়? আপনি বরং ওর সঙ্গে কথা-টথা বলুন, আমি এক্ষুনি...

দেবাদিত্য উঠে পড়েছে। কি কাণ্ড! সত্যি সত্যি বেরোবে নাকি? আমাকে একা ফেলে? একটু আগের সহজ হয়ে আসা ভাব পলকে উধাও। শরীর শিরশিব কবছে। জেনে বুঝে বেরিয়ে যেতে চাইছে নাকি! মনে হয় না। এতক্ষণ তবে সাদা মনে আড্ডা মারল কি করে? কি জানি! বলা যায় না। ছেলেরা মনের সন্দেহ সহজে প্রকাশ করে না। দেবাদিত্য তো না-ই।

দেবাদিত্যব পাশাপাশি উঠে দাঁড়িয়েছি, দোকানে যাওয়ার দরকাব কি? বাড়িতে যা আছে...শৈবালদা, ওমলেট খাবে? কিমা দিয়ে করে দিতে পারি। কথা দিচ্ছি পাঁচ মিনিটে দেব।

—দাঁড়া। দাঁড়া। তোরা হঠাৎ এত ব্যস্ত হয পড়লি কেন? এক কাজ কব, ভাল কবে চা বানিয়ে ফেল তো দেখি!

—পাগল নাকি? শুধু চা? ওসব হবে না। দেবাদিত্য খাওযাবেই, একে শ্বশুরবাড়ির লোক, তার ওপর বউ-এর হিরো। নিজের মুণ্ডুটা তো বাঁচাতে হবে,—বসুন বসুন।

বলতে বলতে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল। মানিব্যাগ নেবে। দেবাদিত্য বেরিয়ে যাবার পর ভীষণভাবে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছি। কোনভাবেই দুর্বল হয়ে পড়তে চাই না।

—শুনলাম তুমি রিসার্চটাও শেষ করোনি? ওখানে চাকরিতে ঢুকে পড়েছ?

—আর কতদিন ইউনিভার্সিটির ঘাড় ভাঙব রে? রোজগারপাতি করতে হবে না?

—বোকো না, তোমার আবার রোজগারপাতির ভাবনা! বেশি গার্ল ফ্রেণ্ড টার্ল ফ্রেণ্ড জুটিযে ফেলেছ তাই বলো!

—সেটাই বা পারলাম কই! কি যে হল... সবটাই কেমন...

শৈবাল নতুন সিগারেট ধরিয়ে হেলান দিল সোফায়। হঠাৎ যেন সামান্য অন্যমনস্ক। ঠোঁট চেপে সিলিং-এর দিকে তাকিযে কি যে ভাবছে! আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে যেন। সমূলে নাড়া খেলাম। পরিষ্কার টের পাচ্ছি একটা কিছু ঘটতে চলেছে। এক্ষুনি পালিয়ে যাওয়া দরকার, শৈবালের সামনে থেকে।

—শৈবালদা, এক সেকেণ্ড—আমি চায়ের জলটা বসিয়ে দিয়েই আসছি।

ভেতরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছি, পেছনে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত স্বর, দাঁড়া!

খোলা দরজার দিক থেকে ফাল্গুনি বাতাস আসছে। ঘরের সব পর্দা দুলে উঠল।

দোলনার মত। বাইরের আলোর ঝলকানি ঘরে ঢুকে মৃদু জ্যোতি। শৈবাল হঠাৎ একেবারে অন্যরকম।

—এদিকে আয়। এখানে এসে বোস।

এমন হওয়ার তো কথা ছিল না। ওই স্থির তাকিয়ে থাকা মুখ একদম অপরিচিত।

—কি হল, আয়! তোর সঙ্গে আমার একটা খুব জরুরি কথা আছে।

ভরাট পুরুষকণ্ঠ নয়, সাপুড়েব বাঁশি ডাকছে সাপিনীকে। পায়েব তলায ছড়িয়ে যাচ্ছে স্পন্দন। সব ওলটপালট হযে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে চলেছি। এগোনো না পিছোনো। চতুর্দিক আবছা হয়ে এল। বিশ্বসংসাব, দেবাদিত্য. সব—সবাই।

—একটা কথা জিজ্ঞেস কবব. সত্যি কথা বলবি?

—কি কথা?

নিজের গলাটা আর আমাব আযত্তে নেই। কেঁপে গেল।

—আমাব জানা খুব দরকাব। চাব বছর ধরে কথাটা আমাকে উন্মাদের মত তাড়া কবে বেড়াচ্ছে। তোকে সত্যি কথা বলতেই হবে—বল বলবি?

এবার চোখও বিবশ। পলক ফেলতে ভুলে গেছে।

—তুই কি আমাকে কোনদিন কিছু বলতে চেয়েছিলি? ঠিক কবে বল তো...

শরীবের সমস্ত রোমকূপ যেন খুলে গেল। লক্ষ সরোদ বেজে উঠল শিরা উপশিরায়। আজ শৈবাল এতদিন পবে...সেই শৈবাল...

দীর্ঘ সুঠাম শরীর উৎসুকে ঝুঁকে আছে। নিস্পলক দৃষ্টি আমাবই চোখে স্থিব। চেতনা ক্রমে অবশ হয়ে আসছে। সম্বিতে ফিরতে পৃথিবীর বযস বেড়ে গেল কয়েক হাজার বছর। অথবা কয়েক মুহূর্ত মাত্র। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লাম। প্রবল ভূমিকম্পের পর মাটি শান্ত হচ্ছে।—না তো শৈবালদা। সেভাবে তো কোনদিন কিছু বলতে চাইনি তোমায—না তো। কেন তোমার মনে হয়েছে একথা?

সমুদ্রের মত গাঢ় চোখে মেঘের ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। আবার সেখানে ঝলমলে উচ্ছল ঢেউ। স্খলিত মুহূর্তটাকে কি অবলীলায় সেই ঢেউ-এ ভাসিয়ে দিল শৈবাল! বুঝলই না সমস্ত কথারই নির্দিষ্ট একটা সময় থাকে। সেই সময় চলে গেলে সে কথার মৃত্যু হয়। হরিণী বসে থাকে না নিষাদের প্রতীক্ষায়। আমার মুখেব দিকে তাকিয়ে শৈবাল আবার হাসছে শব্দ করে।

—এত কাঁপছিস কেন রে বোকা? ঠাট্টাও বুঝিস না?

আমার চার বছর আগের প্রতি রাত্রের সব স্বপ্নই কি ঠাট্টা এখন।

দেবাদিত্য কেন ফিরছে না? এক্ষুনি ফিরে আসুক। এই মুহূর্তে।

দৃষ্টিহীন

আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন একা একা। শেষ সময়ে তাঁর বিছানার পাশে আমরা কেউই ছিলাম না, যদিও মা ছাড়া আমরা সকলেই তখন হাসপাতালে। দাদা ছোড়দা দিদি, আরও অনেকে, আমিও।

মারা যাওয়ার ঠিক ন'দিন আগে বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। ক'দিন ধরেই তিনি ইনটেনসিভ কেয়ারে ছিলেন, আমরা কেউ তাঁর দেখা পেতাম না। দেখা পেয়েই বা কী হত! ডাক্তার-নার্সদের মুখে শুনতাম তিনি নাকি কোমাতেই আছেন। বাবাকে বাঁচানোর জন্য খরচে কার্পণ্য করিনি আমরা, নামী হাসপাতাল, দামী চিকিৎসা সবই হয়েছিল। ডাক্তাররা যখন যেমন বলেছে—ওষুধ ইনজেকশন কিনে দিয়েছি, দিনেরাতে সর্বসময়ে কেউ না কেউ পালা করে থেকেছি, বাবার চিকিৎসায় যেন সামান্যতম ত্রুটি না হয় সেদিকে আমাদের সতর্ক নজর ছিল। আমরা কাজের মানুষ, প্রত্যেকেরই সুবিধে অসুবিধে আছে, সেগুলো সামলে-সুমলে চার ভাইবোন একসঙ্গে মিলতাম বিকেলে। ভিজিটিং আওয়ারের পর চারজনই বড় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতাম। তিনি খুব একটা আশা দেননি, তবু যেন মনে হত এত দিন যখন কেটে গেছে, বাবা হয়তো এযাত্রা বেঁচে গেলেন।

বাড়ি ফিরে মাকে রোজকার সংবাদ দিতাম আমরা। মা সচরাচর কিছু বলত না। শুনত শুধু। নীরবে। বাবা হাসপাতালে যাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন থম মেরে গিয়েছিল আমাদের স্বল্পভাষী মা।

বাবা টিকলেন না। মারাই গেলেন। এক চৈত্রের বিকেলে।

নামে চৈত্রমাস হলেও দিনটা ছিল খুব গুমোট। গরম। শেষ বসন্তে যে একটা এলোমেলো বাতাস বয় তার কোনও চিহ্নই ছিল না কোথাও। শুকনো পাতারা উড়ছিল না, শহরের সমস্ত গাছ নিস্পন্দ, হাসপাতালের পুকুরের জলেও তরঙ্গ ছিল না এতটুকু। সব কিছুর মধ্যেই ছিল এক মৃত্যুর পূর্বাভাস।

আমরা অবশ্য তেমন কিছু লক্ষ করিনি।

লক্ষ করার তখন অবকাশই বা কোথায়? অন্তত আমার? সেদিন দুপুর থেকেই আমার নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়, বিকেল নাগাদ বেশ বেড়ে যায় সেটা। কষ্টটা নতুন কিছু নয়, তখন প্রায়ই হত। কোনও ঋতু একটু চড়া হলেই ওই রোগ ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। সে কিবা শীত, কিবা গ্রীষ্ম, কিবা বর্ষা। গুমোট হলেও নিঃশ্বাসে টান, ঘোর বর্ষায় দম আটকে আসে, ঠাণ্ডা হাওয়া চললেও ভাল করে শ্বাস নিতে পারি না। কড়া গন্ধ আমার শত্রু, ধুলোবালি বিভীষিকা, যে কোনও মানসিক উদ্বেগই আমার ফুসফুসের শমন। এই চেনা কষ্ট যে এক আসন্ন মৃত্যুর সঙ্কেত, আমি তা বুঝব কী করে!

সিঁড়িতে বসে তখন হাঁপাচ্ছি আমি, দাদাদিদিরা এলোমেলো কথা ছেড়ে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দিদি বলল, তোর তো ব্যাগে ট্যাবলেট আছে, একটা খেয়ে নে না!

ছোড়দা বলল, জল এনে দেব?

বড় বউদি বলল, তোমাব কাছে স্প্রে থাকে না, মুখে একটু টেনে নাও!

ছোট বউদি বলল, ওকে একটু চা এনে দাও। গরম চা খেলে এখন আরাম হবে।

আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি আর খুকিটি নেই, উনত্রিশ বছর বয়স হয়েছে আমার, চাকরিবাকরি করি, নিজেব ভাবনা নিজেই ভাবা আমার প্রকৃতি। তা ছাড়া হাসপাতালে বসে আমাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে ওঠাও ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না আমার। হাত তুলে দু'দিকে মাথা নাড়লাম—কিচ্ছু লাগবে না।

জামাইবাবু তবু কোত্থেকে ছুটে এক ভাঁড় চা নিয়ে এসেছে। খেতেই হবে। ভাঁড় হাতে নিয়ে সবে চুমুক দিয়েছি, তখনই ডাকটা এল। মৃত্যুদূতের মতো কে যেন হাঁকছে, আই সি ইউ সেভেনটিন... আই সি ইউ সেভেনটিইইন...। পেশেন্টের বাড়ির লোক কেউ আছেন?

আমাদের বাবা চিত্তপ্রিয় রায় যে আই সি ইউ সেভেনটিন হয়ে গেছেন, সেটা বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লেগেছিল আমাদের।

দাদা হঠাৎ সিগারেট ফেলে লাফিয়ে উঠল, আমাদের ডাকছে। বাবা...

হুড়মুড় করে ছুটল সবাই। চেষ্টা করেও আমি উঠতে পারলাম না কিছুতেই। বুকের ভেতর তখন আমার আস্ত পাহাড়ের ভার, শ্বাসকষ্টে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে. সামনে শুধু চাপ চাপ ধোঁয়া। বাবাকে দেখতে যাব কী, মনে হচ্ছিল আমিই বুঝি তক্ষুনি মরে যাব।

কতক্ষণ এ অবস্থা চলেছিল মনে নেই। বড়জোর আরও মিনিটখানেক। তারপরেই চাপ ভারটা সরতে লাগল। ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে এল শরীর। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে দেখতে পেলাম নতমুখে নেমে আসছে দিদি-দাদারা, আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুবৎ।

দাদা নিচু স্বরে, অনেকটা টেলিগ্রাফিক মেসেজ শেষ হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, ওভার।

কে যেন প্রশ্ন করল। বোধহয় আমার মাসতুতো ভাই, টাইমটা নোট করেছ?

—আমরা পৌঁছনোর আগেই...। ওরা বলল পাঁচটা সাত।

ছোড়দা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, আমাদের আরেকটু আগে ডাকতে পারত!

মৃত্যুর আগে বাবার কি একবারও জ্ঞান ফিরেছিল। বাবা কি খুঁজেছিলেন আমাদের।

দিদি কাঁদছিল, বড় বউদি ছোট বউদিরাও।

দাদা সিগারেট ধরাতে গিয়ে কয়েকটা কাঠি নষ্ট করল। চোখের কোল মুছল আঙুল দিয়ে, এখানে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি কোরো না। বাড়ি গিয়ে মাকে খবর দাও, আমরা বডি নিয়ে আসছি।

মা খুব শান্তভাবেই গ্রহণ করেছিল দুঃসংবাদটা। যেন জানতই বাবা আর ফিরবে না। যেন এই ক'দিন ধরে একটা এলেবেলে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছিলাম আমরা। অমোঘ

নিয়তির সঙ্গে। কিছুক্ষণ স্থির থেকে বলল, এবার তাহলে তোমাদের শেষ কর্তব্যগুলো সেরে ফ্যালো।

মা চিরকালই শক্তপোক্ত মানুষ, নিজেকে প্রকাশ করে না সহজে। তা বলে বাবার মৃত্যুতেও এত নিরুত্তাপ! এত সমাহিত!

নিজেকে দেখেও খুব আশ্চর্য হচ্ছিলাম আমি। বাবাব জন্য যতটা কাঁদা উচিত, ততটা কান্না আসছে না। বরং কেমন নির্ভার লাগছিল নিজেকে। সেই যে ভয়ঙ্কর টানটা হাসপাতালে উঠেছিল, সেটা যেন কোন ম্যাজিকে উধাও। সামান্য চাপ ভাব একটা ছিল বটে, তবে তা তেমন কিছু নয়। অথচ আমি ট্যাবলেটও খাইনি, স্প্রেও নিইনি, বাতাসে গুমোট ভাবও কমেনি এতটুকু! কেন এমন হয়েছিল!

মেয়েরা সাধারণত শ্মশানে যায় না, যেতে চায়ও না, কিন্তু আমি গেলাম। দিদি গেল না, বউদিরাও কেউ গেল না, আমি কেন গেলাম কে জানে! ভেতর থেকে কেউ কি ঠেলছিল আমাকে? শেষ দেখা পাক না-পাক. সবাই তো দৌড়ে গিয়েছিল, একা আমি যেতে পারিনি—এই ঘটনাটুকুই কি উচিত-অনুচিতেব বোধ উসকে দিচ্ছিল? নাকি কর্তব্যে অবহেলার বোধ?

শ্মশানে পৌঁছতে সেদিন রাত হয়েছিল অনেক। প্রায় সাড়ে বারোটা। বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন দেরি করে এল, তার জন্য অপেক্ষা কবতে হয়েছিল। শ্মশানে গিয়েও অপেক্ষা, ইলেকট্রিক চুল্লির সামনে সেদিন মৃতদেহের মিছিল। গুনে দেখা গেল আমরা হচ্ছি পনেরো নম্বরে, যত তাড়াতাড়িই হোক, ঘণ্টা ছ'য়েকের আগে বাবা চুল্লিতে ঢোকার সুযোগ পাবেন না।

হালহকিকত বুঝে দাদাই তুলল কথাটা. আমার মনে হয় এখানে আমাদের অপেক্ষা করার কোনও মানেই হয় না।

আমরা দাদার কথা ঠিক ধরতে পারিনি। ছোড়দা জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কী করব?

—পাশেই তো কাঠের চুল্লি ফাঁকা পড়ে আছে। আমরা বাবাকে কাঠেও পোড়াতে পারি।

গত ন'দিনে পাঁচ রাত জাগার পালা পড়েছিল ছোড়দার, কালও জেগেছিল হাসপাতালে। সে খুব একটা ভাবার সময় নিল না। বলল, কাঠে পোড়ানোই তো ভাল। মোর ট্রাডিশনাল। বাবা মাঝে মাঝে বলত না, আমাকে তোরা কাঠেই দিস, চুল্লিতে. ঢুকলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি বাবার দেহটি ছুঁয়ে বসে ছিলাম। এক ঝলক দেখলাম বাবাকে। মরার পরেও দম বন্ধ হওয়ার ভয়! বাবার মাথাতেই এসব আসত বটে!

দাদা জিজ্ঞাসা করল, কী রে পুতুল, তুই কী বলিস?

অন্যমনস্কভাবে বলে দিলাম, তোমরা যা ভাল বোঝ করো।

প্রচুর চন্দন কাঠে চিতা সাজানো হল। জামাইবাবু অনেকটা ঘি কিনে এনেছিল, সবটুকু মাখিয়ে দেওয়া হল বাবাকে। যথাযথ শাস্ত্রবিধি মেনে চিতা প্রদক্ষিণ করল দাদা। বাবার মুখে আগুন ছুঁইয়ে দিল। চিতা জ্বলে উঠল দাউদাউ।

বাবা পুড়তে শুরু করলেন। বাবা নিঃশেষ হতে শুরু করলেন।

তখনই একটা বাতাস উঠল। ঝোড়ো। ঠাণ্ডা। সারাদিনের ভ্যাপসা গরম ফুঁড়ে ছুটে এল এক দামাল কালবৈশাখী। রক্তবর্ণ আকাশ ফালা ফালা হয়ে গেল নীল বিদ্যুতের চাবুকে। ঝমাঝম বৃষ্টি নামল।

ঝড়ের আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেছি আমরা। শ্মশানেই একটা পাকা শেড ছিল, প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় পলকে ছুটে গেছি তার নীচে। নিজেদের মাথা বাঁচাতে।

মুহূর্ত-পরেই হুঁশ ফিরল। বাবা একা। মুহূর্তেই ছুটে গেছি বাবার কাছে। দাদারাও এসেছে পিছন পিছন। চিতা অবধি পৌঁছনো হল না, তার আগেই শিউরে উঠেছি আমরা।

যা দেখছি তা কী সত্যি।

জল পড়ে চিতা প্রায় নিভু-নিভু। ধিকিধিকি আগুনের মধ্যিখানে খাড়া উঠে বসে আছেন বাবা। শরীরের প্রায় কিছুই পোড়েনি তখনও, এখানে ওখানে কিছু ঝলসে যাওয়ার দাগ। একমাত্র চোখ দুটো গলে গেছে। চোখের জায়গায় দুটো বড় বড় গর্ত।

ঠিক যেন এক অন্ধ মানুষ।

দুই

বাবা কোনও দিনই খুব একটা চক্ষুষ্মান ছিলেন না। সফলও না। বরং তাঁকে মোটামুটিভাবে সাংসারিক দৃষ্টিহীন এক আদর্শ বিফল মানুষ বলা যায়। চাকরি করতেন খুব সাধারণ। সারাজীবন খেটেখুটে কনিষ্ঠ কেরানী থেকে বড়বাবু হয়েছিলেন, এইটুকুনই তাঁর সাফল্য। অফিসের ছেলেছোকরারা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করত। বলত, চিত্তদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিব্যি সব কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, গাধার খাটুনি খেটে ধন্য হয়ে যায় চিত্তদা। সত্যি, চাকুরি নিয়ে বাবার মধ্যে কখনও কোনও ক্ষোভ দেখিনি। অফিসের কর্তাব্যক্তিরা বাবার পরিশ্রমের কোনও মূল্য দেয়নি, তাই নিয়েও বাবার কোনও হিলদোল ছিল না। বাবা শুধু কাজ করেই সন্তুষ্ট।

বাবার এই অল্পে সন্তুষ্টি আমাদের পছন্দ ছিল না। ছেলেবেলাটা আমাদের বেশ অনটনে কেটেছে, হয়তো সেই জন্যই। আমাদের বড় হয়ে ওঠার মূলে বাবার বিশেষ অবদান ছিল না। মা'ই আমাদের সংসারের শক্ত খুঁটি।

বাবার সামান্য আয়ে কী নিপুণ হাতে মেপেজুপে সংসার চালাত মা!

মার সঙ্গে বাবার সব বিষয়েই ঘোরতর অমিল। আমাদের মা প্রকৃত সুন্দরী, বাবাকে চেষ্টা করেও সুদর্শন বলা কঠিন। মার গানের গলাটি চমৎকার, বাবার কণ্ঠে সুরের রেশটি ছিল না। মা বলত মূর্তিমান অ-সুর। মা'র সেলাইয়ের হাতটি কী অসাধারণ! শিল্পীর আঁচড়ে আগে কাপড়ে ছবি এঁকে নিত মা, তারপর রং মিলিয়ে সুতোর কাজে ভরাট করত ছবি। দেখে মনে হত যেখানে যে রংটি মানায়, সেখানে ঠিক সেই রংটিই পছন্দ করেছে মা। আর বাবা? তিনি তো ভাল করে রংই চিনতেন না। মেরুন ম্যাজেন্টা রানি সবই বাবার চোখে এক—লাল।

মাঝে মাঝে বড় বিস্ময় জাগে, কী করে বাবার সঙ্গে মার বিয়েটা হয়েছিল। খুব গরিব ঘরের মেয়ে ছিল মা, সেই জন্যই কি? কিন্তু বাবাও তো এমন কিছু রাজাবাদশা ছিলেন না? শুনেছি, দাদু মানে আমার মাব বাবা নাকি একবার এক দুর্ঘটনায় আহত হন, বাবাই নাকি তাঁকে রাস্তা থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যান। বাবার দৌলতেই সেবার প্রাণে বেঁচে যান দাদু। তিনি হাসপাতাল থেকে ফেরার বছরখানেকের মধ্যেই মা-বাবার বিয়েটা ঘটেছিল। সম্ভবত দাদুর আগ্রহেই। মা কি মন থেকে মেনে নিতে পেরেছিল বিয়েটা? কে জানে! তবে লক্ষ করেছি, বাবার প্রতি মার চিরকালই একটা নাকউঁচু ভাব ছিল। শীতল ঔদাসীন্যও। বাবার একবার এক কঠিন অসুখ হয়। খুব খারাপ ধবনের প্লুরিসি। আমি তখন ক্লাস ফাইভ কী সিক্সে পড়ি। আমাদেব কাউকে তখন বাবাব ঘরে ঢুকতে দিত না মা। বাবা আমাদের চুপি চুপি ডাকলেও মা ঠিক দেখতে পেয়ে যেত, ঘর থেকে টেনে বার করে নিত সঙ্গে সঙ্গে। বাবাব থালা আলাদা, গ্লাস আলাদা. বাবা তখন বলতে গেলে প্রায় অচ্ছুত। একমাত্র মা ঢুকত বাবার ঘরে। ওষুধবিষুধ খাওয়াত. পথ্যি দিত. রাত্রে শুতও বাবার কাছে, কিন্তু বাবার অসুখে মা খুব কাতর হয়ে পড়েছে, এমনটি কখনও মনে হয়নি।

বাবা ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুব। আমাদের নাক দিয়ে এক ফোঁটা কাঁচা জল ঝরলেও মাকে অতিষ্ঠ করে তুলতেন। শুধু আমাদেব কী বলি, কোন আত্মীয়স্বজনেব বিপদে অসুখে না ছুটতেন বাবা। নিজেব ভাইবোনদের জন্য তো বটেই, এ ছাড়াও যত নিকট-দূবের জ্ঞাতিগুষ্টি আছে. কারোব একটু খারাপ খবর পেলেই বাবা সেখানে হাজির।

মা ভীষণ চটে যেত। বলত. সাতজন্মে কে কবে তোমার খোঁজ রাখে? আমাদের হাঁড়ি চড়ছে কিনা ভুলেও দেখতে আসে কেউ?

বাবার এক উত্তর. কী করব. থাকতে পাবি না যে। বুকের ভেতরটা কেমন আনচান করে।

আত্মীয়স্বজনবা বাবাকে দেখে যে খুব গদগদ হয়ে পড়ত, তাও কিন্তু নয়। একবার তো মেজকাকার বাড়িতে বাবা যথেষ্ট অপমানিত হয়েছিলেন। ভাইঝির খুব কাশি হয়েছে শুনে কোথাও কোন ঝোপ ঘেঁটে গাদাখানেক বাসকপাতা ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই পাতার রস খেয়ে কাকাব মেয়ের গলা ফুলে ঢোল। পাতায় বোধহয় বিষাক্ত কিছু লেগে ছিল। কাকিমাব মুখে পাঁচ কথা শুনে বাড়ি এসে মুখ চুন করে বসেছিলেন বাবা।

মা বলেছিল, ঠিক হয়েছে। যাও আরও! গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল!

বাবার মুখ কাচুমাচু, আমি ওদের কাজের মেয়েটাকে পাতা ধুয়ে বাটতে বলেছিলাম। সে যদি ভুল করে...

—থামো তো! ওদের কি ওষুধ কিনে খাওয়ার পয়সা নেই, তুমি পাতা গেলাতে গেছ?

বাবার মুখে নির্ভেজাল হাসি, নেড়ির গলা একটু ফুলেছে, কিন্তু সত্যিই কাশিটা চলে গেছে গো। কাশতে কাশতে গলা চিরে গিয়েছিল বেচারীর।

তো এই ছিলেন আমাদের বাবা। যেচে অন্যের দায় নিজের ঘাড়ে নেওয়া, অকারণ উদ্বেগে আকুল, শিল্পসৌন্দর্য বিষয়ে রসকষবিহীন এক মাটো মানুষ।

কত ঘটনা যে আছে বাবার, বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যায়। কত পারিবারিক প্রলয় ঘটে গেছে বাবার জন্য। মারা যাওয়ার মাসচারেক আগে কী কাণ্ডটাই না হল! ছোড়দার ছেলের সামান্য জ্বর, তেমন কিছুই না, ওরকম জ্বরজারি বাচ্চাদের হয়ই, বাবা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দিনের বেলা টুটুলের মাথার কাছে বসে আছেন, ঠিক আছে—রাত্তিরেও যা শুরু করলেন, আধ ঘণ্টা অন্তর ছোড়দাদের দরজায় টোকা দিচ্ছেন।

—বাচ্চু, টুটুল ঘুমোল!

—এই বাচ্চু, একবার থার্মোমিটার দিয়ে জ্বরটা দ্যাখ!

—বাচ্চু, টুটুল কাশল কেন? সিরাপটা একটু খাইয়ে দে না?

একে শীতের রাত, বার বার লেপ ছেড়ে উঠতে হচ্ছে, তার ওপর বাবার প্যানপ্যানানিতে ছোড়দা ছোটবউদি ধৈর্যের শেষ সীমায়।

শেষমেশ ছোড়দা বলে উঠল, আহ্ বাবা, বিরক্ত কোরো না তো! টুটুল তোমার ছেলে নয়, আমাদের ছেলে, ওর ভাবনা আমাদেরই ভাবতে দাও।

ছোটবউদি ছ্যারছ্যার শুনিয়ে দিল,—সাধে কি দাদারা কেটেছে এখান থেকে? ওই আদরের অত্যাচার আর সহ্য হয় না!

মা কোনও দিন বাবার পক্ষ নেয় না, সেদিন ছোট বৌদির খোঁটায় দুম করে খেপে গেল, তোমাদের না পোষায় তোমরাও চলে যাও, কে আটকে রেখেছে?

এক কথা থেকে দু'কথা। দু'কথা থেকে চার কথা। ছোটবউদি পরদিনই ছেলে নিয়ে সোজা বাপের বাড়ি। তিনি না ফেরা পর্যন্ত ছোড়দারও মুখ এতখানি। বাড়ির লোকের সঙ্গে টোটাল নন-কোঅপারেশান।

আমি তখন বাবাকে বলেছিলাম, কী এক-একটা কাণ্ড করে বসো বলো তো? যেচে মান খোয়াতে তোমার ভাল লাগে?

বাবার কোনও তাপউত্তাপ নেই। বললেন, ওদের কথা গায়ে মাখলে চলে? রাগের মাথায় কী বলতে কী বলেছে, রাগ পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তোমার শিক্ষা হবে না বাবা। দাদার মতো ছোড়দাও যখন মানে মানে সরে পড়বে তখন টেরটি পাবে।

—কী যে তোরা বলিস! বাবলু কি শখ করে এ বাড়ির থেকে গেছে? নেহাত অফিসের কোয়ার্টারে না গেলে নয়, তাই না...

আমার আর বোঝানোর প্রবৃত্তি হয়নি। দাদা-বউদি যে পৃথক হবে বলেই চলে গেছে, অফিসের কোয়ার্টার পাওয়াটা একটা ক্যামোফ্লেজ, এ কথা বাবার মাথায় কোনওদিনই ঢোকেনি।

দাদার চলে যাওয়াতে আমি অবশ্য তেমন দোষ দেখি না। দাদার যে রকম বড় চাকরি, যে ধরনের মানুষের সঙ্গে দাদার ওঠা-বসা, ক্লাব-পার্টি, এ বাড়িতে থেকে সেটা মানাত না। তাও কি দাদা বাবার হাত থেকে ছাড়ান পেয়েছিল? দিব্যি কর্তাগিন্নি

মনের মতো করে আলাদা হয়েছে, সেখানেও প্রতিদিন সকাল না হতে গিয়ে বসে আছেন বাবা। এটা ঝাড়ছেন, ওটা পরিষ্কার করছেন, এই শোকেসের পুতুল ওই ক্যাবিনেটের মাথায় তুলছেন, যেন ওটা বাবার নিজেরই ফ্ল্যাট। দাদা বাড়িতে পার্টি দিল, সেখানেও হংসো মধ্যে বকো যথা হয়ে বসে আছেন বাবা! অফিসের লোকদের সামনে দুমদাম বেফাঁস মন্তব্য করে বসছেন! বাবলুটা আমার কমজোরি, ওকে যেন বেশি খাটাবেন না! অত মদ খাচ্ছেন কেন, মাতাল হয়ে যাবেন যে! দাদা তো খেপে মেপে এসে মাকেই শাসিয়ে গেল। বাবার যদি ও-বাড়ি যাওয়া বন্ধ না করো, তাহলে কিন্তু আমরা মুখের ওপব দবজা বন্ধ করে দেব। সে এক বিদিকিচ্ছিরি পরিস্থিতি।

দিদির সংসারেও কম কেচ্ছা কবে এসেছেন বাবা! দিদির শাশুড়িটাব আট বছব আগে সেবিব্রাল হয়েছিল, তারপব থেকে তিনি চব্বিশ ঘণ্টাই বিছানায। হাত নড়ে না, পা নড়ে না, পাশ ফিবতে গেলেও ফিরিয়ে দিতে হয়, কিন্তু মুখের কমতি নেই বুড়ির। বেডপ্যান দিতে পনেরো সেকেণ্ড দেরি হলে গালাগালির চোটে দিদির ভূত ভাগিয়ে দেবেন, অথচ তাঁর সব কিছু করতে হবে দিদিকেই। আয়া একটা বাখা আছে, তাকে দিয়ে চলবে না। ওই শাশুড়িব পিছনে খাটতে খাটতে দিদিব অ্যানিমিয়া হয়ে গেল। মুখ শুনতে শুনতে প্রেসাব লো। জামাইবাবু ভীষণ মাতৃভক্ত, সে মায়ের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই শোনে না। বাবা গিয়ে ঝপ করে একদিন তাকে বলে এল, তোমাদের আমি মেয়ে দিয়েছি বিপ্লব, ঝি দিইনি। তোমাব মা তো মরবেনই, তার সঙ্গে আমাব মেয়েটাকে মারছ কেন?

জামাইবাবুর সঙ্গে দিদির এই লাগে তো সেই লাগে। বাড়ি বয়ে এসে কেঁদে গেল দিদি, মা, বাবাকে থামাও। এমনিতেই প্রচুব অশান্তির মধ্যে আছি, তার ওপর উটকো ঝগড়া আর ভাল লাগে না।

বাবাকে থামানো কি সহজ কথা! বাবাব স্নেহের রথ ছুটবেই। এক অদ্ভুত বাস্তববোধহীন কাছাখোলা মানুষ ছিলেন বাবা।

বাবাকে দেখে আমরা লজ্জাই পেয়েছি চিরকাল। তাঁর দৃষ্টিহীনতায় আমাদেব মাথা হেঁট থেকেছে। তাঁকে দেখেই আমরা শিখেছি কী রকম হলে জীবনে ব্যর্থ হয মানুষ, আর কী রকমটি না হলে এই দুনিযায় প্রাপ্তিযোগের কমতি থাকে না।

আমরা কি চূড়ান্ত সফল? জানি না। তবে বাবাব মতো হেলাফেলার বস্তুও নই। পড়াশুনোয় আমরা ভালই ছিলাম। দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং করে মালটিন্যাশনাল কোম্পানির উঁচুতলার চাকুরে। ছোড়দা অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রিতে এম এস সি, নিজের কেমিক্যালসের কারখানা আছে। চালু ব্যবসা। আমাদের মধ্যে দিদি মার গলাটি পেয়েছিল, গানও শিখেছে মনপ্রাণ দিয়ে। এক জলসায় দিদির গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিল জামাইবাবু। পাত্র হিসেবে জামাইবাবু এ ক্লাস। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। নিজেরই ছোট ফার্ম, গাড়ি আছে, ফ্ল্যাটও। আমি কলেজে পড়াই। বিয়ে করিনি।

আমার বিয়ে না করার কারণটা কেউ স্পষ্ট জানে না। সকলের ধারণা ওই বেয়াড়া হাঁপানির টানটার জন্যই বিয়েতে আমার অনীহা। সেরকমই আমি বলতাম কিনা।

এ ছাড়া বলিই বা কী? জগৎসুদ্ধু লোককে কী করে বলে বেড়াই শৈবাল নামের

এক বোকা ছেলে আমাব অহঙ্কারেই আত্মহত্যা করেছে ! হুল্লোড়বাজ অপদার্থ ছেলেটা যদি একতবফা আমার প্রেমে পড়ে সে কি আমার দোষ ? প্রথম থেকেই তো আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম. তোমার লিমিট কেরানীগিরি, ইউনিভার্সিটির সেরা মেয়েটার দিকে চোখ তুলে তাকানো তোমার শোভা পায় না। শৈবাল শুনল কই ! অবুঝপনা কবত। বিরক্ত কবত। তুমি বিফিউজ কবলে আমি বিষ খাব! বেললাইনে গলা দেব! বাগ করে বলেছিলাম. সেটাও অন্তত কবে দেখাও। সত্যি সত্যি করে দেখিয়ে দিল ! উল্টোডাঙাব কাছে বেললাইনে দু'আধখানা হযে পড়ে বইল শৈবাল। পকেটে চিরকুট —কেউ দায়ী নয়।

কিছুটি জানতে পাবল না কেউ। আমার দিকে আঙুলও তুলল না। শুধু আমার ফুসফুসটা কেমন কমজোরি হযে গেল। সর্বনাশা রোগ বাসা বাধল শরীরে। কতবার নিজেকে বলেছি. একটা নিপাট মূর্খেব জন্য কষ্ট পাওযাব কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু বুককে চাবকে সিধে কবি সে জোব আমার কোথায় ? নিজে-নিজেই পুড়ি আমি। নিজের মধ্যেই রচনা কবি এক অকারণ যন্ত্রণাব বৃত্ত।

একমাত্র বাবাই কি আন্দাজ কবেছিলেন কিছু ? নাহলে মৃত্যুর বছরতিনেক আগে কেন হঠাৎ বললেন. বোগটা তোব কী করে এল রে পুতুল ? এ কষ্ট তো আগে ছিল না তোর ! আমাদের বংশেও তো কারও এ বোগ নেই !

মনে আছে তখন শীতকাল। পিঠে তিনটে বালিশ নিযে কুকুবের মতো হাঁপাচ্ছি আমি, হিমকণা জমাট বেঁধেছে বুকে। অজান্তেই জল ঝবছে চোখ বেযে। তবু প্রাণপণে হাসাব চেষ্টা কবেছিলাম. শহরে যা পলিউশন। এ অসুখ এখন ঘরে ঘরে !

বাবা আমাকে দেখছিলেন। হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন মাথায়। কেউ যেন শুনতে না পায় এমন নিচু স্ববে বললেন, মনের কষ্ট চেপে রাখিস না পুতুল, উগরে দে।

বাবা কি জেনেছিলেন কিছু ! না নিছকই অনুমান !

অনুমান, না অনুভব !

আমার অন্ধ বাবাব কি তৃতীয় নয়ন ছিল !

তিন

বাবার শ্রাদ্ধশান্তি হয়েছিল খুব ঘটা করে। আমরা চার উপযুক্ত ছেলেমেয়ে প্রচুর খরচা করেছিলাম শ্রাদ্ধে। চারদিকে যত আত্মীয়-পরিচিত আছে, সব্বাইকে বলেছিলাম। সে প্রায় শ'পাঁচেক মতো হবে। নিয়মভঙ্গের দিনও দেড়শো পাত পড়েছে। কেটারার দিয়ে মাছ মাংস পোলাও মিষ্টি, সে এক এলাহি আয়োজন। সব শেষে বাবা যা যা খেতে ভালবাসতেন সব একটা থালায় সাজিয়ে ছাদে রেখে আসা হয়েছিল। স্বচক্ষে দেখেছি কাকের পাল এসে খেয়ে গেল সবটুকু।

বাবা তৃপ্ত হলেন। আমরাও।

কিছুদিন পর থেকে কয়েকটা ঘটনা ঘটতে শুরু করল। ঘটনা ঠিক নয়, হয়তো এগুলো হওয়ারই ছিল। কিন্তু এমনভাবে ঘটতে থাকল, আমরা নজর না করে পারলাম

না। বেশ কিছুদিন ধরে দাদা কোম্পানিতে একটা লিফট পাওয়ার জন্য ছটফট করছিল, হঠাৎ পেয়ে গেল। এক ধাপ নয়, একেবারে কয়েক ধাপ। কোম্পানির বাঙ্গালোরের ফ্যাক্টরির প্রায় কর্ণধার হয়ে বসল দাদা। বছরখানেক ধরে ছোড়দা কেমিকাল এক্সপোর্টের চেষ্টা চালাচ্ছিল, হঠাৎই একসঙ্গে তিন দেশ থেকে অর্ডার—বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, তাইল্যাণ্ড। কয়েক কোটি টাকার অর্ডার, ছোড়দা যা কখনও কল্পনা করেনি। দিদির শাশুড়ি, যাঁর সম্পর্কে ধারণা ছিল তিনি অন্তত হাজার বছর বাঁচবেন আর বিছানায় শুয়ে অবিরাম মানসিক অত্যাচার চালাবেন দিদির ওপর, ঝুপ করে এক ঘুমের মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন চিরতরে।

সবই ঘটল বাবার মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে।

আমার মধ্যেও এক অভিনব পরিবর্তন এল। বাবা চলে যাওয়ার ক্ষণেই শেষ দেখা দিয়েছিল টানটা, তারপর থেকে যেন একেবারে হাল্‌কা হয়ে গেছে। গরমকাল আর বর্ষাকাল—একটি বারের জন্য পাথর-চাপা-ভাবটা ফিরল না। রুক্ষ, গোঁড়া মেজাজি বলে আমার বদনাম ছিল, কারও সঙ্গে মিশতে ভাল লাগত না, সবটাই কি শারীরিক কারণে? হয়তো না। মনেও বোধহয় কিছু বাধা ছিল। আচমকা আবিষ্কার করলাম, দিব্যি হাসিখুশি হয়ে গেছি আমি। জোরে জোরে কথা বলছি, হাসতেও ভাল লাগছে আমার। মাঝেমধ্যে দু'একটা গানের কলিও গুনগুন করছে বুকে।

মাও যেন আর ঠিক আগের মতো নেই। মাকে আমি কোনও দিনই বেশি কথা বলতে দেখিনি, কেজো সাংসারিক কথা ছাড়া মার যেন কোনও কথা থাকত না। সেই মাকে দেখি আমি কলেজ থেকে ফিরলেই কত হাবিজাবি গল্প করে আমার সঙ্গে। ছেলেবেলার কথা, দাদু, দিদা, মামা-মাসিদের গল্প, আরও কত কী যে! কবে একবার ছাতুবাবুর বাজারে চড়কের মেলায় গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল, গরমের ছুটিতে কোন নস্যিবুড়ির গাছ থেকে জামরুল পাড়তে যেত, কুয়োয় ঘটি পড়ে গেলে কোত্থেকে ঘটিতোলা এসে হাজির হয়ে যেত, এরকম অজস্র গল্পের ঝাঁপি খুলে বসত মা।

মার মধ্যেও এত গল্প জমা ছিল! নাকি আমাকে খুশি দেখেই মার ওই অর্গলমুক্তি! ছোটতে তো আমি হাসিখুশিই ছিলাম, তখন মার মুখে ওসব গল্প শুনিনি কেন? মার সুখের স্মৃতি কি হঠাৎ উথলে উঠল?

দাদা ছোড়দা দিদি মা, এমনকি আমার জীবন থেকেও অনেক অবরোধ সরে যাচ্ছিল। খুব দ্রুত। এত দ্রুত যে কাকতালিয় বলে মনেই হয় না। ধন্দ জাগে।

কে ওই অবরোধ সরাচ্ছিল—মনের, বাইরের পৃথিবীর?

বাবা।

চার

পুজোর পর বাঙ্গালোর থেকে দাদার চিঠি এল। চিঠিতে দাদা এক অদ্ভুত কথা লিখেছে। বাবাকে নাকি পর পর তিন চার দিন দেখতে পেয়েছে দাদা। রোজ কাকভোরে দাদা সামনের পার্কে জগিং করতে যায়, সেখানেই নাকি বসে থাকেন বাবা। একটা পাথরের

বেঞ্চিতে। কাছে গেলেই মিলিয়ে যান।

আমরা পড়ে খুব হাসাহাসি করলাম। ছোড়দা বলল, দাদার কত বয়স হল রে?

—কত আর! মাই জবাব দিল, এই তো পৌষে তেতাল্লিশ পুরে চুয়াল্লিশে পড়বে!

—ওহ্, তাহলে নির্ঘাত চালশে ধরেছে। চশমা নিতে লিখে দাও।

আমি বললাম, যাহ্। চালশে হলে তো কাছের জিনিস দেখতে অসুবিধে হয়, দূরের জিনিস ভুল দেখবে কেন?

ছোট বউদি বলল, আমার মনে হয় দূর বিদেশে আছেন... দাদার বোধহয় বাবাকে এখন মনে পড়ে।

টুটুল সাত বছরেই সর্বজ্ঞ। সে বলল, তোমরা কিচ্ছু জানো না, এই সময়ে ভোরে খুব কুয়াশা থাকে, জেঠু কী দেখতে কী দেখেছে!

ব্যাপারটা হাসি-ঠাট্টাতেই ধামাচাপা পড়ে গেল। সাতদিন যেতে না যেতে দিদি একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে উদয় হল বাড়িতে। কী কাণ্ড, পরশুদিন নিউ মার্কেট থেকে বাজার করে বেরোচ্ছি, হঠাৎ দেখি বাবা! উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো ভাবলাম মনের ভুল। হয়তো বাবার মতো দেখতে অন্য কেউ। আমি যখন রাস্তা পেরোচ্ছি, তখনও বাবা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি চোখ টিপলাম, তুই আজকাল জামাইবাবুর দেখাদেখি চুমুক-টুমুক দিচ্ছিস নাকি?

—নারে! আজকেও দেখলাম! মিতুনকে নাচের স্কুলে দিয়ে ফিরছি, দেখি ঢাকুরিয়া ব্রিজ দিয়ে হেঁটে আসছে বাবা—আমার দিকে! খুব কাছে এসে হঠাৎ উবে গেল!

হাসতে হাসতে বললাম, জামাইবাবুকে বলেছিস?

—কী বলব? বাবার কথা? ও তো হেসে উড়িয়ে দেবে!

আমি দিদির কাঁধে চিমটি কাটলাম, তোর তো কপাল ভাল রে! বাবাকে দেখেছিস, ভাগ্যিস তোর শাশুড়ি দেখা দেননি!

মা চুপ করে শুনছিল। কিছু বলল না।

রাত্রে ছোড়দাকে শোনালাম গল্পটা। ছোড়দা আগের বারের মতো হাসল না, বরং খানিকটা গম্ভীরই হয়ে গেল। বলল, আমি তোদের একটা কথা বলিনি পুতুল! বাবাকে আমিও দেখেছি। বেশ কয়েকবার। একদিন ট্রামের পাদানিতে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি সিট থেকে উঠে এগিয়ে যেতেই ভ্যানিশ। একদিন এসপ্ল্যানেডে দেখলাম। মনোহর দাস তড়াগের পাশে গম্বুজগুলো আছে না, তার নীচে দাঁড়িয়ে। আমাকেই দেখছিল। পাশে দু'তিনটে ছেলে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, তারা কিন্তু কেউ বুঝতে পারছে না ওখানে আরেকটা মানুষ আছে!

ছোট বউদিও চিন্তিত, হ্যাঁ, তোমার ছোড়দা ক'দিন ধরে ঘুমোতে পারছে না। বলতে বারণ করেছিল, তাই বলিনি। কী করা যায় বলো তো?

আমি কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না। বুকের ভেতরটা কেমন যেন শিরশির করছিল। এরা যা বলছে তা কি কখনও সত্যি হতে পারে? এতগুলো লোক একসঙ্গে হ্যালুসিনেশনও দেখবে কী করে?

কলেজ খোলার পরদিনই আমার পালা এসে গেল। ছুটির পর কলেজের ফাঁকা করিডোর দিয়ে হেঁটে আসছি, বাইরের বাগানে স্পষ্ট দেখতে পেলাম বাবাকে। একটা গাঁদাগাছের পাশে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে ধুতি আর ফুলহাতা শার্ট, যেমনটি নিত্যই থাকতেন। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে আছে বাবার, যেন কিছু বলছেন।

আমি কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। চমকটুকু কাটিয়ে পলকে ছুটে গেছি বাগানের দিকে। নেই—কোত্থাও কেউ নেই! কুঁড়িভরা গাঁদাফুলের গাছ শুধু দুলছে হাওয়ায়!

কলেজ থেকে ফিরেই মাকে কথাটা বললাম। মা যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, আমি জানি সে আমাদের ছেড়ে যায়নি।

—তুমিও কি দেখেছ নাকি?

—নাহ। মা মাথা নাড়ল, তবে সব সময়েই মনে হয় আশেপাশেই কোথাও আছে, এই ঘাড় ঘোরালেই দেখতে পাব।

পরদিন সন্ধেবেলা দিদিকে ডেকে জরুরি মিটিং বসল একটা। আমরা কেউই আমাদের চোখের দেখাটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছি না, কিন্তু আমাদের সকলেরই মনে হচ্ছে বাবা যেন কিছু বলতে চান। যদি সত্যিই আত্মা বলে কিছু থাকে, তাহলে তো তাঁর কথা আমাদের শোনা উচিত। আমরা শেষ মুহূর্তে বাবার কাছে কেউ পৌঁছতে পারিনি, নিশ্চয়ই বাবা খুঁজেছিলেন আমাদের। হয়তো বাবার কিছু বলার ছিল।

অনেক ভেবেচিন্তে দাদাকে টেলিফোন করলাম। কী করা যায়?

দাদা তেমন সদুত্তর দিতে পারল না। বলল, তোরা যা করবি, তাতে আমিও আছি। আমারও বড় অস্বস্তি হচ্ছে রে।

কয়েক মাস দোলাচলে কাটল। ঘনিষ্ঠ দু'চারজনের সঙ্গে আলোচনা করা হল, একেকজন একেক রকম পরামর্শ দেয়। কেউ বলে, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে এসো। কেউ বলে, বাড়িতে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করো, হোমযজ্ঞের ঠেলায় অতৃপ্ত আত্মা পালাতে পথ পাবে না। গোটা ব্যাপারটাকে উপেক্ষাও করতে বললে কেউ কেউ। তাদের মতে সময় গেলে মন স্থির হবে, তখন নিজেরাই আমাদের মনের ভুল বুঝতে পারব।

কোনও পরামর্শই আমাদের ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। যেমনই আলোভোলা মেঠো মানুষ হোন বাবা, তাঁকে কি ভূত বলে ভাবা যায়?

আরও কিছুদিন কাটল। ধীরে ধীরে বাবার দর্শন পাওয়ার হারটাও কমে আসছিল। দশদিন পনেরোদিন অন্তর হঠাৎ হয়তো কেউ একজন দেখতে পায় বাবাকে। মেট্রো রেলের স্টেশনে। লেকের পাড়ে। চৌরাস্তার মোড়ে।

বাবার বাৎসরিকের দিন-কুড়ি আগে ছোড়দা একটা কথা তুলল। ছোড়দার বন্ধুর কে এক মামা আছেন, তিনি নাকি সরাসরি আত্মার সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন। টাকা পয়সার কোনও ব্যাপার নেই, তিনি নাকি সাধুসন্ন্যাসীও নন, এ নাকি তাঁর এক বিচিত্র খেয়াল। ছোড়দার কয়েকজন বন্ধুও নাকি ওই ভদ্রলোকের মাধ্যমে আত্মার সঙ্গে কথা বলেছে। যদি আমরা চাই, ছোড়দা তাহলে আমাদের পারিবারিক ঘটনা নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করবে।

দিদি তো খুবই রাজি। আমিও নিমরাজি হয়ে গেলাম। মাও বিশেষ আপত্তি করল না।

ছোড়দা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে এল। ভদ্রলোক বললেন, তিনি আসবেন। বাবার বাৎসরিকের দিন রাত্রিবেলা। আমাদের সব ভাইবোন আর মাকে উপস্থিত থাকতে হবে।

দাদাকে জানানো হল।

অধীর আগ্রহে বাৎসরিকের দিনটার প্রতীক্ষায় রইলাম আমরা। দিন যায়, বুক কাঁপে। বুক কাঁপে, দিন যায়।

কী বলার আছে বাবার?

পাঁচ

বাৎসরিকে প্রাণ ছিল না। কোনওভাবে নমো নমো করে শেষ হল কাজটা। আমাদের বুক গুড়গুড় করছিল, অতি সহজ কাজেও ভুল হয়ে যাচ্ছিল বারবার। পিণ্ডদানের সময়ে দাদার তো স্পষ্টতই হাত কাঁপছিল। সামান্য ক'জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া কাউকে নিমন্ত্রণ করিনি এবার, তারা সবাই খাওয়াদাওয়া করে চলে যেতেই আমরা টানটান।

অপেক্ষা করছি সন্ধ্যার।

সন্ধ্যা এল। গড়িয়ে গড়িয়ে পার হচ্ছে। যেন ভয় পাচ্ছে এগোতে।

সাড়ে আটটা নাগাদ ভদ্রলোক এলেন। সুপুরি গাছের মতো লম্বা চেহারা। ঋজু। কৃশ। দেখে বোঝা যায় গায়ের রং একসময়ে টকটকে ফর্সা ছিল, এখন তামাটে। বয়স বছর ষাটেক, কিংবা তার কিছু বেশি। চোখ দুটো ভীষণ তীক্ষ্ণ। ঈগলনয়ন।

আমাদের সঙ্গে নিয়ে মার ঘরের দরজা বন্ধ করলেন ভদ্রলোক। নিজে মেঝেতে বসলেন, আমাদেরও বসতে বললেন ভূমিতে। ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা মাটির প্রদীপ বার করে সামনে রাখলেন, সঙ্গে এক শিশি রেড়ির তেল, খানিকটা তুলোও। প্রদীপে তেল ঢেলে তুলোর সলতে পাকাচ্ছেন।

এ কেমন প্ল্যানচেট! তেপায়া টেবিল নেই! মোমবাতি নেই!

ভদ্রলোক মুখ তুলছেন না, কী যেন বিড়বিড় করছেন। প্রদীপের দিকে দৃষ্টি রেখে বললেন, ঘরের আলো নিবিয়ে দিন। পাখা বন্ধ করুন।

আলো নিবতেই অন্ধকার ঝেঁপে এল। ছমছম আঁধারে মার গা ঘেঁষে বসেছি আমরা—দাদা ছোড়দা দিদি আমি।

ভদ্রলোক প্রদীপ জ্বাললেন। শিখা একটু একটু করে উজ্জ্বল, কাঁপতে কাঁপতে স্থির হল একসময়ে। প্রদীপের শীর্ণ আলোয় চেনা ঘরটাকেও কেমন রহস্যময় লাগছিল। দেওয়ালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছায়া। ছায়ামূর্তিগুলো কি আমরাই!

ভদ্রলোকের ভারী স্বর শোনা গেল, আপনারা প্রদীপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন।

পীতবর্ণ শিখা দেখছি আমরা। বিভ্রম জাগছে চোখে। শিখা কি রং বদলাচ্ছে! এই তো হলুদ ছিল! এই নীল! নাকি লাল!

জলদগম্ভীর স্বর বাজল আবার, দেখছেন?

সমস্বরে বললাম, দেখছি।

—এবার আপনারা তাঁর মুখ স্মরণে আনুন। ওই শিখাতেই দৃষ্টি রেখে।

বাবার মুখ মনে করার চেষ্টা করছি। কী আশ্চর্য, কোনও মুখই মনে আসে না কেন? শৈশবের দেখা মুখ নয়, কৈশোরের নয়, যৌবনেরও নয়! প্রাণপণে মনঃসংযোগের চেষ্টা করলাম। কিছুই স্মরণে আসে না। চুরি করে দেওয়ালের দিকে তাকালাম। ও হরি, বাবার ছবিটা তো আজ বাৎসরিকের জন্য বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে! ছবিটা যেন কেমন? ভাঙা-ভাঙা চোয়াল! চশমাপরা চোখ! চুল পাটপাট করে আঁচড়ানো! কিন্তু বাবার মুখটা কোথায় গেল? যত ভাবার চেষ্টা করি অন্য মুখ ফুটে ওঠে! শৈবাল!

কেমন যেন সংশয় হল। ঝট করে একবার দিদি-দাদাদের দেখে নিলাম। তাদের চোখের মণিও ইতিউতি ঘুরছে। দিদির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই আবার চোখ রেখেছি শিখায়।

ভদ্রলোক বললেন, আপনারা নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্তপ্রিয়বাবুর মুখ মনে করছেন তো?

সত্যি বলতে সঙ্কোচ হল। বললাম, হ্যাঁ।

কথাটা যেন কোরাসে বেজে উঠল। আবছায়া মাথা ঘরে মাথা খুঁড়ছে বার বার। একমাত্র মা'ই নির্বাক। যেন সমাধিস্থ।

—এবার তা হলে আপনাদের কাছে আসবেন তিনি। কথা বলবেন।

সময় যাচ্ছে। সময় বয়ে যাচ্ছে। কতক্ষণ বসে আছি আমরা? দশ মিনিট? বিশ মিনিট? অনন্ত কাল?

কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। উঁহু, পাচ্ছি। দুটো চোখ। গলে বেবিয়ে এসেছে কোটর থেকে। চোখের জায়গায় দুটো গর্ত। কুচকুচে কালো। নিবিড় অন্ধকারের মতো কালো।

ভদ্রলোকের মুখমণ্ডল ক্রমশ কঠিন হচ্ছিল। চোয়ালে চোয়াল ঘষছেন, নিশ্বাস ফেলছেন ঘন ঘন। কেমন যেন নির্দয় দেখাচ্ছিল তাঁকে। একসময়ে গমগমে স্বরে বলে উঠলেন, আপনাবা মিথ্যে কথা বলেছেন। আপনারা আমার সময় নষ্ট করছেন।

আমরা নিরুত্তর। পাথরে ঘা খেয়ে ফিরে গেল কথাটা।

হাতের ঝাপটায় প্রদীপ নিবিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। নিকষ কালিমায় ছেয়ে গেল ঘর। যেন ঘর নয়, কয়লাখনিব ভয়ঙ্কর খাদান।

কালো অন্ধকার গর্জে উঠল, চিত্তপ্রিয়বাবু আসবেন না। তিনি আপনাদের মধ্যে তো ছিলেনই না কোনও দিনও।

দাদা মিনমিন করে বলল, তাহলে আমরা তাঁকে দেখি কী করে?

—চোখ আর কতটুকু দেখে! দেখে তো মন! মনকে জিজ্ঞাসা করুন, উত্তর পেয়ে যাবেন!

অলৌকিক বাতাসের মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। আমরা নিথর বসে আছি। মা'ও। চৈত্রের তাপে ঘামছি দরদর। আলো জ্বালাতে ভয় পাচ্ছিলাম আমরা। যদি পরস্পরের মুখ দেখে ফেলি! যদি ধরা পড়ে যাই!

ক্রমশ একটা শব্দ শোনা গেল। কান্নার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মা। ফ্যাসফেসে একটা আওয়াজ বেরোচ্ছিল মার গলা দিয়ে, অস্ফুটে কী যেন বলছিল মা, আমরা শুনতে পাইনি।

আমাদেরও চোখ ভিজে যাচ্ছিল। বাবাকে আমরা আদৌ দেখিনি কখনও। মৃত্যুর আগেও না, পরেও না। যা দেখেছি তা এক নির্জন ভালবাসার অলীক ছায়া।

আমরা কষ্ট পাচ্ছিলাম। বাবার মৃত্যুতে সেই আমাদের প্রথম শোক।

বাবা শুধু একা-একাই মারা যাননি। বাবা বেঁচেও ছিলেন বড় একা।

মধ্যবিত্ত

বাড়ি ফিরে ধরাচূড়ো ছাড়ছিল শুভেন্দু। বুধবারটায় বড় কাহিল দশা হয় তার। কলেজ ছুটির পর তিন ব্যাচ টিউশনি থাকে, দুটোই অনার্সের ব্যাচ। শুধু নোট দিলেই হয় না, জনা পনেরো ছেলের সঙ্গে বকতেও হয় বহুক্ষণ। মাথা পুরো মহাশূন্য হয়ে যায়। তারপর মিনিট পঞ্চাশ শহরতলির ট্রেন উজিয়ে যাদবপুর. নেমে গদগদে ভিড় ঠেলে চার-পাঁচ মিনিট হাঁটা। এরপর কি আর শরীর চলে!

অর্চনা ড্রয়িংরুমে। কেবল টিভির সিনেমায় মগ্ন। ঝিমলির মাস্টারমশাই এসেছেন. মেয়ে পড়ছে পাশের ঘরে. শব্দ তাই কমানো আছে টিভিতে। তবু মাঝে মাঝে মৃদুমন্দ বাজনা শোনা যায়. গানের কলিও।

পর্দা সরিয়ে উঁকি দিচ্ছে সরস্বতী। নতুন কাজের মেয়ে। বারোদিনের ফাইফরমাশ খাটার জন্য মাসখানেক হল জোগাড় করা গেছে শালীর দৌলতে। বারুদিঘি না বাগচক কোথায় যেন বাড়ি। বছর দশ-এগারো বয়স মেয়েটার. শ্যামলা রং. মুখখানি ভারি ফুটফুটে।

শুভেন্দু হ্যাংগারে শার্ট টাঙাতে টাঙাতে বলল—কীরে. কিছু বলবি?

—তুমি চা খাবে মামা?

—কে করবে? তুই?

মেয়েটা ফিক করে হাসল.—আমি চা করতে শিখে গেছি।

—বাহ, তুই তো খুব কাজের হয়ে গেলি রে!

—আমি গ্যাস জ্বালানোও শিখে গেছি। নেবাতেও পারি।

সরস্বতীর লাজুক উচ্ছ্বাসে মজা পেল শুভেন্দু। দিব্যি বুলি ফুটে গেছে মেয়েটার। মনে হচ্ছে এবার অর্চনার কপাল ভাল. মেয়েটা বোধহয় টিকেই গেল। ওফ. প্রথম কদিন এই মেয়ে নিয়েও যা ভোগান্তি গেছে! সকাল নেই. সন্ধে নেই—সারাক্ষণ দরজার আড়ালে গিয়ে ফ্যাঁচফ্যাঁচ কান্না। খেতে দিলে কাঁদে, শুতে বললে কাঁদে. টিভি দেখতে ডাকলেও কাঁদে. সে এক যমযন্ত্রণা! অর্চনা তো এক সময়ে ঠিকই করে ফেলেছিল মেজদির বাড়িতে ফিরিয়েই দিয়ে আসবে সরস্বতীকে। যার নাড়িছেঁড়া ধন সে এসে বাবা ফেরত নিয়ে যাক দেশে। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

নাহ, শহরের জলবাতাসের গুণ আছে!

শুভেন্দু আলগোছে ঘড়ি দেখল। নটা বাজতে দশ। দশটার টিভি সিরিয়াল শেষ না হলে খেতে বসা হবে না। এখন এক কাপ চা খাওয়াই যায়। স্মিতমুখে বলল, —ঠিক আছে কর। দেখিস গ্যাস সাবধানে জ্বালাস।

সরস্বতী প্রায় উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছিল, কী মনে করে তাকে ডাকল শুভেন্দু। বলল,— দিদির মাস্টারমশাইকে জলখাবার দেওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ। মামী অফিস থেকে ফেরার সময়ে মিষ্টি এনেছিল।

মিষ্টি! বেয়াল্লিশ বছরের অল্প ভুঁড়ি হওয়া পেটে আলগা হাত বোলাল শুভেন্দু।

এক মুহূর্ত ভেবে বলল,— হ্যাঁরে সরস্বতী, তুই ওমলেট বানাতে পারিস?

—ওমলেট!

—হ্যাঁ-আ—ডিমভাজা!

বোকা বোকা মুখে দু'দিকে ঘাড় নাড়ল সরস্বতী।

—এত সিম্পল কাজটা এখনও শিখিসনি! শুভেন্দুর মুখে আফসোসের শব্দ, —খুব সোজা রে। ডিমটাকে ফাটিয়ে... গুলে... একটু নুন দিয়ে ভাজতে হয়। সসপ্যানে এক চিমটি তেল দিয়ে নিবি, তেল গরম হলে ডিম ছাড়বি...সঙ্গে একটু পেঁয়াজকুচি লঙ্কাকুচিও দিতে পারিস...না দিলেও চলে...

সরস্বতী মন দিয়ে শুনছে, কিন্তু কিছু বুঝছে বলে মনে হয় না। শুভেন্দু হেসে ফেলল,—থাক, তুই আমাকে বরং দুটো বিস্কুট দিস।

—মিস্টি বিস্কুট না নোন্তা বিস্কুট?

—নোনতা।

সরস্বতী চলে যাচ্ছিল, আবার তাকে ডেকেছে শুভেন্দু,—আমার তোয়ালেটা ওই বাথরুমে আছে তো রে?

এক পলক ভেবে সরস্বতী বলল,—না তো। যমুনামাসি কেচে দিয়েছিল, বারান্দায় শুকোতে দিয়েছি। এনে দেব?

—উঁহু। চা করার আগে ওটা একটু বাথরুমে রেখে দিয়ে যা, কেমন?

নব্বই ডিগ্রি ঘাড় হেলিয়ে চলে গেল সরস্বতী।

বৈশাখ চলছে। প্রখর বৈশাখ। রাত নটাতেও দিনের তাত মরেনি। শুভেন্দুর গা হাত পা চিটপিট করছিল। ক'দিন ধরে হিউমিডিটিও বেড়েছে বটে, পাখার হাওয়াও গায়ে লাগে না। সারাক্ষণ বিজবিজে ঘাম। প্রতি গ্রীষ্মে নিয়ম করে ঘামাচি বেরোয় শুভেন্দুর, চুলকে চুলকে গা লাল হয়ে যায়। ভাগ্য ভাল, এ বছর আক্রমণটা শুরু হয়নি!

শুভেন্দু স্নানে গেল।

বছর তিনেক হল ফ্ল্যাটটা কেনা হয়েছে। বড় নয়, আবার খুব ছোটও নয়, মাঝারি মাপের। সিঁড়ি প্যাসেজ সব ধরে সাতশো ষাট। টু রুম ড্রয়িং ডাইনিং। তিনজনের সংসারে এর বেশি আর কী লাগে! ঘর দুটো মোটামুটি বড়ই। বাপ মার তেরো বারো, মেয়ের বারো-বারো। বসার জায়গাটা নিয়ে একটু মন-খুঁতখুঁত আছে অর্চনার, আরেকটু ছড়ানো হলে যেন ভাল হত। তা সব কি আর মনের মতো হয়! ডাইনিং স্পেসটা বেশ কায়দার—এল শেপের। বসার জায়গা থেকে খাবার টেবিল দেখা যায় না, বাড়ির একটা আব্রু থাকে। ব্যালকনিটাও যথেষ্ট চওড়া, লাইন দিয়ে সেখানে টব রেখেছে অর্চনা। বাথরুম দুটো। শুভেন্দুর ঘরের লাগোয়াটা বড্ড ছোট, তৃপ্তি করে স্নান করা যায় না—রাতবিরেতে শুধু কাজে লাগে। মাথার ওপর শাওয়ার থেকে বৃষ্টিধারা ঝরবে, হাত পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিটি রোমকূপে শুষে নেওয়া যাবে জলকণা, তবেই না সুখ!

স্নানের পর ঘাড়ে গলায় হালকা পাউডার থুপে অর্চনার পাশে এসে বসল শুভেন্দু। নীচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল,—মাস্টারমশাই আজ কখন এসেছেন?

রঙিন পর্দায় বিরহের দৃশ্য চলছে। মহীশূরের বৃন্দাবন গার্ডেনে গান গেয়ে গেয়ে

কাঁদছে নায়িকা, একই গানের পরের লাইন মুম্বই-এর জুহু বিচে বসে গাইছে নায়ক, যুগল অশ্রুতে পর্দা প্রায় ভিজে যায়-যায়।

অর্চনা বিরহ থেকে চোখ সরাল না, বলল,—পৌনে আটটা।

—অনেকক্ষণ পড়াচ্ছেন তো আজ?

—দেড় ঘণ্টা তো পড়ানোরই কথা!

—হুম, তা ঠিক। তবে এই তো সবে নতুন ক্লাস শুরু হল...

অর্চনা ঘুরে তাকাল,—ঝিমলির এখন ক্লাস নাইন, স্যার। গোড়ার দিকে লুজ দিলে পুরো মাধ্যমিক ঝরঝরে হয়ে যাবে।

সরস্বতী চা-বিস্কুট নিয়ে এসেছে। কাচবসানো বেতের সেন্টার টেবিলে কাপ প্লেট রাখল সাবধানে।

অর্চনা ভুরু কোঁচকাল,—কীরে, মামাকেই শুধু চা দিলি? আমাকে দিবি না?

ছোট্ট করে হাসল সরস্বতী,—তোমারও করেছি। আনছি।

চা খাচ্ছে দু'জনে। সরস্বতী টিভির একদম সামনেটায় গিয়ে বসল মেঝেতে। ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে আছে পর্দার দিকে। চোখ স্থির।

পিছন থেকে শুভেন্দু হাসতে হাসতে বলল—কী দেখছিস রে সরস্বতী?

—টিবি।

—টিভি তো বুঝলাম, টিভিতে কী দেখছিস?

সরস্বতী শরীর মোচড়াল,—টিবি।

হাহা হেসে উঠল শুভেন্দু। অর্চনা বলল,—খুব টিভি দেখার নেশা হয়েছে মেয়ের!

শুভেন্দু বলল,—বেশ চাম্পুও হয়ে উঠেছে।

—কীরকম?

—দেখলে না, বলতে হল না, ঠিক দু'কাপ চা করে ফেলেছে! বুঝে গেছে মামা চা খেলেই মামী খাবে।

—অথবা মামী খেলে মামা! অর্চনা ঠোঁট টিপে হাসল,—এসব দেখতে তো ভাল লাগে, শেখাতে কম পরিশ্রম করতে হয়!

শুভেন্দু ফুট কাটল,—সে তো পরিশ্রম হালকা করার জন্য পরিশ্রম!

—তাই একটু চেষ্টা করো দ্যাখো না, বুঝবে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা কত কঠিন!

—হয়ে যাবে। এক মাসে যথেষ্ট প্রগ্রেস হয়েছে।

—এক মাসে মেয়েটার চেহারাটাও কত চকচকে হয়ে গেছে, দেখেছ?

—হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। পেটভরে খেতে পাচ্ছে, ভালমন্দ খাওয়া... তেল মাখছে, সাবান মাখছে...। দেশে কি আর এসব জুটত?

—মেজদি বলছিল, পরের বোনটাকেও নাকি ওর মা কাজে লাগিয়ে দেবে। একটা ভাল বাড়ি খুঁজছে।

—ভাবো একবার! কতটা হেলপ্‌লেস্‌ অবস্থায় পড়লে একটা মা তার বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের লোকের বাড়ি খাটার জন্য পাঠায়। চা শেষ করে শুভেন্দু সিগারেট খুঁজছে। ডাকল সরস্বতীকে,—অ্যাই, ঘর থেকে আমার সিগারেট-দেশলাইটা এনে দে তো!

দৌড়ে ঘর থেকে সিগারেট-দেশলাই এনে দিল সরস্বতী।

অর্চনা বলল—যা, কাপডিশগুলো নিয়ে যা, ধুয়ে রাখ্। দেখিস বাবা, ভাঙিস না।

অতি সন্তর্পণে কাপ ডিশ নিয়ে চলে যাচ্ছে সরস্বতী, সেদিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাল শুভেন্দু। ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—তোমাকে বলি না মাঝে মাঝে, আমরা হলাম গিয়ে প্রিভিলেজড ক্লাস! সুন্দর ফ্ল্যাটট্যাট হাঁকিয়ে বসে আছি, মেয়েকে নামী স্কুলে পড়াচ্ছি, বছরে দু'বার পুরী সিমলা ঘুরছি... আমাদের একটা মেয়ের পেছনে খরচা কত বলো? হাজারের ওপর! আর এই মেয়ে, অ্যাট দিস টেণ্ডার এজ, আর্নিং ফর দ্য ফ্যামিলি! এই যে ডিসক্রিপেন্সিটা তৈরি হচ্ছে, এটা কি সোসাইটির পক্ষে ভাল? কোনও সমাজ এভাবে টিকতে পারে না।

—এর জন্য দায়ী আমাদের ইকনমিক সিস্টেম।

—ইকনমিক সিস্টেমই বলো, আর পলিটিকাল সিস্টেমই বলো—সব একদিন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে যাবে। দেশের এইট্টি পারসেন্ট লোক পভারটি লাইনের নীচে থাকবে, আর কুড়ি পারসেন্ট লোক বসে বসে পোলাও মাংস খাবে—এটা কোন কাজের কথা?

ঝিমলির মাস্টারমশাই বেরিয়ে গেলেন। মাস্টারমশাইকে এগিয়ে দিয়ে টাং করে টিভির সামনে এসেছে ঝিমলি—ইশ, তোমরা চ্যানেল ঘোরাওনি এখনও? আদ্যিকালের একটা ফিল্ম দেখছ বসে বসে? বলেই টক টক সেন্টার ঘোরাচ্ছে। মনোরম এক শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে এসে থামল—এক্ষুনি এখানে সিরিয়ালটা শুরু হবে!

অর্চনা হাঁক দিল—সরস্বতী, ফ্রিজ থেকে তরকারিগুলো বার করে ফ্যাল।

রান্নাঘর থেকে মিহি গলায় উত্তর এল, রেখেছি মামী।

—গুড। যখন বলব, তখন খাবার গরম করে ফেলবি।

ঝিমলি শুভেন্দুর পাশে এসে বসেছে।

শুভেন্দু মেয়ের চুল ঘেঁটে দিল—পড়তে-পড়তেও তোর মাথায় সিরিয়াল ঘোরে নাকি?

—এই সিরিয়ালটা খুব ভাল বাবা। কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ঝিমলি পা দোলাচ্ছে,—জানো বাবা, আমাদের স্কুলে একটা নতুন প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। লিটেরেসি ক্যাম্পেন।

—বাহ, এ তো খুব ভাল জিনিস!

—আমাদের মটো হয়েছে ইচ ওয়ান টিচ ওয়ান।

—তুই স্টুডেন্ট পাবি কোথায়? সাঁড়াশি নিয়ে ধরতে বেরোবি?

হাসিতে লুটিয়ে পড়ল ঝিমলি,—ওমা, তা কেন! আমার তো কত সুবিধে। স্টুডেন্ট ঘরেই রয়েছে। সরস্বতী অ আ ক খ কিচ্ছু জানে না—ওকেই পড়াব।

অর্চনা প্রশ্ন করল,—এর জন্য তোদের নম্বর আছে?

—না, নম্বর নেই। তবে স্কুল থেকে একটা সার্টিফিকেট দেবে।

অর্চনা সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল,—স্কুল কী করে বুঝবে তুই সত্যি সত্যি পড়িয়েছিস?

—আমাকে প্রুফ দিতে হবে। সরস্বতী লিটারেট হয়ে গেলে স্কুলে নিয়ে গিয়ে

ওকে দেখাতে হবে. স্কুল ওর পরীক্ষা নেবে। বলতে বলতে গলা তুলেছে ঝিমলি. —অ্যাই সরস্বতী, এদিকে শুনে যা!

সরস্বতী গুটি গুটি পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

ঝিমলি বলল.—কীরে, তোর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে না?

সরস্বতী ঘাড় নাড়ল।

—কাল থেকেই কিন্তু পড়তে বসতে হবে।

আবার ঢক করে ঘাড় নাড়ল সরস্বতী।

ঝিমলি বলল.—বাবা. আমাকে কাল কিছু টাকা দিও তো। ওর জন্য কয়েকটা এলিমেনট্রি বই কিনতে হবে।—স্লেট পেনসিল খাতাও। মেয়ের কথা শুনতে শুনতে মুগ্ধ হচ্ছিল শুভেন্দু। গর্বিত দৃষ্টিতে অর্চনার দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল এই না হলে আমার মেয়ে! নগণ্য ওই গরীব মেয়েটাকে লেখাপড়া শেখানোর কথা মনে এসেছে ঝিমলির. এর থেকেই বোঝা যায় ঝিমলির মধ্যে মানবিক গুণের বিকাশ হচ্ছে ঠিক ঠিক।

দরাজ গলায় শুভেন্দু বলল,—কত টাকা লাগবে তোর, নিয়ে নিস।

দুই

খাতার ডাঁই নিয়ে বসেছে শুভেন্দু। বি এ পরীক্ষার খাতা। গরমের ছুটির মধ্যেই ইউনিভার্সিটি পাঠিয়ে দিয়েছিল, এখনও দেখা হয়ে ওঠেনি। হেড এগজামিনার তাড়া লাগাচ্ছেন, সামনের সপ্তাহের মধ্যেই খাতা জমা দিতে হবে। তিনশো খাতার জঙ্গল সাফ করতে তিন দিন কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছে শুভেন্দু।

একগোছা খাতা শেষ করে শুভেন্দু আড়মোড়া ভাঙল একটা। ঘড়ি দেখল। চারটে পনেরো। তার মানে দুপুরের ঘুম দিয়ে উঠে এক ঘণ্টায় মাত্র সাতটা খাতা দেখা হল। খুবই মন্দ গতি। এভাবে চললে পরশুর মধ্যে এই পাহাড় শেষ হবে? মনে হয় না!

আরেকটা বাণ্ডিল খুলল শুভেন্দু। চালশে চশমা খুলে বাইরের দিকে তাকাল। বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই ঝমঝম ঝমঝম। আষাঢ় মাসটা শুখা গিয়ে এবার গোটা বর্ষা যেন শ্রাবণে এসে চাক বেঁধেছে। বিকেল হলেই এখন ঘন আঁধার, তাকালেই মাথা ধরে যায়।

চশমা আবার চোখে লাগিয়ে শুভেন্দু খাতায় ঝুঁকল। একটা হাঁকও পাড়ল সঙ্গে সঙ্গে,—সরস্বতী, অ্যাই সরস্বতী? কীরে, আমায় চা দিবি না?

চিকন গলার জবাব ভেসে এল,—দিচ্ছি মামা। এই অঙ্কটা করে নিই।

খাতায় লাল পেনসিল চালাতে চালাতে শুভেন্দু চেঁচাল,—পাঁচ মিনিট পরে অঙ্ক করলে তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আগে আমায় চা দাও।

তিন মিনিটে চা এসে গেল। খাটের পাশে চা রেখে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে সরস্বতী, দেখছে মামাকে।

খাতার ওপর চশমা রেখে শুভেন্দু চায়ে চুমুক দিল। হালকা গলায় জিজ্ঞাসা করল,
— কী দেখছিস রে?

ঝট করে খাতায় বসানো নম্বরের দিকে আঙুল দেখাল সরস্বতী। শুভেন্দু হাসল,
— পড়তে পারিস ওটা? বল তো কত?

—সেভেন।

ঝিমলির বাংলা ভাল আসে না, সব কিছুই ইংরেজিতে শেখাচ্ছে। ভাল, বাযদিঘির মেয়ে কনভেন্টে এডুকেশান পাচ্ছে।

শুভেন্দু আরেকটা নম্বরের দিকে আঙুল দেখাল,—এটা কত?

—সিক্স।

শুভেন্দু পরীক্ষকের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল,—দুটো যোগ করলে কত হয়?

—সেভেন প্লাস সিক্স? মাথা চুলকোতে চুলকোতে কড় গুনছে সরস্বতী। ভীতু মুখে বলল,—থার্টিন।

—তুই তো যোগ শিখে ফেলেছিস রে।

সরস্বতী অধোবদন।

শুভেন্দু মুহূর্তের জন্য ভাবল, মেয়েটাকে দিয়ে পরীক্ষার খাতার নম্বর যোগ করিয়ে নিলে কেমন হয়! নিজেরও সময় বাঁচবে, মেয়েটাও যোগে আরও পক্ক হয়ে উঠবে। ঝিমলি মেয়েটার পিছনে খাটছে খুব, মেয়েটারও বেশ মাথা আছে, শুভেন্দুরও কি ঝিমলিকে একটু সাহায্য করা উচিত নয়। থাক, বেশি ভুলভাল করলে খাতা স্ক্রুটিনির সময়ে কথা উঠবে।

কাপ প্লেট মেয়েটার হাতে দিয়ে শুভেন্দু বলল,—তুই কিন্তু কাজে গণ্ডগোল করে ফেলছিস সরস্বতী।

—কেন মামা?

—বলেছি না তোকে খাতা দেখার সময়ে আমার ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা চাই। আমি কখন ঘুম থেকে উঠেছি?

সরস্বতী আবার অধোবদন।

—ঘড়ি দেখে রাখ। ঠিক আবার এক ঘণ্টা পর।

ঘড়ি দেখানোটা অর্চনা শিখিয়েছে। দেওয়ালের কোয়ার্টজ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সরস্বতী বলল,—এখন চারটে পঁচিশ। তার মানে আবার পাঁচটা পঁচিশে চা খাবে, তাই তো?

—ইয়েস। সাড়ে পাঁচটা যেন না হয়।

ঘাড় হেলিয়ে চলে যাচ্ছিল সরস্বতী, ডাকল শুভেন্দু,—আই, তুই আমাকে বিকেলে জলখাবার খাওয়াবি না?

—দিদি ইস্কুল থেকে আসুক, দইচিঁড়ে মেখে দেব।

—অ্যাহ, দইচিঁড়ে! শুভেন্দু সিগারেট ধরাল,—আর কিছু নেই ঘরে?

—ফেনচ টোস্ট খাবে মামা? সরস্বতীর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল,—ওই যে ডিমে ডুবিয়ে পাঁউরুটি ভাজে...আমি শিখে গেছি।

শুভেন্দু বিস্মিত চোখে দেখল সরস্বতীকে। ভুরু নাচাল,—তোকে তো কালটিভেট করতে হচ্ছে রে! আর কী শিখেছিস?

সরস্বতী লজ্জায় নুয়ে গেছে। শরীর মুচড়োতে মুচড়োতে একের পর এক তার শিক্ষার বর্ণনা করে চলেছে। সে এখন ডাল সাঁতলাতে পারে, বেগুন পোড়াতে পারে, এ থেকে জেড অব্দি লিখতে পারে, পেঁয়াজকুচি আর পোস্তদানা দিয়ে আলুসেদ্ধ মাখতে পারে, ওয়ান থেকে হানড্রেড গুনতে পারে, রুটি সেঁকতে পারে, যোগ করতে পারে, আলু পটল ডিম মাছ সব ভাজতে পারে, আ'কার ইকার উকার পড়তে পারে, মামী যেখানে যা সাজিয়ে রাখে সেরকমটি বজায় রেখে ঝাড়াঝুড়ি করতে পারে। শুধু এখনও সে ঝোল তরকারিটা রাঁধতে পারে না, যুক্তাক্ষর পড়তে পারে না, বিয়োগটা করতে শেখেনি, এই যা!

ফিরিস্তি শুনে শুভেন্দু থ। মাত্র তিন মাসে এত উন্নতি! শিক্ষার সুযোগ পেলে এইসব মেয়েও কী তবতর করে এগোতে পারে! টিউটরের তো গুণ আছেই, তবে এই মেয়ের নেওয়ার ক্ষমতাও কম নয়!

শুভেন্দু হাসতে হাসতে বলল,—এমন দিনে কী খেতে ভাল লাগে জানিস? মুড়ি আর গরম গরম তেলেভাজা—আলুর চপ, বেগুনি, পেঁয়াজি...

সরস্বতীর মুখ শুকিয়ে গেল। নত মুখে বলল,—আমি তো ওগুলো শিখিনি মামা!

—দূর, তুই ভাজবি কেন? দোকান থেকে কিনে আনবি, চিনিস দোকান?

—হ্যাঁ, ওই তো চায়ের দোকানের পাশে ভাজে। নিয়ে আসব?

—গুছিয়ে আনতে পারবি তো? সেদিন আমার সিগারেট আনতে গিয়ে কুড়ি পয়সা কম এনেছিলি!

—দাও না তুমি, আমি ঠিক পারব।

রান্নাঘরে কাপডিশ রেখে দৌড়ে ফিরে এসেছে সরস্বতী। মন দিয়ে শুভেন্দুর অর্ডার নোট করে নিল মস্তিষ্কে, তারপর ছাতা নিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল।

শুভেন্দু সরস্বতীর যাওয়াটা দেখছিল। ঝিমলির আগেকার একটা ছোট হয়ে যাওয়া সালোয়ার কামিজ পরেছে মেয়েটা, পিছন থেকে কী বড়সড়টাই না লাগছে! কে বলবে মাস চারেক আগেও এই মেয়ে অপুষ্টিতে শীর্ণ প্যাঙাসে মেরে ছিল!

পলকা গর্ব নিয়ে চোখে চশমা লাগাল শুভেন্দু, ডুবল খাতায়। উফ্, এখনও এত পাহাড়! পাসকোর্সের তো খাতা, চোখ বোলাতে বোলাতে গড় বসিয়ে যাবে নাকি! খাতা দেখতে ইউনিভার্সিটি যা টাকা দেয়, এক ব্যাচ অনার্স পড়ালে এক মাসে সেই টাকা চলে আসে। তার ওপর ইউনিভার্সিটির ধারে কারবার, ছাত্ররা দেয় নগদ। এত পরিশ্রমের কোনও মানে হয়।

একটা খাতাও পুরো দেখা হল না, হুটোপুটি করে এসে গেছে ঝিমলি। সর্বাঙ্গ বর্ষাতিতে মোড়া, মাথায় ঘোমটাটুপি। জল ঝরছে অঝোরে।

টুপি রেনকোট খুলে খাবার টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দিল ঝিমলি। চেঁচাচ্ছে,—বাবা, তুমি এখন সরস্বতীকে দোকানে পাঠালে?

—কেন, কী হয়েছে তাতে?

—ওর এখনও অঙ্ক শেষ হয়নি!

—ফিরে এসে করবে।

—বারে, তাহলে আজকের টাস্ক দেব কখন?

—সন্ধেবেলা দিস।

—সন্ধেবেলা ওকে ইংলিশ পড়তে হবে। স্পেলিং শেখাচ্ছি এখন। ঝিমলির স্বরে বিরক্তি,—উফ, তুমি যে কী করো না। এভাবে পড়লে ওর পড়াশুনো এগোবে?

শুভেন্দু একটু আহত হল। গম্ভীর স্বরে বলল,—যথেষ্ট পড়ছে। তুমি ওকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। তোমার নিজের ক্লাস টেস্টের নম্বর কম হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল আছে?

বিস্মিত মুখে দরজায় এল ঝিমলি,—সে তো আমার জ্বর হয়েছিল, তাই।

—এর আগেও তুমি জ্বর নিয়ে এর থেকে ভাল টেস্ট দিয়েছ। শুভেন্দু একটু নরম হল,—ওকে নিজেব মতো করে পড়তে দাও। ও এখনই যা শিখেছে, ওদের ফ্যামিলিতে ক'জন তা শেখে।

—চান্স পায় না, তাই শিখতে পারে না।

—কেন চান্স পায় না?

—গরীব বলে।

—ইয়েস। ওই কথাটি মাথায় রেখো। ওদের খেটে খেতে হয়। শুয়ে বসে পড়াশুনোর মতো লাক্সারি অ্যাফোর্ড করার ক্ষমতা ওদের নেই।

—কেন নেই বাবা?

—এ তো অনেক জটিল সমাজতাত্ত্বিক ব্যাপার। তুমি বুঝবে না।

—বুঝিয়ে বলো।

শুভেন্দু লেকচারের ঢঙে গলা ঝাড়ল,—এই সমাজে দু'ধরনের মানুষ আছে। এক দল হল শোষক, আর এক দল হল শোষিত। যারা শোষক তারা শুধু শোষিতদের রক্ত চুষছে। এই সরস্বতী বা ওদের মতো যারা আছে, তারা সব হল শোষিত ক্লাস।

ঝিমলির মুখে যেন ছায়া পড়ল। উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল,—শোষক কারা বাবা? আমরা?

—দূর, আমরা কেন হতে যাব। শুভেন্দু হোঁচট খেল,—তারা হচ্ছে ভীষণ বড়লোক, তাদের চোখে দেখা যায় না। আমরা হচ্ছি পেটি মিডল ক্লাস—মধ্যবিত্ত।

ঝিমলি বুঝি নিশ্চিন্ত হল খানিকটা। হাসিমুখে বলল—তাহলে ওদের শিক্ষিত করতে আমাদের অসুবিধে কোথায়?

—ওভাবে হয় না রে। এর জন্য বিপ্লব দরকার। রেভলিউশন। তখন সব কিছু বদলে যাবে। শুভেন্দু আঙুল তুলল,—ভিজে জুতো পরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে। যা, জামাকাপড় বদলে আয়। সরস্বতী গরম গরম তেলেভাজা আনছে, যা জমবে না বিকেলটা...!

ঠোঙাভর্তি তেলেভাজা নিয়ে ফিরল সরস্বতী। সর্ষের তেল দিয়ে পরিপাটি করে মুড়ি মাখল, শুভেন্দুর পছন্দমতো পেঁয়াজ শশা কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দিল মুড়িতে।

রান্নাঘরের শিশিতে বাদাম থাকে, খোসা ছাড়িয়ে বাদামও মিশিয়ে দিয়েছে।

ঝিমলি সোফায় বসে মুড়ি তেলেভাজা খাচ্ছে. সরস্বতী ঠোঙা নিয়ে বসেছে তার পায়ের কাছে। অঙ্ক কষছে।

শুভেন্দুর খাতা দেখায় মন বসছিল না। একটা দুটো মুড়ি ছুঁড়ছে মুখে। বুকে কী যেন একটা খচখচ করছিল শুভেন্দুর। বুকে না মস্তিষ্কে? আরেক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে। সরস্বতীকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না। তিতকুটে মেজাজে খাতা দেখতে গিয়ে তিন-তিনটে ছেলে ফেল করে গেল। কী যে সব লেখে ছাইপাঁশ! ইতিহাসের একটা বেসিক সেন্স পর্যন্ত নেই। কোন কলেজের খাতা কে জানে?

ঘোর বর্ষায় সিক্ত হয়ে ফিরল অর্চনা। বাজপাখির চোখে জরিপ করল ঘরদোর. সরস্বতীকে দিয়ে শুকনো জামাকাপড় আনাল ঘর থেকে. পোশাক বদলে বাথরুম থেকে মাথা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল। বর্ষা তার ভারী পছন্দের ঋতু. পাখির মেজাজে বসল শুভেন্দুর পাশে। লঘু স্বরে বলল—কিগো. তোমার আর কদ্দূর?

পাশে পড়ে থাকা বাণ্ডিল টেবচা চোখে দেখে নিল শুভেন্দু.—শ'দুই হবে।

—কেন যে আগে থেকে দ্যাখো না! রোজ দশ-বিশটা করে দেখলেও তো চাপ অনেক কমে যায়।

শুভেন্দু বলতে পারত. কলেজ টিউশনি সেরে এসে শরীরে শক্তি থাকে না। বলল না। পাল্টা প্রশ্ন করল—চেকটা জমা করেছ? হাউস বিল্ডিং লোনের?

অর্চনা চিরুনি বোলাচ্ছে মাথায়—না. আজ দেওয়া হয়নি। অফিসে কাজ ছিল। লোকজনও আজ কম এসেছিল...

—এ কি ইরেসপন্সিবিলিটি! শুভেন্দু হঠাৎ তেতে গেল—আজ লাস্ট ডেট ছিল না? এরপর ওরা যদি এক্সট্রা ইন্টারেস্ট চার্জ করে?

—বারে. আমার একদিন অফিসে কাজ থাকতে পারে না? বলছি তো কাল দিয়ে দেব।

—সরকারী অফিসে আর কাজ দেখিয়ো না। পাঁচ মিনিটের জন্য বেরোবে, অফিস থেকে পাঁচ পা গিয়ে চেকটা দিয়ে আসবে. তাতেও গড়িমসি! তোমাকে দায়িত্ব দেওয়াটাই ভুল হয়েছে।

—নিজে গেলেই পারতে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ না ফুলিয়ে তাও একটা সংসারের কাজ হত।

নাকের পাটা ফুলে গেল শুভেন্দুর। আরেকটা ছেলে উনত্রিশে আটকে গেল। পাশের খাতার স্তূপ দেখিয়ে বলল. ঘুমোচ্ছিলাম! তাহলে এত খাতা শেষ করল কে? ছুটি কি আমি মুখ দেখতে নিয়েছি?

—ন্যাকামোর কথা বলো না। ন মাস তো ছুটিই থাকে, তার ওপর আবার খাতা দেখার বাহানায় ছুটি নেওয়ার ঢঙ! খাতা তো ফেলে দিয়ে গেছে সামারে, অ্যাদ্দিন বসে বসে আঙুল চুষছিলে কেন?

অনেক জবাবই ঠোঁটের ডগায় ছিল শুভেন্দুর। অর্ধেক গ্রীষ্মের ছুটি তো তার মেয়ে বউ নিয়ে নৈনিতাল আলমোড়া কৌশানি রাণীক্ষেত ঘুরতে ঘুরতেই কেটে গেল।

তারপরও কম ফ্যাচাং গেছে। দাদার মেয়ের পাকা দেখা। ছোট শালার জন্য পাত্রী দেখতে দুর্গাপুর ছোটা। অর্চনার তলপেটে একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল, তাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে দৌড়নো—এই টেস্ট, ওই টেস্ট। এগুলো কি কাজ নয়? ছুটি না পচিয়ে, তার বদলে তিনটে দিন প্রাপ্য সি এল নিয়ে এই বিশাল জঞ্জাল সাফ করছে শুভেন্দু, তাতেও অর্চনার গাত্রদাহ?

শুভেন্দু হুঙ্কার দিয়ে উঠল—অ্যাই সরস্বতী...

পড়িমরি করে ছুটে এসেছে মেয়েটা। সভয়ে দেখছে মামা-মামীকে।

শুভেন্দু কড়া গলায় বলল—আমাকে আবার কটার সময়ে চা দেওয়ার কথা ছিল?

ঘড়ি দেখে মাথা নামাল সরস্বতী—ভুল হয়ে গেছে মামা। দিদি বলল, আগে অঙ্ক করে দেখাতে...

—অঙ্কের নিকুচি করেছে। যাও, চা করো গিয়ে। মামী অফিস থেকে ফিরেছে তাকে কে জলখাবার দেবে, অ্যাঁ?

ঘাড় ঝুলিয়ে চলে গেল সরস্বতী। পিছন পিছন অর্চনাও রান্নাঘরে গেছে। রাত্রের আটা মাখা হয়নি বলে সেও খুব বকছে মেয়েটাকে। শুভেন্দু শুনতে পাচ্ছিল।

আবার খাতা দেখায় মন দিল শুভেন্দু। হঠাৎই কিসের ছায়া পড়ল গায়ে অথবা পড়ল না, শুভেন্দুর মনে হল পড়ছে।

শুভেন্দু চমকে তাকাল। দরজায় ঝিমলি। কেমন একটা চোখে যেন দেখছে বাবাকে!

দু চোখের ভর্ৎসনাতে কী বলতে চায় ঝিমলি!

তিন

পুজোর ছুটির পর সবে কলেজ খুলেছে। কলেজ, কোচিং সেরে শুভেন্দু বাড়ি ফিরে দেখল অর্চনা মুখ হাঁড়ি করে বসে আছে ড্রয়িংরুমে। টিভি বন্ধ। ঝিমলি মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়ছে। সরস্বতীকে দেখা যায় রান্নাঘরে।

শুভেন্দুর মেজাজটা বেশ শরিফ আজ, চার মাসের এরিয়ার ডি এ করকরে তেরোশো টাকা হাতে পেয়েছে। ইউনিভার্সিটির রেজাল্টও বেরিয়েছে কাল, শুভেন্দুর প্রাইভেটের সব কটা ছেলেই ভালভাবে অনার্স পেয়ে গেছে। কলেজের রেজাল্ট অবশ্য তেমন ভাল নয়, কী আর করা যাবে! একে যৌথ দায়িত্ব, তায় এত ছুটিছাটা, কলেজে সিলেবাস শেষ করাই বড় কঠিন!

খুশি খুশি মেজাজে শুভেন্দু প্রশ্ন করল—অমন প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে আছ কেন? অফিসে আজ লাল দাগ খেয়েছ নাকি?

আরও গম্ভীর হয়ে গিয়ে অর্চনা, শুভেন্দুর পিছন পিছন ঘরে উঠে এল। ভার গলায় বলল—একটা বিপদ হয়েছে।

—বিপদ! কী বিপদ? শুভেন্দু ঝটিতি চিন্তা করার চেষ্টা করল। অর্চনার অফিসে মাঝে একবার ট্রান্সফারের ধুয়ো উঠেছিল, সেটাই ঘটে গেল নাকি? তাহলে তো আবার

লোকজনকে ধরতে হয়। রাইটার্সে শুভেন্দুর এক স্কুলের বন্ধু এখন ডেপুটি সেক্রেটারি, তার কাছেই...।

অর্চনা কথা বলছে না, গুম হয়ে খাটের প্রান্তে বসেছে। শুভেন্দু বলল—বিপদটা কী বলবে তো?

অর্চনা হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠল—আরও মেয়েকে আহ্লাদ দাও!

ঝিমলি! শুভেন্দু আরও চিন্তায় পড়ল—ঝিমলি কী করল—

—কী করেনি? আজ সরস্বতীকে নিজের স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল, সাক্ষরতা প্রকল্প কেমন চলছে তা দেখাতে।

—তো?

—তোমার সরস্বতী সেখানে নিজের প্রতিভা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সকলকে। গরীবদের মধ্যে এমন ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে নাকি আগে আন্টিরা দেখেনি!

শুভেন্দু ফ্যালফ্যাল তাকাল—এতে বিপদের কী হল? ঝিমলি ওকে পড়িয়েছে, এ তো ঝিমলিরই ক্রেডিট।

—এটুকু হলে তো কথা ছিল না। তোমার মেয়ে এখন প্ল্যান করেছে সরস্বতীকে স্কুলে ভর্তি করবে। ওদের স্কুলের মিশনারিরা গরীবদের জন্য সন্ধেবেলা কী এক ফ্রি এডুকেশান সেন্টার করেছে, সেখানে পড়তে পাঠাবে সরস্বতীকে। শুনে সরস্বতীও লাফাচ্ছে—ও মামী, আমি পড়াশুনো শিখব! আমি একবার শুধু সংসারের অসুবিধের কথা বলতে গেছিলাম, ঝিমলির কী মেজাজ! সরস্বতীর যখন অত ব্রেন, ওকে দিয়ে আর সংসারের কাজ করানো চলবে না!

শুভেন্দু বলল—বাহ, তাহলে সংসারের কাজটা করবে কে?

—তোমার মেয়ে অত বুঝলে তো হয়েই গেল। বলে অন্য লোক রেখে নাও, সরস্বতী শুধু পড়বে।

শুভেন্দু এঁকটু হেসে বলল—তার মানে সরস্বতীকে আমাদের পুষ্যি করে নিতে হবে, তাই তো?

—মানে তো সেরকমই দাঁড়ায়। কত কষ্ট করে মেয়েটাকে কাজকর্ম শেখালাম, মনের মতো করে তৈরি করলাম...

—দাঁড়াও দাঁড়াও। আগেই উত্তেজিত হচ্ছ কেন? আমি কথা বলে দেখছি ঝিমলির সঙ্গে। বুঝিয়ে বলছি।

নাহ, বুঝিয়েও লাভ হল না কোনও। ঝিমলি নিজেই নাইট স্কুলে নাম লিখিয়ে দিয়ে এসেছে সরস্বতীর, গরীব সরস্বতীকে সে প্রকৃত শিক্ষিত করে তুলবেই। ঝিমলির বিশ্বাস—তার বাবা-মাও এ কাজে নিরুৎসাহিত করবে না তাকে। একটা মাত্র সরস্বতীকে শুভেন্দুরা কী পারে না লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে?

রাত্রে অর্চনা ঠাণ্ডা স্বরে বলল—কিগো, কী করবে ঠিক করলে?

শুভেন্দু চিন্তিত মুখে বলল—কিছু একটা তো করতেই হবে। ঝিমলিটা এত বাড়াবাড়ি করে ফেলবে কে জানত!

—সরস্বতীকেই ধমকে-ধামকে ঠিক করব?

—না না, সেটা খুব অমানবিক কাজ হয়ে যায়।

—তাহলে আর কি! আমিই অফিস থেকে ফিরে খেটে মরি—আর কাজের লোক পায়ের ওপর পা তুলে দিগগজ হোক!

—আহ্। শুভেন্দু বিরক্ত হল—আমাকে একটু ভাবতে দাও।

চার

সরস্বতীর মা এসেছে সরস্বতীকে নিয়ে যেতে। এ বাড়িতে আর তাকে কাজে রাখবে না, অন্য কোন বাবুর বাড়িতে আরও নাকি পঞ্চাশ টাকা বেশি মাইনেতে কাজে লাগাবে মেয়েকে।

যাওয়ার আগে সরস্বতী কাঁদল খুব। ঝিমলি ছলছল চোখে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রইল, স্কুলে গেল না।

শুভেন্দু আর অর্চনা চুপ। সরস্বতীর মাকে ডেকে পাঠানো ছাড়া আর কিই বা উপায় ছিল শুভেন্দু অর্চনার! মেজদিই কোন বান্ধবীর বাড়িতে সরস্বতীর জন্য নতুন কাজের ব্যবস্থা করেছে। শুভেন্দুর জন্য শীগগীরই এক বয়স্ক মহিলাকে পাঠিয়ে দেবে।

এ সব কথা তো আর ঝিমলিকে জানতে দেওয়া যায় না। সরস্বতী নামের ওই ছোট্ট গরীব মেয়েটাকেও মুখের ওপর বলা যায় না কিছু।

মধ্যবিত্ত হওয়ার কী যে জ্বালা!

সামনে সমুদ্র

রাত্রে খাবার টেবিলে কথাটা পাড়ল শ্রাবণী,—তাতারের গরমের ছুটি তো শেষ হয়ে এল, চলো না কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি।

ধীমান রুটির সঙ্গে গোগ্রাসে একটা টিভি সিরিয়াল গিলছিল। নায়িকা গুপ্ত প্রেমিকের সঙ্গে অভিসার সেরে বাড়ি ফিরেছে, বাইরে থেকে কলিংবেল বাজিয়ে চলেছে অবিরাম, কেউ দরজা খুলছে না। মরিয়া হয়ে দরজায় জোর ধাক্কা দিতেই দরজা হাট। ড্রয়িংরুমের সোফায় গুলি খেয়ে পড়ে আছে নায়িকার স্বামী। এমন রুদ্ধশ্বাস সময়ে শ্রাবণীর বায়না ধীমানের কানে যাওয়ার কথা নয়।

গেলও না। কিন্তু তাতার ছাড়বার পাত্র নয়। কদিন আগেও তাকে সকাল সকাল খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিত শ্রাবণী, আজকাল সে বাবা-মার সঙ্গে খাবার টেবিলে বসবেই। আগে খাওয়া হয়ে গেলেও। সে ধীমানের হাত ধরে ঝাঁকাল,—হ্যাঁ বাবা, চলো না।

টিভি থেকে চোখ সরল না ধীমানের,—কোথায় যাবি?

—ওই যে মা বলল কোথাও একটা বেড়িয়ে আসি।

পর্দায় পুলিশ। দৃশ্য স্থির হয়ে গেল। নাম দেখানো চলছে। আজকের মতো কাহিনী শেষ।

ধীমানের চোখ তাতারের দিকে ফিরল এতক্ষণে,—কোথায় যাবি বলছিলি?

তাতারেব আগে শ্রাবণীই উত্তর দিল,—কাছাকাছি কোথাও। দু'তিন দিনের জন্যে। অনেক দিন তো বাইরে বেরনো হয়নি।

—আমি কি করে যাব? এখন আমার ছুটি কোথায়?

শ্রাবণী তাতারকে আগেই উস্কে রেখেছিল। এবার ছেলেকে চোখে ইশাবা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাতারের ভুরু জড়ো,—কেন বাবা, সামনের সপ্তাহে ফ্রাইডে স্যাটারডে তো ছুটি আছে?

আছে। তবে ওই তিন দিনের জন্য অন্য প্ল্যানও ভাঁজা আছে ধীমানের। সে নরম করে ছেলের মাথায় হাত রাখল,—আমার যে ওই সময় একটা অফিস ট্যুর আছে তাতার।

—নাআআ। তুমি ট্যুরে যাবে না। আমরা বেড়াতে যাব।

—তা হয় না তাতার। জেদ কোরো না।

তাতারের মুখ এইটুকু হয়ে গেল। বাবার সামান্যতম প্রত্যাখ্যানেও চোখে জল এসে যায় তার। ঠোঁট ফুলে ওঠে।

ধীমানও ছেলের সম্পর্কে খুবই স্পর্শকাতর। একটু দুর্বলই হয়ে পড়ল সে। তারই মতো জেদি হয়েছে ছেলেটা। অভিমানী। বাপ কা বেটা। ধীমান কাছে টানল ছেলেকে, —ওমনি চোখ দিয়ে লেবুর জল পড়া শুরু হল তো। আচ্ছা বাবা আচ্ছা, দরকার হলে আমি অফিসট্যুর ক্যানসেল করব।

—ঠিক তো?

—ঠিক। ওয়াদা।

ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেটারদেব ভঙ্গিতে হাতে হাত মেলাল বাপ-ছেলে। শ্রাবণী টেবিল থেকে মাছ-তরকারির বাটি ফ্রিজে ঢোকাচ্ছে। ঠাণ্ডা জলের বোতল খুলে ঢকঢক জল খেযে নিল খানিকটা। তার ঠোঁটের কোণে চাপা বিজয়ের হাসি।

ধীমান বেসিনে হাত ধুয়ে টিভির সামনে এসে দাঁড়াল। ইংরিজি খবর চলছে। নব ঘুরিযে কেবলে নাচগানেব চ্যানেল বার করল একটা। তারপর সোফায় বসে সিগারেট ধরিয়েছে,—তাহলে দু দিনেব জন্য দীঘা ঘুরে আসা যাক. কী বলো?

শ্রাবণীব হাসিতে হাল্কা ব্যঙ্গ মিশল,—মন্দ কী! তবে দীঘার ভিড়ে না গিয়ে গড়িয়াহাটে গেলেও হয়.. শ্যামবাজারেও যেতে পাবো। সামালা নিবল ধীমান,—অ, দীঘা পছন্দ নয়? তা হলে তাতার তুমিই বলো কোথায় যাবে?

তাতার কলকাতার বাইরে যে কোনও জায়গায় যেতে পারলেই খুশি। সব অদেখা জায়গাই তাব কল্পনায় দারুণ বোমাঞ্চকর। তা সে দার্জিলিংই হোক. কি লক্ষীকান্তপুর। সে বাবার কোলেব কাছে বাবু হযে বসল,—বাবা, সুন্দববন যাবে? আমাদের ক্লাসের স্বপ্নজিৎ গেছিল। লঞ্চে কবে।

—গেলে হয। কীসব কুমীব প্রকল্প-টকল্প আছে।

শ্রাবণী বান্নাঘব বন্ধ কবে ব্যালকনির দরজা লক কবছিল. বলল,—না না, জ্যৈষ্ঠ মাসে সুন্দরবন যেতে হবে না। এলোমেলো ঝড় উঠবে। দ্যাখোনি গত সপ্তাহে একটা নৌকোডুবি হয়েছে!...

—তা হলে মায়াপুর চলো। মায়াপুর, নবদ্বীপ...

শ্রাবণী এমন অদ্ভুতভাবে ধীমানেব দিকে তাকাল যেন এমন হাস্যকর কথা পৃথিবীতে কেউ কোনওদিন বলেনি। ধীমান মনে মনে উষ্মা বোধ করছিল। ধীমানের কোনও কথায় কোনও কাজে কখনও পুবোপুরি খুশি হতে দেখল না শ্রাবণীকে। রান্নার প্রশংসা করলেও নয়, বিবাহবার্ষিকীতে বিদেশি পারফিউম এনে দিলেও নয়, পুজোতে দামী শাড়ি কিনে দিলেও নয়। গত পুজোয় একটা শকিং পিঙ্ক কাঞ্জিভরম এনে দিল, তাতেও কোনও খুশির হিল্লোল নেই! বাইশশো টাকা দাম জানা সত্ত্বেও। দিব্যি ঠাণ্ডা গলায় বলে দিল.— এত দামী শাড়ি কিনতে গেলে কেন? আমি আর বেরোই কোথায়?

অসহ্য। অসহ্য! অসহ্য লাগে ধীমানের। চেপে চেপে অ্যাশট্রেতে সিগারেট নেবাল ধীমান।

অন্য দিন এ সময়ে তাতারের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতে থাকে, আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। তাতারকে সোফা থেকে ওঠাল শ্রাবণী,—চলো. শুয়ে পড়বে চলো। মনে রেখো তোমার স্কুলের টাস্ক শেষ হয়নি. কাল আগে আগে ঘুম থেকে উঠে সব সামস করে নিতে হবে।

তাতার মার সঙ্গে বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। তার যত বায়নাক্কা ধীমানের কাছে। যেতে যেতেও সে মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—তা হলে কোথায় যাচ্ছি বাবা?

শ্রাবণী শান্ত স্বরে বলল,—সে যাব একটা কোথাও। নতুন জায়গায়।

মাথাটা টিপটিপ করছিল ধীমানের। ভেঁজে রাখা প্ল্যান পুরো চৌপাট! ভাগ্যিস

কিছু ফাইনাল করে ফেলেনি! যাক গে, একবার নয় বউছেলেকে নিয়েই ঘুরে এল।

ছেলে নিয়ে যাওয়ার সময় শ্রাবণী টিভি কমিয়ে দিয়ে গেছে, শব্দ এখন এত কম যে মনে হয় আলগা ভাসছে গানটা। ভাসন্ত সুরে দুলছে লাস্যময়ী যুবতী। ধীমান সেদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক বার বার। ছুটিটা মারা গেল! ছুটিটা মারা গেল! ছুটিটা মারা গেল!

শোওয়ার ঘরের দরজা আস্তে টেনে শ্রাবণী ফিরেছে ধীমানের কাছে। ধীমান সামান্য অবাক। ছেলেকে শোওয়াতে গিয়ে শ্রাবণী সাধারণত আর ফেরে না, নিজেও শুয়ে পড়ে। আর শুলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ছেলে আঁকড়ে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ধীমান প্রশ্ন করল,—কিছু বলবে?

শ্রাবণী সোফায় হেলান দিল,—তাড়া নেই। তোমার নাচগান শেষ হোক।

শব্দহীন বসে আছে দুজনে। এক মিনিট। দু মিনিট। পাঁচ মিনিট। শ্রাবণী বুঝি এভাবেই বসে থাকতে পারবে অনন্তকাল। ধীমান ক্রমশ চাপ অনুভব করছিল। চোরা মানসিক চাপ। অধৈর্য পায়ে নিজেই গিয়ে টিভি বন্ধ করে এল,—বোর কোরো না, বলো কী বলবে!

শ্রাবণী মিটিমিটি হাসছে,—জায়গা ঠিক করে উঠতে পারলে না তো?

—বাজে বোকো না। তোমারই তো কোনও জায়গা পছন্দ নয়।

বিরক্তিটা গায়ে মাখল না শ্রাবণী,—আমার একটা জায়গা ঠিক করা আছে।

—কোথায়?

—উঁহু, নাম বলব না। সাসপেন্স। সে একটা দারুণ সাইট। রঞ্জনা আর রঞ্জনার বর গিয়েছিল।

রঞ্জনাকে ধীমান একদম পছন্দ করে না। শ্রাবণীর কলেজের বন্ধু, গাঁকগাঁক করে চেঁচায়, অশ্লীল রসিকতা করে, সব সময় আলুথালু। বরটা ক্যাবলা দি গ্রেট। ওই বউয়ের ভয়ে সারাক্ষণ জুজু হয়ে থাকে!

ধীমান মুখ বেঁকাল,—তোমার রঞ্জনার টেস্ট! ও তো যেখানে কাঁড়ি কাঁড়ি খাবার পাবে সে জায়গাই ভাল বলবে। কোন জায়গার কথা বলেছে? দেওঘর মধুপুর বুঝি? পেঁড়া, মুর্গি, আম...

—না গো না। এই গরমে কেউ ওদিকে বেড়াতে যায়!

ধীমান মনে মনে বলল, ওই ধুমসিটা সব পারে। মুখে বলল,—হেহ, ও যেখানে বলবে সেখানেই যেতে হবে! ওকে বোলো আগে শাড়িজামা ভাল করে পরতে শিখুক, নিজের বপু সামলাতে শিখুক. তারপর লোকজনকে...

—ওভাবে বলছ কেন? থাইরয়েডের প্রবলেম, একটু মোটা হয়ে গেছে। শরীর হাঁসফাঁস করে বলেই না...

—ওর থাইরয়েড পিটুইটারি অ্যাড্রিনালিন সব কিছুর গণ্ডগোল আছে।

—আছে তো আছে। শ্রাবণী উত্তেজিত হতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে, —তুমি এবার বেড়ানোর জায়গা, বুকিং সব কিছুর ভার আমার উপর ছেড়ে দাও।

—যা ইচ্ছে করো। শুধু মনে রেখো শুক্র শনি রবি—তার বেশি নয়। সোমবার

আমাকে অফিস যেতেই হবে।

ধীমান হুমহাম করে বাথরুমে ঢুকে গেল। দড়াম করে বন্ধ করল দরজা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোজা শোওয়ার ঘর। সব দরজাই হাঁ-হাঁ।

একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল শ্রাবণীর বুক থেকে। লোকটা বাথরুমের আলোও নেবায় না। ঘরে ঢোকাব আগে শ্রাবণীব কান্না পাচ্ছিল। বেডল্যাম্পের নীলচে আলোয় ঘরটা যেন এক আধোঅন্ধকার গুহা। আদিম। ভয়াল।

বিছানা ছাড়ার পর থেকে নানা ফরমায়েশে মশগুল থাকে ধীমান। মুখ ফুটে বলার দরকার নেই, মনে মনে ভাবলেই যথেষ্ট। হাতের কাছে সব হাজির। অন্তত তিন কাপ চা। হাল্কা কিছু পছন্দসই ব্রেকফাস্ট। বাজার এনে ফেলতে না ফেলতেই সামনে শেভিংসেট। সাড়ে ন'টাব মধ্যে ভাত। নিখুঁত নিভাঁজ প্যান্টশার্ট। ঘামের গন্ধহীন মোজা। প্রতিদিন আলাদা আলাদা রুমাল। এত নিঃশব্দে ধীমানের হাতে পৌঁছে যায় সব কিছু যে সেখানে শ্রাবণীব অস্তিত্বটা পৃথক করে টেরই পাওয়া যায় না। বাতাসের মতো শ্রাবণী যেন ছড়িয়ে আছে গোটা সংসারে। অবযবহীন, কিন্তু আছে। ধীমান ছাড়াও সংসারে তার কাজ কম নয়। ছেলের পড়াশুনো। বইখাতা গোছানো। নটার মধ্যে ছেলেকে স্কুলের জন্য তৈরি করা। ছেলের টিফিন। কাজের লোকের সঙ্গে ক্রমাগত লেগে থেকে প্রতিটি খুঁটিনাটি সামলানো। রান্নাবান্না। সব মিলিয়ে সংসারটাকে তেলমোবিল খাওয়া এক মসৃণ যন্ত্রের মতো চালানো। দেখলে মনে হয় যন্ত্রটা কেউ চালাচ্ছে না, নিজে-নিজেই চলছে যন্ত্র।

এত হুড়োহুড়ির মধ্যে সকালে কথাটা আর উঠলই না। অফিসে গিয়ে বেড়ানোর প্রসঙ্গটা বেমালুম ভুলে গেল ধীমান। সে একটা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মাঝারি মাপের অফিসার, সকালে যথেষ্ট কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে, বিকেলের দিকে একটু স্বাধীনভাবে হাত-পা মেলার সুযোগ পায়। সেই সময়ে হয়তো মনে পড়ত কিন্তু আজ একটা বিশ্রী ঝামেলায় ফেঁসে গেল। চারটে নাগাদ ফ্যাক্টরি থেকে জরুরি মেসেজ। তাবাতলার কারখানায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। জি-এম-এর অর্ডার, ধীমান শুড ট্যাকল দা সিচুয়েশন। ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখল সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। ক্রেনওয়্যার ছিঁড়ে দুজন শ্রমিক প্রচণ্ড আহত। তাদের নিয়ে তক্ষুনি হাসপাতালে দৌড়নো, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, পুলিশের হ্যাপা সামলানো সব সেরে বাড়ি ফিবল ন'টার পরে। তখন আর ধীমান ধীমানে নেই।

তাতার ঘরে বসে কমিকস পড়ছিল, বাবাকে দেখে ছুটে এসেছে ড্রয়িংস্পেসে, —সব ঠিক হয়ে গেছে বাবা। ফাইনাল।

ধীমানের শরীর সোফায় এলানো। শ্রান্ত মগজ কোনও শব্দই গ্রহণ করেনি।

শ্রাবণী টেবিলে ঠাণ্ডা জল রাখল,—আহ্ তাতার, বাবাকে রেস্ট নিতে দাও।

এক চুমুকে জলটুকু শেষ করল ধীমান। বুকের দু'তিনটে বোতাম খুলে দিল। আড়মোড়া ভাঙল,—বাবা আজ এসেছিল?

—হ্যাঁ, বিকেলে। তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেলেন।

—আমাকে দিয়ে কী হবে? আশীর্বাদের দিন ঠিক হয়েছে?

—হয়েছে। সামনের বুধবারের পরের বুধবার। শ্রাবণী সামান্য ইতস্তত করল, —বাবা বোধহয় আরও কিছু বলতে চাইছিলেন।

—কী আব বলবে? ধীমান কাঁধ ঝাঁকাল,—টাকা।...ছোট ছেলের নতুন চাকরি... জমানো টাকা নেই... তুই বড ভাই... একমাত্র বোনের বিয়ে... আমি বুড়ো মানুষ কত দিক সামলাব...!

—কথাগুলো তো মিথ্যে নয়। শ্রাবণী টেবিল থেকে গ্লাস তুলে নিল,—আলাদা থাকলেও কিছু দায়দায়িত্ব তো বয়েই যায়।

দাযদায়িত্ব না হাতি! শালা বড় হয়ে ফেঁসে যাওয়া! ধীমান মনে মনে গজগজ করল, মুখে বলল.—রোজগার তো কবতে হয় না. বুঝবে কী করে কত ধানে কত চাল।

তাতারের এত কূটকচালি পছন্দ হচ্ছিল না, অস্থির ভাবে বলল,—বাবা, আমাব কথা শোনো। বাবা... ও বাবা...

তাতাবকে কোলে টানল ধীমান,—কী বাবা?

বাবাব কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল তাতার.—মা জায়গা ঠিক করে ফেলেছে।

ধীমান চোখ নাচাল,—কোথায়? পৃথিবীর ভিতরে তো?

—উ-ড়িষ্যা।

—দু'দিনের জন্য উড়িষ্যা! তোব মা পাবেও বটে। তা উড়িষ্যার কোথায়? সিমলিপাল? কেওনঝাড়? না একদম চিল্কা?

বিদ্রূপটা বুঝল না তাতার। সমান উৎসাহে বলে চলেছে,—হল না। হল না। তুমি ফেল। বলতে বলতে দৌড়ে ঘর থেকে একটা হলুদ কাগজ নিয়ে এসেছে, —এই দ্যাখো হোটেলের বুকিং।

ছেলের হাত থেকে অলস মুখে কাগজটা নিল ধীমান। ভাঁজ খুলতেই সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। সমস্ত স্নায়ু মুহূর্তের জন্য বিকল। নিশ্বাস বন্ধ। লাল লাল লেখাগুলো চোখের সামনে কাঁপছে আগুনের শিখা হয়ে।

ক্যাসুরিনা হলিডে রিসর্ট! চাঁদিপুর।

দুই

প্রকাণ্ড এলাকা জুড়ে শুধু সবুজ আর সবুজ। গাঢ় সবুজ। কালচে সবুজ। ফিকে সবুজ। সার সার বেঁটে বেঁটে নারকেল গাছ। আম জাম পেয়ারা কাঁঠাল কাজু। কেয়াঝোপ। ডানদিকে বড় একটা দিঘি। গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কিছু খড়েছাওয়া কুঁড়েঘর। লাল মোরাম বিছোনো সরু সরু রাস্তা সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে এক-একটা কুঁড়েঘরের দিকে। গাছ আর আগাছায় গোটা চত্বর জুড়ে হাল্কা অরণ্যের আভাস।

তাতার খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল,—কোন কুঁড়েঘরটায় আমরা থাকব গো বাবা?

ধীমান অটোরিক্সার ভাড়া মেটাচ্ছিল, আলগোছে ছেলের চুল ঘেঁটে দিল,—তোর কোন কটেজটা পছন্দ?

কটেজ শব্দটা ঠিক মনঃপূত হল না তাতারের। সে এখানে কুঁড়েঘরেই থাকতে এসেছে। পালক পালক ভুরু তুলে প্রশ্ন করল,—কুঁড়েঘরের ওয়াল তো মাটি দিয়ে তৈরি হয়, না বাবা? ঝাঁপ থাকে? দাওয়া থাকে?

—ওরেব্বাস! তুই এসব কথা শিখলি কোত্থেকে! ঝাঁপ! দাওয়া!

—গোপালের মা বলে তো।

শ্রাবণী আলতো ভাবে শাড়ির আঁচল-কুঁচি ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল, মৃদু শাসন করল ছেলেকে,—গোপালের মা নয়, সুমতিমাসি বলো।

মায়ের শাসনে তাতারের উচ্ছ্বাস কমল না, ধীমানের হাত চেপে ধরেছে সে, —কুঁড়েঘরে নাকি বাথরুম থাকে না বাবা? মাঠে পটি করতে হয়?

বাইরে থেকে দেখে যেমন লাগে ঘরগুলোর ভিতরটা মোটেই সেরকম নয়। প্রতিটি ঘরই পাকা, রঙটাই যা মেটে। ঘরে লাইট ফ্যান ইংলিশ খাট ওয়ার্ড্রোব ড্রেসিংটেবিল সব নাগরিক সাজসজ্জাই আছে। অ্যাটাচড বাথও।

খোলসটাই গ্রাম্য শুধু। শৌখিন গ্রাম্যতা। ধীমান জানে।

যা জানে সব কিছুই কি সবসময় বলে ফেলা যায়? ধীমান আড়চোখে শ্রাবণীকে দেখে নিল। সামান্য তফাতে সরে জংলাঝোপের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র খোঁজার চেষ্টা করছে শ্রাবণী। কটেজগুলোর পিছনে ঝাউবন। তারপরেই সমুদ্র। সমুদ্র এত কাছে তবু তার স্বর স্পষ্ট নয় এখন। খুব ক্ষীণ এক ধ্বনি শুধু কানে আসে। ওটা কি সমুদ্রের স্বর? নাকি ধীমানের নিজেরই নিশ্বাসের আওয়াজ? গাঢ়, কিন্তু চাপা!

রোগা লম্বা এক উর্দিপরা বেয়ারা এগিয়ে আসছে। নকুল।

ধীমান তাড়াতাড়ি নিজেকে সপ্রতিভ করে নিল,—কী গো ভাই, আমার ছেলে জিজ্ঞেস করছে তোমাদের এখানে কটেজে বাথরুম-টাথরুম আছে তো?

নকুলের চকচকে কালো মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। ধীমানের ইঙ্গিত সে বুঝে গেছে। দেঁতো হাসিতে ভরিয়ে ফেলল মুখ,—নিশ্চয়ই আছে স্যার। আপনাদের কত নম্বর কটেজ?

—দাঁড়াও, মেমসাহেব জানে। ধীমান ডাকল শ্রাবণীকে,—এই, বুকিংস্লিপটা দাও তো, অফিসের এন্ট্রিগুলো সেরে আসি।

অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধীমান আরেকবার পিছন ফিরল। না, শ্রাবণীরা এদিকে আসছে না। তাতার পৌঁছে গেছে মার কাছে, ছেলের হাত ধরে পায়ে পায়ে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে শ্রাবণী। চড়া রোদ্দুর মাথায় করে। অফিসরুমে ঢুকে ধীমানের দ্বিতীয় বার পা কেঁপে গেল। কাউন্টারে সেই ফর্সা মোটা গোঁফঅলা লোকটা! অরুণ না বরুণ কী যেন নাম! লোকটা মাথা নিচু করে একমনে ক্যালকুলেটার টিপে যাচ্ছে।

ধীমান গলাখাঁকারি দিল,—এক্সকিউজ মি। একটা বুকিং ছিল। ধীমান বাসু অ্যাণ্ড ফ্যামিলি।

লোকটা মুখ তুলল,—আসুন স্যার আসুন। ওয়েলকাম টু আওয়ার রিসর্ট।

বুকিং স্লিপ দেখার সময় একটু কি চমকে উঠল লোকটা? কপালে ভাঁজ পড়ল? পেশাদার ভঙ্গিতে জাবদা রেজিস্টার এগিয়ে দিয়েছে সামনে,—ফিলআপ করুন স্যার। ... এই নকুল, বারো নম্বর রেডি আছে তো? লাগেজ পৌঁছে দিয়ে আয়।

ধীমান বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। লোকটা শ্যেনদৃষ্টিতে ধীমানের লেখা দেখছে। ধীমান বাসু, মেল, এজ থার্টি সিক্স। শ্রাবণী বাসু, ফিমেল, এজ থার্টিটু। অর্চিষ্মান বাসু, চাইল্ড, এজ সিক্স।

কপাল! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত বেড়ানোর জায়গা থাকতে এই চাঁদিপুরই পছন্দ হল শ্রাবণীর! কী কুক্ষণেই যে ওই মুটকি বঞ্জনাটা বর নিয়ে থেকে গেছে এই রিসর্টেই! শুধু কি থাকা! ফিরে গিয়ে এমন ব্রেনওয়াশ করেছে বন্ধুর যে নাচতে নাচতে সে একেবারে টিকিট কেটে ফেলল! ধীমান বাধা দেওয়ার অবকাশটুকুও পেল না। মার মুখে শুনে শুনে ছেলেরও বায়না, কুঁড়েঘবে থাকব বাবা, কুঁড়েঘরে থাকব বাবা! ধীমান করবেটা কী? সে তো আব চিৎকাব করে বউ-বাচ্চাকে বলতে পারে না, ওখানে তোমাদের নিয়ে যাওয়া যায় না! ওই সমুদ্রটুকু আমাদের—আমার আর দোলনের!

বেজাব মুখে খাতা ঘুবিয়ে দিল ধীমান,—ঘবে দুটো চা পাঠিয়ে দেবেন তো।

—এই গরমে চা খাবেন স্যার? বলেন তো ডাব পাঠিয়ে দিই, কচি দেখে। লোকটা গলা নামাল,—আপনি তো স্যাব ডাবই...

—বল্লাম তো চা। ধীমান ঈষৎ রূঢ়।

দোলন চা খায় না। প্রত্যেকবার এখানে এসে প্রথমেই ডাবের অর্ডার করে থাকে ধীমান। লোকটা ভোলেনি। প্রতিটি বোর্ডারের পছন্দ অপছন্দ নিপুণভাবে জমা রেখে দেয় স্মৃতিতে। এদেব বেশি পাত্তা না দেওয়াই ভাল। ধীমান গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ছোট্ট একটা মাঠের উপর বারো নম্বর কুটির। সামনে কযেকটা কাজু গাছ। তার পরে একটু ঢালু জমি। তারপরে তারকাঁটার বেড়া। বেড়ার গায়ে ঝাউগাছের সারি। সেখান থেকে খাড়া নেমে গেছে বালুতট। বড় বড পাথর ফেলে সীমাবেখা টানা আছে বালুতটেব। জোয়ার এলে সমুদ্র আছড়ে পড়ে পাথরের উপর, ভাঁটায় চলে যায় প্রায় দৃষ্টিসীমার বাইবে।

নকুল ঘর খুলে দিয়ে গেছে। ভিতরে ঢুকতে একটুও ইচ্ছে করছিল না ধীমানের। তার চোখ ঘুরেফিরে প্রান্তসীমার কুটিবটার দিকে চলে যাচ্ছে বার বাব। তেরো নম্বর। তেরো নম্বর। ওখানে সমুদ্রের সামনে কোনও ঝাউয়ের আড়াল নেই। সমুদ্র ওখানে সম্পূর্ণ অবারিত। নগ্ননির্জন।

ধীমান সম্মোহিতের মতো তেরো নম্বরের দিকে এগিয়ে গেল। ঘরের দরজায় তালা, সম্ভবত কোনও বোর্ডার নেই, তাতে কিছু যায় আসে না ধীমানের। তার কাছে ঘরটা সবসময়ই উন্মুক্ত। ও ঘরের প্রতিটি খাঁজ, দাগ, কোণ, অণুকোণ বড় বেশি চেনা। মুখস্থ। দোলনের শরীর—যেমন, দোলনের নির্লোম ফর্সা দুটো পা। দরজার দু'পাশে দুটো সিঙ্গলবেড খাট। ডানদিকের খাটের পায়ের কাছে বাহারি ড্রেসিংটেবিল। ছোট্ট সুন্দর টুল। দোলনের ডান উরুতে কালচে বাদামী জড়ুল। বাঁ দিকের কোণে

দেওয়াল আলমারি। বাঁ হাঁটুতে ছোটবেলার কাটা দাগ। মাঝের দেওয়ালে চেয়ার টেবিল, টেবিলে নীল জগ, কাচের গ্লাস, সোনালি অ্যাশট্রে। দোলনের পিঠে পর পর তিনটে লাল তিল। দু খাটের মধ্যিখানে সরু লম্বা চটের কার্পেট। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা দোলনের শিরদাঁড়ায় রহস্যময় গভীর খাঁজ। চোখ বুজে অনুপুঙ্খ বর্ণনা করে যেতে পারে ধীমান। দেওয়ালে ফুলহাতে হাস্যময়ী জাপানী তরুণী। বাথরুমের শাওয়ারে গোলাপি ঝাঝরি। দোলনের গালের টোল—সব. সব কিছু। দোলনের গালের টোল ইদানীং অনেকটা ভরে এসেছে। সম্প্রতি চশমা নেওয়ার পর মুখটা একটু অন্যবকম। শাওয়ারের ঝাঁঝরির রঙ কি বদলেছে? গোলাপি থেকে শ্যাওলাসবুজ? অথবা গাঢ় নীল?

মনে হয় না। দু'বছরে এই রিসর্টের কোনও কিছুই তেমন বদলাতে দেখেনি ধীমান। ভিতরে—বাইবেও। সামনেব কাঁটাতাবের বেড়াটা প্রথম দিনের মতোই ভাঙা ভাঙা। একটা জায়গায় তো পুবো খুলে পড়েছে। ওই কাঁটাতারের ফাঁক দিযেই প্রথম বারসমুদ্রে নেমেছিল দোলন। লাফিয়ে পাথরে নামতে গিয়ে পা কেটে গিয়েছিল অনেকটা। হয়তো প্রথমবাব বলেই।

ধীমান খুব চোটপাট করেছিল ম্যানেজারেব ওপর,—তাবকাঁটাটা আপনারা সারাতে পারেন না? ওটা ঠিকমতো বাঁধা থাকলে লোকজন ওখান দিয়ে নামতেও পারে না, অ্যাক্সিডেন্টের চান্সও কমে যায়।

লোকটা বলেছিল,—এটা কী বললেন স্যার? সমুদ্রে যাওয়ার গেট তো আছেই। সেখান দিয়ে না গিয়ে বাঁকা পথে যাবেনই বা কেন?

তা সত্যি, একটা গেট আছে বটে। কাঠের। সেই গেট ধরেই এখন দাঁড়িযে আছে শ্রাবণী। তার শাড়ির আঁচল প্রমত্ত হাওয়ায় পতাকার মতো উড়ছে। শ্রাবণীর পাশে তাতার। তাতারের গা ঘেঁষে একটা সাদাকালো নেড়ি কুকুর। কুকুরটা লেজ নাড়ছিল। জ্যৈষ্ঠের খুনে রোদ্দুরে ঝলসানো ছবির মতো লাগছে দৃশ্যটা।

ধীমান ফিরল। এই ঝাঁঝাঁ রোদে ছেলেটাকে ওভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে! অসুখবিসুখ করে যাবে না! এতটুকু যদি বোধগম্যি থাকে শ্রাবণীর! বারো নম্বরের সামনের ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে গলা চড়াল ধীমান.—তাতার, অ্যাই তাতার, আর রোদ্দুরে নয়, চলে এসো।

সমুদ্র বেশ দূরে সরে গেছে। ঢেউয়ের শব্দ প্রায় নেই। আশপাশে মানুষজনও চোখে পড়ে না। বিজন রোদ্দুর পেবিয়ে ধীমানের ডাক সহজেই পৌঁছে গেছে ঝলসানো ছবিটার কাছে। রোদ মাড়িয়ে ফিবছে তাতার। লাফিয়ে লাফিয়ে। পিছনে শ্রাবণী। ধীব।

ধীমানের কাছে এসে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল তাতার। বার বার ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে সমুদ্রের দিকে,—বাবা, আমরা এই সমুদ্রে চান করব?

খড়েছাওয়া বারান্দায় খান-দুই বেতের চেয়ার। একটা ইজিচেয়ারও। ধীমান ইজিচেয়ারে বসল,—হ্যাঁ, তবে আজ নয়, কাল সকালে।

—কেন? আজ নয় কেন?

—দেখছ না এখন সমুদ্র চলে যাচ্ছে! কাল সকালে বড় বড় পা ফেলে আমাদের কাছে চলে আসবে, তখন নামব আমরা।

—এমা, সমুদ্রের আবার পা থাকে নাকি!

—থাকেই তো। ঢেউগুলোই তো পা।

—তা এখন চলে যাচ্ছে কেন?

—ইচ্ছে।' যখন ইচ্ছে কাছে আসবে, যখন ইচ্ছে চলে যাবে।

—কেন? সমুদ্র এরকম কেন?

—বললাম যে ইচ্ছে। মুড।

—তবে যে মা বলল সমুদ্রটা এখানে একটা খাঁড়িব মতো। পাড় ভেঙে ভিতবে চলে এসেছে। জোযাবে জল বাড়লে এগিযে আসে—ভাঁটায চলে যায়।

খাঁড়ি... জোয়ার.. ভাঁটা— এভাবে সমুদ্রকে দেখতে অভ্যস্ত নয ধীমান। তাব কাছে সমুদ্র সমুদ্রই। অনন্ত বিশাল আনন্দ। একটা কল্পনা। পায়েব উপমাটা অবশ্য দোলনেব। দোলন ধীমানের চেয়েও বেশি কল্পনাপ্রবণ। শ্রাবণীব এতটুকু কল্পনাশক্তি নেই। সব রঙিন কল্পনাকেই শ্রাবণী ঘুরিযে ফিরিযে যুক্তির পাতায নিযে আসতে চায। বিরস মুখে ছেলেকে কোলে টানল ধীমান,—তোমাব মা যা বলেছে সেটাই ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের উৎসাহ বেড়ে গেছে তাতারের,—সমুদ্রের বঙ এখানে এমন ঘোলা কেন বাবা? সমুদ্রের রঙ তো নীল হয়?

—এখানেও নীল হয়। শীতকালে। বলতে গিয়েও হোঁচট খেল ধীমান। শ্রাবণী পাশের চেয়াবে বসে আঁচলে ঘাম মুচছে। ধীমান কথাটা ঘুরিযে নিল,—সমুদ্র সব জায়গাতেই শীতকালে বেশি নীল।

শ্রাবণী বলল,—আমার কিন্তু বাপু এই সমুদ্রটাই বেশি ভাল লাগছে। নীল সমুদ্র যেন বড় বেশি ছবি-ছবি।

ধীমান সাবধান হয়ে গেছে। খানিকটা তেল দেওয়াব ভঙ্গিতে বলল,—তোমার বঞ্জনার এই একটা টেস্টেরই তারিফ কবা যায়। জাযগাটা মার্ভেলাস। বাঁধাধরা হোটেল বিল্ডিং-এ না থেকে সুন্দর আলাদাভাবে থাকা, গিজগিজে ভিড় নেই দীঘা-পুরীর মতো... কী আরাম!

শ্রাবণী ঘরে যাচ্ছিল, দরজায় দাঁড়াল। তরল স্বরে বলল,—না এলে এমন স্বর্গ তুমি মিস করতে তো।

চা এসে গেছে। নকুল নয়, ট্যারা মেঘনাদ পট থেকে চা ঢেলে দিল দুজনকে, —আপনাদেব মিলটা বলে দেবেন স্যার?

মেঘনাদেব মুখের দিকে তাকাল না ধীমান,—কী পাওয়া যাবে?

—ফিশ, চিকেন...

—আমি চিকেন খাব বাবা।

—তা হলে তিনটে চিকেনই বলে দিই, কী বলো?

শ্রাবণী কাপ হাতে বাইরে এল,—আমি মুর্গি খাব না—মাছ।

জানা কথা। শ্রাবণীর সঙ্গে ছোটখাটো পছন্দগুলোও আর মিলতে চায় না আজকাল। ধীমান যদি মাখন চায়, শ্রাবণী চাইবে জ্যামজেলি। শ্রাবণী দেওয়ালে ক্রিম রঙ চাইলে, হাল্কা নীল ভাল লাগতে থাকে ধীমানের। একমাত্র ছেলের সঙ্গেই ধীমানের

যা মতের মিল। ওই ছেলের টানেই না শ্রাবণীর সঙ্গে সম্পর্কটা জিইয়ে রাখা।

মেঘনাদ অর্ডার নিয়ে চলে যাচ্ছিল, কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল,—খাবার কি রুমেই দিয়ে যাব স্যার?

—কেন? রুমে কেন? তোমাদের ডাইনিং হল আছে না?

—সে তো আছেই। মেঘনাদের মুখ হাসি-হাসি,—অনেকে তো রুমে খাওয়া পছন্দ করে. তাই বলছিলাম।

মেঘনাদের হাসিতে কি বিদ্রূপ? ধীমানের কান মাথা ঝাঁঝাঁ করে উঠল। শেষে বেযাবা-বাবুর্চিদেব খোঁচাও হজম করতে হবে তাকে। অকাবণে রুক্ষ হল ধীমান,

—অনেকে পছন্দ করতে পাবে, আমরা করি না—বুঝেছ?

মেঘনাদ কথাটা বুঝল. রুক্ষতাটা নয়। একই ভাবে হাসছে.—কটা নাগাদ খেতে আসছেন স্যাব?

শ্রাবণীর চোখে কৌতুক,— কেন গো? সেই জেনে তবে রান্না বসাবে? আমবা ছাড়া আর কোনও বোর্ডার নেই বুঝি?

—তেমন আর কই? গত হপ্তাতেও সব ফুল ছিল। আজ তিন পাচ সাত আট এগাবো ছাড়া সব ফাঁকা। কাল অনেকে আসবে।

গুম গুম করে পব পব কযেকটা চাপা আওযাজ হল। তাতারের চোখ পলকে গোল গোল.—কীসেব শব্দ বাবা? সমুদ্র পাড় ভাঙছে?

—দুর বোকা। শ্রাবণী হেসে ফেলল.—এখানে মিলিটারির গুলিগোলা টেস্ট হয়। ফাঁকা জায়গায় পরীক্ষা করে দেখা হয় কোন গোলা কত দূর যায়।

—আগুন জ্বলে?

—কে জানে। হয়তো জ্বলে—হয়তো জ্বলে না।

শ্রাবণী ঘবে চলে গেল।

তাতাব ঢাল বেয়ে নেমে গেছে কাঁটাতাবের কাছে। তেরো নম্বরেব সামনে। দু'হাতে লগবগে খুঁটিটা ধরে নাড়াচ্ছে প্রাণপণ। একটা কাঠঠোকরা অনেকক্ষণ ধরে একটানা শব্দ বাজিয়ে চলেছে। পাশের ঝাঁকড়া গাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে পাখিটা। দেখা যায় না তাকে, শুধু শব্দ শোনা যায়—ঠক ঠক ঠক ঠক।

শ্রাবণী ঘবে টুকটাক গোছানোর কাজ সাবছে। সাবান শ্যাম্পু তোয়ালে চিরুনি বাখল জায়গামতো। ধীমানেব পাজামা-পাঞ্জাবি বিছানাব উপর। তাতারেব জামাপ্যান্টও। শাড়ি জামা কাঁধে ঝুলিয়ে বারান্দায় এল,—তাতার. চান করবে এসো।

বাবা থাকলে তাতার মার কথা কানেই তোলে না।

শ্রাবণী আবার ডাকল,—তাতার...তাতাআর...একটা বাজে, আর হুড়োহুড়ি নয়।

ধীমান ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখছিল। সমুদ্র এখন খুব দ্রুত পিছোচ্ছে। মধ্যাহ্নসূর্যের দাপটে চতুর্দিক কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া। একটানা তাকিয়ে থাকলে ঘোর লেগে যায়। সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোরটা কাটাল ধীমান,—যাও না, নিজে গিয়ে ধরে নিয়ে এসো না। কাঁটায় হাত-পা কাটবে যে। এই ক'দিন আগে কাচে পা কেটে এল...

—ওমা, তোমার মনে আছে? শ্রাবণী হঠাৎই যেন থমকেছে।

ধীমান চুপ করে গেল। ছেলের কিছু হলে শ্রাবণীকে একাই ছোটাছুটি করতে হয়। সে স্কুলেই হোক আর ডাক্তারখানায়। সে কথাটা আকার ইঙ্গিতে মাঝে মাঝেই ধীমানকে স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রাবণী। ধীমান গায়ে মাখে না। কিন্তু এই মুহূর্তে কথাটা বুঝি একটু বিঁধল তাকে।

পিছনের আট আর সাত কটেজ দুটোতে এক দঙ্গল লোক ফিরেছে কোথথেকে। হঠাৎ হইহই কোলাহলে পাশের গাছের কাঠঠোকরাটা চমকে থামল। এতক্ষণেব নির্জনতা ছিঁড়ে গেছে।

শ্রাবণী তাতারকে ধরে এনে দাঁড়িয়েছে সামনে,—ওই কটেজটা কী দারুণ, তাই না গো? সামনেটা পুরো ফাঁকা, ঘর আব সমুদ্র, মাঝখানে আব কিছু নেই!

ধীমান প্রাণপণ চেষ্টায় তেরো নম্বরের দিকে উদাস তাকাল,—হুঁ, তবে একটু বেশি ফাঁকা।

—ওটা তো খালি আছে, দ্যাখো না ম্যানেজারকে বলে ওখানে শিফট করা যায় কিনা। রাত্তিরবেলা ভীষণ ভাল লাগবে।

দূরে আবার গোলা পতনের শব্দ। ধীমানের গলা কেঁপে গেল,—না। অত ফাঁকা ভাল না। রাতে সাপখোপ বেরোতে পারে।

তিন

দোলনের সঙ্গে ধীমানের পরিচয় তেমন নতুন নয়, আবাব খুব পুবনোও নয়। ধীমানদের অফিসের ফ্লোরেই এল আই সির একটা ব্রাঞ্চ আছে। সেখানে প্রায়ই আসত দোলন। বছর তিনেক আগে। লিফটে করিডোরে গেটে বেশ কয়েকবার চোখে পড়েছিল ধীমানের। চোখে পড়ার মতোই চেহারা। বাঙালী মেয়েদের তুলনায় দীর্ঘাঙ্গী, ছিপছিপে কিন্তু ভরাট স্বাস্থ্য, স্নিগ্ধ মুখশ্রী, টানা টানা চোখ, মসৃণ ত্বক। বয়স বড়জোর চব্বিশ পঁচিশ। একবার তাকালে দ্বিতীয়বার চোখ চলে যাবেই।

সুযোগ বুঝে একদিন আলাপও করে ফেলল ধীমান,—কিছু মনে করবেন না, আপনাকে প্রায়ই এসে দাঁড়িযে থাকতে দেখি, আপনার কি কোনও পলিসি-টলিসি আটকে আছে?

সুন্দরী মেয়েরা সাধারণত নিজেদের সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকে। রাস্তাঘাটের আগ্রহী পুরুষদের সম্পর্কেও। কিন্তু দোলন সেদিন বড় বিষণ্ণ ছিল। অন্যমনস্ক। আপন মনেই বলে ফেলেছিল,—রোজই এসে ফিরে যাচ্ছি। রোজই কিছু না কিছু নতুন কাগজ চায়।

—ম্যাচিওরড পলিসি?

—না, অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট চাইল, দিলাম। হসপিটালের কাগজপত্র নিল। এখন বলছে ওসবে হবে না, ওরা নিজেরা মেডিকাল বোর্ড বসাবে।

দোলনের স্বরে এমন কান্নার আভাস, নাড়া খেয়ে গিয়েছিল ধীমান। উদ্বিগ্ন মুখে বলেছিল,—আমার এখানে দু'তিনজন চেনা আছে, বলেন তো কথা বলে দেখতে পারি।

—কাজ হবে বলে মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত বোধহয় বাবাকে আবার টানাটানি করতেই হবে।

—আপনার বাবা... ?

—স্পাইনাল কর্ড ভেঙে গেছে। বাস থেকে পড়ে। দোলনের চোখের কোলে অশ্রুবিন্দু টলটল,—আর কোনওদিন বাবা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না।

তরঙ্গহীন বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে উদাস তাকাল ধীমান। কেন যে সেদিন সেই অশ্রুবিন্দু দেখে ফেলেছিল সে! না দেখলে হয়ত জীবনের ধারাটা একই খাতে বয়ে যেত। অফিস সংসার স্ত্রী পুত্র একঘেয়ে। ভ্যাদভ্যাদে।

বিকেলে সমুদ্র বহু বহু দূরে সরে গেছে, পড়ে আছে শুধু একটা শান্ত জলস্তর। এখন অগভীর। কোথাও পায়ের চেটোটুকু ডোবে, কোথাও গোড়ালি, কোথাও হাঁটু। দিকহীন বাতাসে জলস্তর কাঁপছে মৃদু মৃদু। ভেজা বালি কখনও পাথরের মতো কঠিন, কখনও বা পিছল কাদা। কিনারার কাছে পর পর কয়েকটা কালো খুঁটি। জলে আধডোবা। খুঁটিতে বসে সমুদ্রকে পাহারা দিচ্ছে গোটাকয়েক স্থির বক। তাদের ডানায় পড়ন্ত সূর্যের আলো। তাতার আর শ্রাবণী হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাতার মাঝে মাঝে লাফিয়ে জলে চলে যাচ্ছে, দৌড়তে দৌড়তে ফিরছে বালিতে। শ্রাবণী কোমর নুইয়ে ঝিনুক কুড়িয়ে চলেছে ক্রমাগত। অসংখ্য ঝিনুক ছড়িয়ে আছে সিক্ত বেলায়।

বড়সড় একটা কালচে কাঁটার কঙ্কাল কুড়িয়ে তাতার দৌড়ে এল,—এটা কী বাবা ?

ধীমান ভাল ভাবে নিরীক্ষণ করল,—বোধহয় শঙ্কর মাছ।

—শঙ্কর মাছের তো লম্বা লেজ থাকে, চাবুক হয় ?

ধীমান হাসল—চাবুকটা খসে গেছে।

—আমি এটা বাড়ি নিয়ে যাব বাবা।

—ইশশ! ধীমান নাক কোঁচকাল,—পচা গন্ধ বেরোচ্ছে! কটেজে নিয়ে গেলেই পিঁপড়ে লেগে যাবে।

—না, আমি এটা নিয়ে যাব। রোদ্দুরে শুকিয়ে নেব।

কঙ্কালে লেগে থাকা পচাগলা অবশেষ শুধু শুকিয়ে নিলেই শুদ্ধ হয় না, পচা অংশ নির্মম হাতে চেঁছে ফেলে দিতে হয়।

—এটা নিয়ে তুই কী করবি ?

—এটা আমা-র কালেকশান। আমি এটা রঙ করে একটা ডায়নোসর বানাব। গোল গোল দুটো চোখ, ধারালো মাঝখানটা নাক... তাতার বকবক করে চলেছে তো চলেছেই। ধীমান শুনছিল না। নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগছিল ধীমানের। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তাতার আর শ্রাবণী ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে এখন তরতাজা। ধীমানই শুতে পারল না একফোঁটা। চোখ বুজলেই সামনে দোলন। তেরো নম্বর ঘর।

ধীমান দাঁড়িয়ে পড়ল,—অ্যাই, তোর মাকে জিজ্ঞেস কর তো আর কদ্দূর হাঁটতে হবে ? ঠ্যাং তো ছিঁড়ে গেল!

তাতার দৌড়তে গিয়ে থমকে গেল। ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে একপাল গরু নেমে আসছে জনমানবহীন সৈকতে। তাদের গলার ঘণ্টি এলোমেলো বেজে উঠল টুংটুং।

গরুগুলোকে সন্তর্পণে পার হল তাতার। মার কাছে পৌঁচেছে। সেখান থেকেই চেঁচাল, —মা বলছে আরও যাবে। মোহনা পর্যন্ত।

রাগে ধীমানের ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। সেই চারটে থেকে হাঁটা শুরু হয়েছে, এখন পাঁচটা দশ, কত দূরে মোহনা তার ঠিক নেই, তবু হাঁটতেই হবে! কোথায় এখন সে সমুদ্রের ধারে দোলনের কাঁধে মাথা রেখে বসে থাকবে, তা নয়, এই ট্যাঙোশ ট্যাঙোশ হাঁটা! দোলনের অবশ্য খুব ইচ্ছে ছিল, এবার জঙ্গলে যাওয়ার। কাঁকড়াঝোড়। শাল-মহুয়ার বনে হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাবে দোলন, বড় বড় পাতার ফাঁক দিয়ে শোঁ শোঁ হাওয়া বইবে, শুকনো পাতা মাড়িয়ে শব্দ করে দৌড়বে ধীমান, গাছের আড়াল থেকে তাই দেখে ঝর্না হয়ে দোলন হাসিতে ভেঙে পড়বে! ভাবতেই শরীর জুড়ে রোমাঞ্চ। ওই যে উদ্দেশ্যহীন বাধাবন্ধনহীন দৌড়, তার উত্তেজনা কী তীব্র তা শ্রাবণী কোনওদিনই বুঝবে না।

শ্রাবণী না হয় নেহাতই উত্তাপহীন। মামুলি। এ উত্তেজনার অর্থ ধীমানই কি ছাই পুরোপুরি বোঝে? বুঝলে কি পরিণতিহীন সম্পর্ক টিকে থাকে এতদিন? না, ধীমান নিজেই নিজের চিন্তাটাকে মানতে পারল না। পরিণতি না থাক, সুখ আছে, রহস্য আছে। রহস্যই তো অদৃশ্য তন্তুতে বেঁধে রাখে সম্পর্ককে। রহস্য ছিঁড়ে গেলে পুরুষের কাছে নারী ম্যাড়মেড়ে। জোলো। সেই রহস্য এখনও টিকিয়ে রাখতে পেরেছে দোলন। শ্রাবণী পারেনি। তাছাড়া দোলনের সংশয়হীন নির্ভরতাকে ধীমান অস্বীকার করবেই বা কী করে? পঙ্গু বাবা, আধপাগলা মা, ছোট ছোট ভাইবোন নিয়ে দোলন যখন অকূল পাথারে তখন কে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল? ধীমান—ধীমানই তো! কোনওরকম প্রত্যাশা ছাড়াই। নিজের অফিসের কণ্ট্রাক্টরদের ধরে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে দোলনের। ছোট চাকরি তবু পা ফেলে দাঁড়ানোর মাটি তো বটে। দোলনের বাবার নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে, ছোটাছুটি করে জীবনবিমার টাকা উদ্ধার করেছে, ভাইবোনেদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে, এসব কি কম কথা! বিনিময়ে সে দোলনের কাছে কিছুই চায়নি। একটু সঙ্গ, একটু বন্ধুত্ব, একচিলতে নীল আকাশ, ব্যাস।

ধীমান দোলনকে প্রথম চুমু খেয়েছিল আলাপের ছ'মাস পরে। দোলনদেরই বেহালার বাড়িতে। আগ্রাসী পুরুষের মতো নয়, ভীরু প্রেমিকের মতো। তারও অনেক পরে, প্রায় বছর দেড়েকের মাথায় দোলন বলেছিল,—আমাকে ক'দিনের জন্য একটু বেড়াতে নিয়ে যাবে? খোলা হাওয়ায়? কোনও ফাঁকা জায়গায়? এই দমবন্ধ পরিবেশে আমি হাঁফিয়ে উঠেছি।

ধীমানের শরীরে মাদল বেজে উঠেছিল। তাতার হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে শ্রাবণী তখন শুধুই অভ্যাস। বর্ণহীন স্বাদহীন পানীয় জলের মতো। ছোট ছোট কামনাবাসনাগুলোই বা শ্রাবণীর কাছ থেকে সেভাবে মেটে কই। তবু ধীমান মাথা হারায়নি,—আমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিণাম জানো?

—জানি। দোলন জোরে শ্বাস নিয়েছিল,—তুমি আমাকে গপ করে খেয়ে ফেলবে!

—তারপর? ধীমানের রক্তে লক্ষ পিঁপড়ের ওঠানামা।

—তার আর পর নেই। আমি অত ভাবতে পারি না। ভাবতে হয় তুমি ভাবো।

—তোমার বাবা-মা কী মনে করবে? ভাইবোনেরা?

—তাদের তো তুমি কবেই গিলে বসে আছ। তুমি তাদের কাছে ভগবানের মানুষ এডিশান। অবতাব নাম্বার এগারো।

তখনই চাঁদিপুর। প্রথমবার। শরীর শরীরের স্বাদ পেলে আর কি তাকে বেঁধে রাখা যায়? দু'একবাব লুকিয়েচুরিয়ে ডায়মণ্ডহারবার, ফ্লেশ্বরের বাংলো। অথবা কলকাতারই কোনও হোটেলেব নিভৃতি। আর বার বাব এই চাঁদিপুর। ওই বাঁধাধরা তেরো নম্বব কটেজ। একটু সময় কুড়িয়ে পেলেই শান্ত নির্জন ওই একটেরে কুটিরটা কী যে ভয়ঙ্কব ভাবে টানে ধীমানকে। রাত বাড়লেই ওই কুটির ক্রমশ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো মাযাবী হয়ে ওঠে। একটানা সমুদ্রের ডাক, ঝিঁঝিঁপোকাব শব্দ আর নোনতা বাষ্প চাঁদের আলোয় মাখামাখি হয়ে উড়তে থাকে কুটিরেব চারপাশে।

দোলন বলে.—তুমি কিন্তু এই কটেজটাতে অবসেসড হয়ে যাচ্ছ!

দোলনের আর্দ্র মুখ থেকে নুনটুকু মুছে নেয় ধীমান,—তুমি এখানে জোরে নিশ্বাস নাও, একটা অন্য পৃথিবীর গন্ধ পাবে।

দোলন খিলখিল হাসে, শ্বাস টানে জোর জোব,—পাচ্ছি। আঁশটে গন্ধ।

—আরও জোরে নিশ্বাস নাও।

—পাচ্ছি। ঘামের গন্ধ।

—আরও জোরে।

শ্বাস টানতে গিয়ে দোলনেব শরীর বেলুনের মতো ফুলে ওঠে.—পাচ্ছি। বিপদের গন্ধ।

—বিপদ কীসের?

—কটেজ নাম্বারটা মনে রেখো মশাই, আনলাকি থার্টিন!

শ্রাবণী দূর থেকে হাত নেড়ে ডাকছে ধীমানকে।

ধীমান গলা ফাটিয়ে চেঁচাল,—কীইই?

হু-হু বাতাস ছুটে আসছে সাগর থেকে। বাঁ দিকের ঝাউবনে আছড়ে পড়ে ঢেউয়ের মতো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। ভাঙা বাতাস টলমল করছে পাড়ে। বাতাসের ওপার থেকে শ্রাবণীর গলা শুনতে পেল না ধীমান। শ্রাবণী-তাতার একটা বাঁকের আড়ালে উধাও। দীর্ঘ পথ ফুরিয়ে এল। সমুদ্রকে পাশে রেখে সামনে এখন বিশাল চওড়া এক চর। অন্য ধারে ছোট ছোট বালিয়াড়ি। ঝাউবন দূরে সরে গেছে। আরও সামনে চরের বুকে রুপোলি পাতের মতো শুয়ে আছে বুড়িবালাম।

এদিকটা ধীমান আগে কোনওবার আসেনি। আসার সময়ই হয়নি। যখন বাইরে সমুদ্র, ঘরে সমুদ্র তখন কে ছোটে মোহনা খুঁজতে? আরও কিছুটা এগিয়ে বাঁকটুকু পেরোতেই ধীমান সম্পূর্ণ স্থাণুবৎ। বালির বুকে যত দূর চোখ যায় শুধু লাল ফুলের বাগিচা। ফুল নয়, কাঁকড়া। হাজারে হাজারে, লাখে লাখে লাল কাঁকড়া ফুল হয়ে ফুটে আছে বালির বুকে।

ধীমান মুগ্ধ চোখে দৃশ্যটা দেখছিল। এত হেঁটেও তাতারের প্রাণশক্তি নিঃশেষ

হয়নি, সে এক বিচিত্র খেলায় মেতে উঠেছে। কাঁকড়াগুলোর দিকে এক পা এগোয়, সামনের এক রাশ লাল ফুল বালিতে মিলিয়ে যায়। আবার এক পা এগোল, আরেকটা ঝাঁক নেই। আরেক পা এগোতে পিছনের ফুলেরা আবার ফুট ফুট ফুটেছে বালিতে, সামনের লাল. ফুল মুখ লুকোল। তাতার যেদিকে ছোটে মিলিয়ে যায় রক্তকুসুম, অন্যদিকে জেগে ওঠে ঝাঁকে ঝাঁকে।

পলকের জন্য ধীমানের বুক কেঁপে উঠল। কাদের ওভাবে তাড়া করে বেড়ায় তাতার ? কাঁকড়া ? নাকি মনেরই কয়েকশ কোটি সুপ্ত কামনা বাসনা ? সামান্য বিপদের গন্ধ পেয়েই আড়ালে লুকোয় ? সুযোগ পেলেই আচ্ছন্ন করে রাখে গোটা মনকে ?

দূর দূর ! কামনা-বাসনা যদি না-ই থাকে তবে এই জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মানে কী ! এক জায়গায় বাসনারা চাপা পড়ে গেলে অন্যত্র তো ফুটে বেরোবেই। এত ভয়, এত বুক-ধুকপুকুনিই বা কীসের ! একজনকেই সারাজীবন ভালবেসে যেতে হবে এমন দাসখত কোথাও লিখে দেয়নি ধীমান। মানুষের মনকে অত নিয়মে বাঁধাও যায় না। শ্রাবণীকে সে বঞ্চিত করেনি ! পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছে, সামাজিক অঙ্গীকাব পালন করে চলেছে। তার পরেও যদি তার মনে আরেক নারীকে ভালবাসার মতো জায়গা থাকে, সেটা তার অপরাধ নয়, হৃদয়ের বিশালতা। দু'হাত ছড়িয়ে ধীমান শরীরের আড় ভাঙল। মনেরও। ক্লান্ত পা দুটোকে সতেজ করতে থেবড়ে বসে পড়ল বালিতে।

শ্রাবণী ছেলেকে ডাকল,—আর গায়ে বালি মাখতে হবে না, এসো, এবার ফিরব।

ধীমান অসহিষ্ণু মুখে বলে উঠল,—আমার আর ক্ষমতা নেই, আমি হেঁটে ফিরতে পারব না।

শ্রাবণীও অবসন্ন। ধীমানের কথা লুফে নিল সে,—ওই পাশে তো আলো দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে রিক্সা-টিক্সা পাওয়া যাবে না ?

—শখ করে এসেছ, এবার ঠেলাটা বোঝো ! শ্রাবণীর অসহায় স্বরে ধীমান একটু মজাই পেল। সে জানে পিছনে একটা বাজার আছে। মাছের আড়তও। একবার সন্ধেবেলা দোলনকে নিয়ে অটোরিক্সা করে বাজারটায় এসেছিল চিংড়িমাছ কিনতে। নিজে থেকেই একটু বেপরোয়া হল ধীমান,—চলো, ওই বাজারে অটো পাওয়া যাবে। পরক্ষণেই ঢোক গিলেছে,—ম্যানেজার বলছিল।

ফেরার পথে বাবা-মা'র মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছে তাতার। অন্ধকারে ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে টলতে টলতে যাচ্ছে অটোরিক্সা, হেডলাইটের আলোয় যেটুকু আলোকিত হয় সেটুকু রাস্তাই দেখতে পাচ্ছিল ধীমান। দু' ধারে ঘন কালো কেয়াঝোপ। বাজারের আঁশটে গন্ধ এখনও তাড়া করে আসছে গাড়িটাকে। দূরে বড় বরফ কারখানাটার আলো ঝলমল করে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ পর একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করল ধীমান। পারছে না। দমকা হাওয়ায় আগুন জ্বলেই নিভে যায়। পর পর কয়েকটা কাঠি নষ্ট হল। তবু চেষ্টা করছে ধীমান।

সিটে মাথা ঠেকিয়ে শ্রাবণী চুপচাপ বসে আছে। হঠাৎ বলে উঠল,—তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।

ধীমানের হাত থেকে দেশলাইটা খসে পড়ে গেল। শ্রাবণী দেখেও দেখল না।

তার চোখ বাইরে স্থির। রুপোলি নদী অন্ধকারে আবার ফিরে এসেছে পাশে। সঙ্গে সঙ্গে চলছে। মাঝে মাঝে নদীতে আলোর বিচ্ছুরণ। নদীজলে থইথই রুপোলি পাত এখন দুঃখী। ছলছল।

শ্রাবণী নদী দেখছিল।

চার

সাত নম্বর কটেজের সামনে রাতের আসর জমজমাট। দুই মেয়েজামাই বাপ-মা দু'তিনটে গুঁড়ি গুঁড়ি বাচ্চা কিচমিচ করে চলেছে সামনে। তাদের সঙ্গে শ্রাবণীও। শ্রাবণীকে পাকড়াও করে বয়স্ক ভদ্রলোক হাত-পা নেড়ে কীসব বলছে, সকলে হেসে খুন। মত্ত বাতাস ঝিম মেরেছে সহসা। সঙ্গে সঙ্গে একটা সামুদ্রিক গরম ঝাঁঝিয়ে উঠেছে। ভ্যাপসা। চিটচিটে।

ধীমান বারান্দায় বসে ঘামছিল। যতটা না গরমে তার চেয়েও বেশি পরিশ্রমে। তাতার একবার ঘুমিয়ে পড়লে তাকে জাগায় কার সাধ্যি! ওই ছেলেকে কোলে করে ঘরে ফেরা. টানতে টানতে তাকে ডাইনিংহলে নিয়ে যাওয়া, সেখান থেকে কাঁধে করে এনে বিছানায় ফেলা—বাপ্স! তাতার কি আর আগের মতো ছোট্টটি আছে যে ধীমান তাকে নিয়ে অবলীলায় ঘুরে বেড়াবে!

ধীমান সামনের ঘাসে ইজিচেয়ারটা নামিয়ে নিল। অদূরে কালিমাখা ভূতের মতো নিঝুম দাঁড়িয়ে তেরো নম্বর কুটির। সেদিক থেকে জোর করে মুখ ফেরাল ধীমান। একটা সিগারেট ধরাল। শরীরমন সহজ করতে চাইছে। আবার শ্রাবণীর হাসি। বেশ জোরে। এত জোরে শ্রাবণীর হাসি বহুকাল শোনেনি ধীমান। কী এত আড্ডা হচ্ছে! ধীমানকে ছেলের পাহারায় বসিয়ে সেই যে কাটল আর কোনও হুঁশই নেই!

নতুন করে বুকের কাঁটাটা খচখচ করে উঠল ধীমানের। তখন শ্রাবণী কী বলতে চাইছিল! একবার যখন বলতে গিয়ে থেমে গেছে, তখন ধীমান যেচে জিজ্ঞাসা না করলে কথাটা আর বলবেই না। শ্রাবণীর স্বভাবটাই এরকম। ভয়ানক চাপা। এত চাপা যে ধীমানের কখনও কখনও ভীষণ অস্বস্তি হয়। ধীমানের সঙ্গে বিয়েটা শ্রাবণীর বাবা-মা প্রথমদিকে মেনে নেয়নি। বলতে গেলে প্রায় এক কাপড়েই চলে এসেছিল শ্রাবণী। তবু কোনওদিন বাবা-মার জন্য তাকে মনখারাপ করতে দেখেনি ধীমান। হয়তো বা করেছে, ধীমানের সামনে নয়। অথচ শ্রাবণী ছিল বাবা-অন্ত প্রাণ। সেই বাবার সঙ্গে সে দেখা করতে গেল বিয়ের দেড় বছর পরে। বাবার হার্ট-অ্যাটাকের খবর শুনে। এটাকে কি চাপা স্বভাব বলে? না জেদ? ধীমানের ঠিক মাথায় ঢোকে না।

নকুল জগে রাতের জল দিতে আসছে। ধীমানকে দেখে ঝুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধীমান আড়ে তাকাল,—কিছু বলবে?

—লাগবে নাকি স্যার? নকুল মাথা চুলকোল,—ছোট আছে একটা। ফরেন।

নকুলকে ধমকাতে গিয়েও সংযত হল ধীমান। সে নিয়মিত মদ খায় না, কিন্তু এখানে এলে ওটা তার চাইই। দোলনও চুমুক দেয় তার গ্লাস থেকে। নেশায় দুজনেরই

চোখ অল্প অল্প জড়িয়ে আসে। বিবেক সাফ হয়ে যায়। স্যাঁতসেঁতে হাওয়ায় নেশা আরও জেঁকে বসলে বাইরের কাঁটাতার মৃদু দোল খেতে থাকে। সমুদ্র আকাশ পৃথিবী অলৌকিক মায়ায় ভরে যায়। যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও কোনও শোক নেই, সমস্যা নেই, দুশ্চিন্তা নেই, জটিলতা নেই—আছে এক ছেদহীন অপার্থিব আনন্দ। সেতার-সরোদের ঝালা। বাঁশি-নূপুরের অনুরণন। কামনায় টনকো দুটো শরীর। সে নেশা কি এখন চলে! ছেলেবউ নিয়ে গেরস্থর মতো বেড়াতে এসে!

নকুলের প্রাপ্য বকশিশটা চুকিয়ে দিল ধীমান। চাপা গলায় বলল—না। তুমি যাও। যাওয়ার সময় মেমসাহেবকে ডেকে দিয়ে যেও।

শ্রাবণী মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফিরেছে। ঘরে উঁকি মারল একবার,—বাহ, তাতারবাবু একেবারে ন্যাতা।

ধীমান গোমড়া,—কী এত হাহা-হিহি হচ্ছিল এতক্ষণ?

শ্রাবণী চেয়ার টেনে ধীমানের মুখোমুখি বসল,—ভদ্রলোক একটা মজাব গল্প বলছিলেন।

—ভদ্রলোক? মানে ওই কেঠো বুড়োটা?

—হ্যাঁগো, ওই বুড়োটাই। খুব রসিক। চল্লিশ বছর আগে এখানে হানিমুন করতে এসেছিলেন, সেই গল্প...

—মেয়ে-জামাইদের সামনে তোমার সঙ্গে হানিমুনের গল্প? ছিঃ!

—সর্বদা কথার এমন বাজে মানে করো কেন বলো তো? নাতিনাতনি হয়ে গেলে মেয়েজামাই বন্ধুর মতো হয়ে যায়। শ্রাবণী আলতো পা দোলাচ্ছে,—দারুণ ইন্টারেস্টিং গল্প—গল্প কেন, ফ্যাক্ট। ওঁদের হানিমুনের এক্সপিরিয়েন্স।

—আমার শোনার দরকার নেই।

—শোনোই না। ওঁরা যখন এসেছিলেন তখন নাকি এসব হোটেল রিসর্ট কিছু ছিল না। ওই ওদিকে দূবে একটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলো ছিল আর সব জঙ্গল-জঙ্গল। তো হয়েছে কী, নতুন স্বামী স্ত্রী পূর্ণিমায় সমুদ্র দেখবেন বলে এসেছেন। সন্ধে সন্ধে খেয়ে নিয়ে একবার ঘরে ঢুকেছেন কি ঢোকেননি, বেরোতে গিয়ে দেখেন দরজায় বাইরে থেকে তালা। চিৎকার ডাকাডাকি দরজাধাক্কা কিছুতেই কেউ দরজা খোলে না। থেকে থেকে খালি মাতাল চৌকিদারটার হুঙ্কার শোনা যায়,—খবরদার! হুঁশিয়ার! নতুন বউ তো কেঁদেকেটে একসা। এই বুঝি ঘরে ডাকাত পড়ে! এই বুঝি কেউ খুন করতে আসে! কোনও হিংস্র জানোয়ার দরজা ভাঙে! ভদ্রলোকও বউকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছেন। একবার দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারেন, একবার স্ত্রীর মাথায় হাত বোলান,—আমি আছি না? ভয় কীসের? তা ভয়ে ভয়ে রাত তো কোনওমতে কাটল। শেষে ভোর হতে সব ভয়ের অবসান করে তালা খুলে গেছে। চৌকিদার চাবি হাতে দাঁত বার করে হাসছে,—বকশিশটা দিন বাবু। এবারকার মতো আপনাদের প্রাণে বাঁচিয়ে দিলাম।

ধীমান ব্যঙ্গ না ছুঁড়ে পারল না,—কেন? সমুদ্র থেকে বাঘ উঠেছিল নাকি?

—ভদ্রলোকও তো ভেবেছিলেন ওরকমই কিছু অঘটন ঘটেছে। পরে শোনেন

অন্য কথা। কী? না, পূর্ণিমার রাতে সমুদ্র নাকি এত অপরূপ হয়ে ওঠে, মানুষ সেই সৌন্দর্য সহ্য করতে পারে না, পাগল হয়ে যায়। জলে নেমে আত্মহত্যাও করে অনেকে। ভাবো অবস্থা! সেই জন্যই চৌকিদার বাইরে থেকে সব্বাইকে তালাবন্ধ করে...। ইশশ, যে সৌন্দর্যর জন্য আসা তারই ভয়ে দুজনকে...

ধীমান বলল,—ছাড়ো তো! যত সব গুলগল্প!

শ্রাবণী বলল,—গুলই হোক আর গল্পই হোক, ব্যাপাবটা কী আয়রনিকাল না? তাছাড়া একটা মজাও আছে, তাই শুনেই তো হাসছিলাম।

—মজা? এর পরেও?

—হ্যাঁ মজা। ভদ্রলোকের তখন নাকি ডাগড়াই গোঁফ ছিল একটা। সেই গোঁফের ভয়ে নতুন বউ ঠকঠক কবে কাঁপত, সহজে কাছে ঘেঁষত না। হানিমুনে এসেও জড়োসড়ো ছিল ভয়ে। তা সেই যে সে রাতে আরও বেশি ভয় পেয়ে ববের হাত চেপে ধরল, ওমনি বর সম্পর্কে ভয় ভ্যানিশ। আর ভদ্রলোকেরও নাকি সেদিন থেকে দুর্দশাব শুরু। ওই চেপে ধরা হাত এক চুলও কোথাও নড়তে দেয় না স্বামীকে। ভদ্রলোক মজা করে বলছিলেন ঠিকই, কিন্তু মুখ চোখে কী স্যাটিসফ্যাকশান! সুখ!

চাঁদ নেই। আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের একেবারে শেষ প্রান্তে ছোট ছোট বিদ্যুতের ঝিলিক। হঠাৎ হঠাৎ আলো হয়ে উঠছে ঝাউবন। তারপর যে আঁধার সেই আঁধার।

ধীমান সহসা প্রশ্ন কবল—তখন তুমি কী যেন বলবে বলছিলে?

—হুঁ। উচ্ছল শ্রাবণী দুম করে চুপ মেরে গেল। অন্যমনস্ক হঠাৎ।

ধীমান অধীর হয়ে উঠছিল—কী হল, বলবে তো?

শ্রাবণী সময় নিচ্ছে। উঠে ঘর থেকে জল খেয়ে এল—আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

বড় পাথরটা সরে গেল ধীমানের বুক থেকে। না, চতুরতায় কোনও ফাঁক নেই তাঁর। নিশ্চিন্ত মুখে বিস্ময় ফুটল—চাকরি! কী চাকরি?

—বিবাট কিছু নয়। একটা স্কুলে। প্রাইমারি স্কুল।

—হঠাৎ চাকরির কী দরকার পড়ল? আশঙ্কা সরে যেতেই ধীমানের অধিকারবোধ চাঙ্গা—তোমার হাতখরচে কম পড়েছে?

উত্তর দিতে গিয়ে শ্রাবণী ভাবল সামান্য—তা নয়, নিজের তো একটা রোজগার থাকা ভাল। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম, জুটে গেল একজনের ব্যাকিংএ। সামনের মাসে জয়েনিং।

—অ। তা অ্যাদ্দিন পর চাকরি করতে দৌড়লে সংসারের কী হবে, অ্যাঁ? তাতার?

—ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হয়েছে কোনওদিন? ভাবনা তো আমার।

ধীমান এবার যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ—স্ট্রেট বলে দিচ্ছি, আমার মত নেই। এর পর তুমি যা ভাল বোঝো।

দু'এক সেকেণ্ড পর ধীমান আবার প্রশ্ন করল—মাইনে কত দেবে?

—সব মিলিয়ে হাজার দুয়েক। শ্রাবণী চোখ তুলল—খুব কম?

অন্ধকারে ভুরু কোঁচকাল ধীমান, উত্তর দিল না।

ধীমান স্বপ্ন দেখছিল।

একটা মথ কীভাবে যেন ঢুকে পড়েছে তার ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটে। এলোপাথাড়ি উড়ছে। ঠোক্কর খাচ্ছে এ দেওয়ালে সে দেওয়ালে। থেমে থাকা পাখায়, সিলিংএ। ওইটুকু মথের ডানায় কী জোর! দেওয়াল কেঁপে উঠল, জানলায় শব্দ ঝনঝন! তীব্র থেকে তীব্রতব। এত উচ্চগ্রামে শব্দ পৌঁচেছে যে কানে তালা লাগার জোগাড়। ধীমান মথটাকে তাড়াতে চাইছিল, পারল না। হঠাৎ কোথা থেকে কনকনে বাতাস এসে কুঁকড়ে দিল শরীর। শীত করছে। ভীষণ শীত।

শব্দ আর শীতের অভিঘাতে ধীমানের ঘুম ছিঁড়ে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছে, চোখ খুলেও প্রথমটা বুঝতে পারল না সে এখন ঠিক কোথায়। চাঁদিপুরেব বারো নম্বর ঘরটাকে চিনতে দু'এক মুহূর্ত সময় লেগে গেল। বাইরে উন্মত্ত ঝোড়োবাতাস বইছে। সেই বাতাসই শব্দ করে ঝাঁকাচ্ছে দরজাজানলা, শীতলতা ঢুকিয়ে দিচ্ছে তার হাড়পাঁজরায়। কখন এমন ঝড় উঠল, বাইরের আলোগুলো সব নিভে গেছে। অন্ধকারে ধীমান পাশের খাটের দিকে তাকাল। কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। রাত কত এখন?

অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে ঘরের আলো জ্বালল ধীমান।

তাতার অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দরজা খোলা। শ্রাবণী ঘরে নেই।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে ধীমান ঘড়ি দেখল। দুটো কুড়ি। গেল কোথায় শ্রাবণী! বাথরুমে নেই বোঝা যাচ্ছে, বাথরুম অন্ধকার। ঘুমচোখে ধীমান দরজায় এল। বারান্দার এক কোণে চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে শ্রাবণী। শ্রাবণীকে ঘিরে অন্ধকারের আস্তরণ।

ধীমান জড়ানো গলায় ডাকল—বাইরে বসে কী করছ? এত রাত্তিরে?

অন্ধকার নড়ল না।

—ওভাবে বসে থেকো না। ঘরে এসো। ঝড় উঠেছে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

অন্ধকার নিঃসাড়।

ধীমান অন্ধকারের কাছে গেল—হল কী তোমার? কী ভাবছ কী বসে?

অন্ধকার সামান্য কেঁপে উঠল—কিছু না। এমনিই।

ধীমান অন্ধকারে শরীর ছুঁল। হাত বোলাল মুখে গলায় হাতে,—ইশশ, গা হাত পা একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!

ধীমানের উত্তাপ একটুও নিল না শ্রাবণী,—তুমি শোও গিয়ে। আমার ঘুম আসছে না।

আরও নিবিড় হল ধীমান,—কী ভাবছ আমাকে বলবে না?

—ভদ্রলোকের গল্পটা ভাবছিলাম। শ্রাবণীর কণ্ঠ বরফ যেন,—কালই তো পূর্ণিমা, তাই না?

পাঁচ

বড়সড় এক ঢেউ ধেয়ে আসছিল তাতারের দিকে। তাতার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছিল। পাড়ের দিকে ছুটতে গিয়ে সামনে মাকে পেয়ে গেছে। দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে মার কোমর। চকিত ধাক্কায় শ্রাবণী চিতপটাং ছেলে সমেত। মা-ছেলের মুখের উপর আছড়ে পড়ল ঢেউটা। দুতিনটে ঘুরপাক খেয়ে দুজনেরই দিশেহারা হাল। তাতার খাবি খেয়ে খকখক কাশছে। চোখ টুকটুকে লাল। শ্রাবণী দম নিতে দু'দিকে মাথা ঝাঁকাচ্ছে সজোরে। থুথু করে মুখের লবণাক্ত জল বার করছে।

নিরাপদ দূরত্ব থেকে ধীমান হো হো করে হেসে উঠল। তাতারের জলে নামার উৎসাহ যত বেশি জলকে ভয়ও ততটাই। শ্রাবণীকে চেপে ধরে তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে আবারও। আকাশ আজ চকচকে নীল। রাত্রে ঝড়টা হয়ে যাওয়ার পর কোথাও মালিন্যের চিহ্নমাত্র নেই। সকালের গাঢ় সোনালি রোদ্দুর মন খুলে হাসছে। পূর্ণিমার টানে সমুদ্রও উত্তাল এখন। একেবারে কাছে এসে ফুঁসছে। রাগী যুবক ঢেউরা এসে হাতপা ছুঁড়ছে পাড়ে, বোল্ডারে আছাড় খেয়ে লাফিযে লাফিয়ে উঠছে।

স্নানার্থীদের ভিড়ও হয়েছে বেশ। আশপাশের হোটেলের বাসিন্দারা নেমে এসেছে সমুদ্রে। সবাই যে সমুদ্রস্নানে উৎসাহী তা নয়, কারুর কারুর জল ছুঁয়েই আনন্দ। ধীমানের মতো। ধীমান কখনও তেমন করে জলে নামে না। দোলন ডাকলেও নয়। মাঝে মাঝে ঢেউয়ে নেমে একটু জলের স্পর্শ নিয়ে আসা, ব্যাস! তারপর জলে পা ডুবিয়ে বসে ভেজা গায়ে অস্থির হুটোপুটি দেখা দোলনের। এই মুহূর্তে শ্রাবণীর। তাতারকে রেখে শ্রাবণী আড়াআড়ি ভাবে প্রবেশ করছে সমুদ্রে। শাড়ির আঁচল কোমরে শক্ত করে জড়ানো, ছোট ছোট ঢেউ আলতো চাপড়ে সরিয়ে দিচ্ছে, টপকে পার হচ্ছে মাঝারি ঢেউ, বড় ঢেউ দেখলে ডুব দিচ্ছে জলের নীচে। দূর থেকে মনে হয় ও যেন শ্রাবণী নয়, অন্য কোনও নারী, যাকে ধীমান চেনে না, আগে কখনও দেখেনি ভাল করে। শাড়িজামা লেপ্টে আছে নারীদেহে। শরীরের প্রতিটি ভাঁজ আলাদা আলাদা ভাবে স্পষ্ট—বুক। কোমর। ঊরু। নিতম্ব। চেনা শরীর অচেনা হয়ে কতকাল পর টানছে ধীমানকে! অভ্যাসের টান নয়, সম্মোহনের টান।

ধীমান উঠে জলে নামল। তাতার বাবাকে নামতে দেখে হইহই করে উঠেছে। হাঁটুজলে শ্রাবণীর পাশে দাঁড়াল ধীমান। শ্রাবণীর খোলা কোমর, ঘাড়, গলা জলে ভিজে চিকচিক।

শ্রাবণী অবাক চোখে ধীমানকে দেখছে। ধীমান শ্রাবণীর কোমর বেড় দিয়ে ধরল, —চলো, একটু ভিতরে যাই।

শ্রাবণী সরতে চাইল,—না না, বেশি জলে জামাকাপড় সামলানো যায় না।

একটা ছোট্ট ঢেউ আলগা পেরোল ধীমান। চাপ দিল শ্রাবণীর কোমরে। অন্য হাত শ্রাবণীর কাঁধে রেখেছে,—কিচ্ছু হবে না, চলো তো।

শ্রাবণী পিছলে গেল,—না, আমি যাব না। তুমি তাতারকে নিয়ে যাও।

শ্রাবণীর চোখে এক বিচিত্র দৃষ্টি। দৃষ্টিতে ভয়ও না, প্রত্যাখ্যানও না, ঘৃণা না,

প্রেমও না! তবে যে কী! কথা বলতে বলতে পিছনে সরছে শ্রাবণী,—বেশি দূরে যেও না। ভিতরে চোরা টান আছে।

ধীমানের জলে নামার আসক্তিটাই মরে গেল। তাতার ধীমানকে জাপটে ধরেছে, —চলো না বাবা! চলো না বাবা!

ছেলের বায়না মেটাতে কিছুটা এগোতেই হল ধীমানকে।

—আপনার তো আজকেই লাস্ট?

ধীমান ঘাড় ফেরাল। সাত নম্বরের বড় জামাই জলে নামছে। ঘাড়েগর্দানে পেটানো বক্সারের মতো চেহারা। হ্যা হ্যা করে হাসছে। ধীমান চোয়াল ফাঁক করল,—শুধু লাস্ট নয়, ফার্স্টও।

লোকটা কথা বাড়ানোর অছিলা পেয়ে গেল,—একটু সময় নিয়ে আসবেন তো। নীলগিরি পাহাড়টা ঘুরে আসতে পারতেন। পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, রাজবাড়ি... কণ্ডাক্টেড ট্যুর আছে।

—তাই?

—পাহাড়ের মাথায় কী সিনিক বিউটি! ঝর্ণা, জঙ্গল,...!

জঙ্গল শব্দটাতে রক্ত চড়ে গেল ধীমানের। দাঁত খিঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হল, তুই যা না শালা! তোর শ্বশুরকে নিয়ে ঘোর না! আমাকে জঙ্গল শোনাচ্ছিস কেন? তার আগেই এক অতিকায় ঢেউ পাগলা হাতির মতো সামনে এসে গেছে। ধীমান তাতারকে চেপে ধরে মরিয়া ডুব দিল। তবু সামলানো গেল না, ধীমানের হাত ছিটকে তাতার ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। ডিগবাজি আর ঘষা খেতে খেতে লুটিয়ে পড়ল পাড়ে।

মুহূর্তে শ্রাবণী লাফিয়ে এসেছে। ঢেউ তাতারকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগেই ছেলেকে আঁকড়ে ধরল। তার চোখেমুখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ।

ধীমান জল থেকে বেরিয়ে এল,—কীরে, লেগেছে?

তাতারের মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছিল। চোখ নাক মুখ জলে বালিতে পরিপূর্ণ। শ্রাবণীর চোখে ঝাঁঝ,—ছেলের হাতই ধরে রাখতে পারো না, আবার আমাকে নামাতে চাইছিলে!

একটু আগের রাগটা দপদপিয়ে উঠল ধীমানের। ক্রুদ্ধ স্বরে বলল,—আমি কি ইচ্ছে করে...?

—থাক, সাফাই গাইতে হবে না। আমি বুঝে গেছি।

তটের প্রান্তে ঝাউগাছের সারি। শ্রাবণী তাতারকে নিয়ে সেখানে গিয়ে বসল। তোয়ালেতে ছেলের গা-মাথা মুছছে যত্ন করে।

ধীমান দাপাতে দাপাতে সামনে এসে দাঁড়াল, তার শর্টপ্যান্টের পকেট বালিতে বোঝাই। খামচে খামচে ভিজে বালি বার করল কিছুটা, তাতারের হাত ধরে টানল, —আয়, আরেকবার যাই।

শ্রাবণী কঠিন,—নাআ, তাতার আর যাবে না।

—এঁএহহ্, যাবে না? ধীমান ভেংচে উঠল,—আমার ছেলেকে নিয়ে আমি যেখানে খুশি যাব। চল্ তো তাতার।

শ্রাবণী কঠিনতর,—ননআআ। আমি বলছি যাবে না, তাতার যাবে না।

ধীমান রাগে স্তম্ভিত। ছেলে তার এত ন্যাওটা তবু সেই ছেলে মাকে ছেড়ে একটুও নড়ছে না। এ যেন ছেলেকে সামনে রেখে শ্রাবণীরই কোনও অঘোষিত যুদ্ধ।

হেরে যাচ্ছিল—ভীষণ ভাবে হেরে যাচ্ছিল ধীমান, এই মুহূর্তে ধীমান যদি বালিতে মুখ গুঁজতে পাবত! ধীমান বিড়বিড় করে উঠল,—বাড়াবাড়ি! সব সময়ে বেশি বাড়াবাড়ি!

পলকে শ্রাবণী ছেলে নিযে দাঁড়িয়ে পড়েছে,—আমরা কটেজে ফিরছি।

কাঠের গেট দিয়ে শ্রাবণী ঢুকে যাওয়ার পরও ধীমান কটমট করে তাকিয়ে রইল সেদিকে। হিংস্র বাগ ফণা তুলছে শরীরের কোষে কোষে। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হঠাৎই ক্ষ্যাপা মোষের মতো ছুটল সমুদ্রেব দিকে। উন্মাদের মতো লাফালাফি করছে জলে। একা-একাই। আশপাশেব মানুষজনের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, শুধু নিষ্ফল আক্রোশে ঘুষি চালাচ্ছে ঢেউয়ের গায়ে। যেন ঘুষিব জোরেই সমুদ্রকে চুরমার করে দেবে। নাকে মুখে জল ঢুকে গেল তবু লড়ে যাচ্ছে ধীমান। লড়ছে। ধীমান হাঁফিযে উঠল একসময়। এ এক অসম যুদ্ধ। ঢেউরা আসছে তো আসছেই। অসংখ্য। দুর্নিবার।

পরাজিত ধীমান ফিবছে এবাব। মাথা নিচু করে। যেতে যেতে ফিরে তাকাচ্ছে অশান্ত সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রকে এত নির্মম আগে কখনও মনে হয়নি ধীমানের।

ছয়

পূর্ণিমার চাঁদ ওঠেনি এখনও। গহিন আঁধাবে ডুবে আছে বিশ্বচরাচর। সমুদ্রের স্বর ধীরে ধীরে গর্জন হয়ে উঠছে। বাতাস চঞ্চল। সমুদ্র কাছে আসছে। জল বাড়ছে। ধীমান টর্চ ফেলে শ্রাবণীকে খুঁজছিল। আলো থেকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এসে হঠাৎ পৃথিবী লুপ্ত যেন। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না, মনে হয় সামনে শুধু এক অনন্ত মহাগহ্বর। কী বিশাল তার হাঁ!

কাঠের গেট ধরে ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধীমান। নুনেখাওয়া বাঁধানো সিঁড়ি বোল্ডার ছুঁয়ে হারিয়ে গেছে। ভাঙা ধাপিতে এই রিসর্টেরই কয়েকজন ট্যুরিস্ট অশরীরী ছায়ার মতো এখানে সেখানে বসে। চাঁদের প্রতীক্ষায়। ধীমান সেখানে শ্রাবণীকে দেখতে পেল না।

বিকেলবেলা তাতারকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল ধীমান। সারা দুপুর সে গোঁজ হয়ে ছিল। শ্রাবণীও বিশেষ কথাবার্তা বলেনি। বেড়াতেও বেবোল না বিকেলে। ছেলের টানাটানিতেও না। মাথা ধরেছে! মরুক গে, ধীমানের অত যেচে মান ভাঙানোর দায় নেই! তাতার খুশি থাকলেই যথেষ্ট। তাতারকে নিয়ে গোটা জনপদ টোটো করে চষেছে ধীমান। খাঁচার হরিণ দেখিয়ে ছেলেকে আহ্লাদে আটখানা করে দিয়েছে। ছেলের পছন্দসই আইসক্রিম জোগাড় করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ছেলেকে। এখন শুধু রাতটুকু পার হলেই...। বুক ভরে নিশ্বাস টানল ধীমান। আহ্, বন্দিদশা থেকে মুক্তি! আবার কলকাতা। আবার দোলন।

তাতার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে। বোল্ডারের পিছনে বসে আট নম্বর ঘরের

বাচ্চাটার সঙ্গে গল্প জুড়েছে। ধীমান আরেকবার টর্চের আলো ঘোরাল। ওই তো শ্রাবণী! ওই তো ডানদিকের বোল্ডারে বসে আছে! সাবধানে পাথর টপকে সেখানে পৌঁছল ধীমান,—কটেজের চাবিটা দাও তো?

শ্রাবণী চমকে ফিরেছে,—ও! তুমি!

—কটেজ বন্ধ করে এখানে এসে বসে আছ! আমি কাহাকাঁহা খুঁজে বেড়াচ্ছি!

—চাবি তো কাউন্টারে রাখা আছে। ম্যানেজার বলেনি?

ধীমান ফিরতে যাচ্ছিল, শ্রাবণী আচমকা ডেকেছে,—শোনো।

—রাতের মিল তো? বলা হয়ে গেছে। ভোরের অটোরিক্সাও ফিট করে এসেছি, কটেজে এসে ডাকবে।

—ওসব না। একটু বোসো না এখানে। শ্রাবণীর স্বর গভীর। এত গভীর যে ধীমান ফিরতে পারল না। পাশের পাথরে বসল। শ্রাবণী হাঁটুতে থুতনি ঠেকাল,—কাল তোমাকে পুরো কথাটা বলিনি। আমার আরও কিছু কথা ছিল।

ধীমান একটা গন্ধ পাচ্ছিল। কটু নোনা ঘ্রাণ। শ্রাবণী লম্বা শ্বাস ফেলল,—আমি আর তোমার সঙ্গে থাকব না।

কথাটা এতই আকস্মিক, এত অপ্রত্যাশিত—ধীমান প্রথমটা হৃদয়ঙ্গমই করতে পারল না। লঘু গলায় বলে ফেলেছে,—কেন? এত কী রাগ হল হঠাৎ ?

—রাগও নয়। হঠাৎও নয়। শ্রাবণী হাঁটু থেকে থুতনি তুলল না,—অনেক ভেবেচিন্তেই ডিসিশান নিয়েছি। তোমার সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

এবার বিস্ময়ে ছিটকে এল,—কেন?

—যদি বলি তোমাকে আমার আর ভাল লাগছে না?

ধীমানকে ফুটল কথাটা। সামান্য তপ্ত হল সে,—কারণটা জানতে পারি?

—ইচ্ছে। একজনকেই সারাজীবন ভাল লাগতে হবে তার কোনও মানে আছে?

—হেঁয়ালি কোরো না। ধীমানের গলা একটু চড়েছে,—খোলসা করে বলো।

শ্রাবণী একই রকম অচঞ্চল,—বললাম তো, ভাল লাগছে না—তোমার কাছ থেকে আমি আর কিছু পাই না। এত সাধারণ তুমি—এত একঘেয়ে!

ধীমান সপাটে চড় খেল একটা। মুখ থেকে আপনাআপনি বেরিয়ে এল,—আমি সাধারণ! আমি...

—কী তোমার আছে বলো? ঘুম থেকে উঠে হাঁইহাঁই কিছু হুকুম! লাখ লাখ ভেড়াছাগলদের মতো অফিস অফিস ট্যুর, অফিসের চিন্তা! বাড়ি ফিরে ছেলে নিয়ে আহ্লাদিপনা, নয়তো টিভিতে চোখ রেখে বসে থাকা! মাঝে মাঝে রাতবিরেতে আমার শরীরের উপর হামলানো! সেটাও এত যান্ত্রিক, এত রহস্যহীন—তুমি একটা নেহাত কেজো মানুষ। বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি আজকাল আর সহ্য করতে পারি না।

ধীমান অপমানে বিমূঢ় প্রায়। ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল,—থামো। নাটুকে কথা বোলো না। আমি কি মেয়েছেলে যে রহস্য করে বেড়াব!

—রহস্য সকলেরই থাকে গো। পুরুষেরও থাকে। শ্রাবণী বাতাসের মতো ফিসফিস করল,—তোমার নেই।

আঘাতে আঘাতে বিদীর্ণ হচ্ছিল ধীমান। পাল্টা অস্ত্র ছুঁড়ল,—সেরকম রহস্যময় পুরুষের সন্ধান পেয়েছ বুঝি?

শ্রাবণী সহসা বোবা। সমুদ্রের ওপারে, আকাশের ঢালে খুব আস্তে আস্তে একটা আলোর সঞ্চার হচ্ছে। অলস পায়ে সমুদ্র থেকে উঠে আসছে পূর্ণ চাঁদ। হঠাৎই লাফিয়ে উঠে পুরো মেলে দিল নিজেকে।

প্রতিটি নিঃশব্দ পল অনুপল লক্ষ অর্বুদ বছরের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছিল ধীমানের। কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল,—উত্তর দিচ্ছ না যে? তারই ব্যাকিং-এ চাকরি জুটেছে, তাই তো?

গোপন বিষাদ যেন শীতল আলো হয়ে ছড়িয়ে গেছে সমুদ্রে। অন্ধকার এক নীলচে মোহ এখন। শ্রাবণীর স্বরেও আলোছায়া,—কী হবে জেনে?

—আমার জানার রাইট আছে। তুমি আমাব স্ত্রী।

—ধরো জানলে, কী করবে তুমি?

নীল জ্যোৎস্নায় একরাশ কাঁকড়া চরতে বেরিয়েছে বালিতে, ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে ভেসে আছড়ে পড়ছে বোল্ডারে. ঢেউ সরলেই আবার কিলবিল কিলবিল গর্তের খোঁজে।

ধীমান গর্জে উঠল,—আই উইল সি দ্যাট বাগার! দেখে নেব! এত সহজে ছাড়ব না—তোমারও স্ক্রু টাইট দিচ্ছি আমি। তাতারকে দিয়ে।

—তাতার! তাতার তো আমার সঙ্গে চলে যাবে!

এমন অবলীলায় কথাটা বলল শ্রাবণী, ধীমানের স্নায়ু ঝাঁকি খেয়ে গেল,— তাতার আমার—মাই সান, আমাকে ছেড়ে তাতার থাকতেই পারে না।

এতক্ষণ পর শ্রাবণী মুখ তুলল,—ছেলেকে তুমি কিছুই চেনোনি। তুমি হচ্ছো ওর আব্দার। বায়নাক্কা। আমি হচ্ছি ওর প্রয়োজন। তুমি কি বোঝ না, তুমি শুধুই ওর রিলিফ? যেমন তোমার দোলন?

সমুদ্র নিমেষে স্থির। বাতাস নিস্পন্দ।

ধীমান অসাড়,— কে দোলন?

শ্রাবণী মুঠোয় ধরা তিন-চারটে কাগজ এগিয়ে দিল ধীমানের দিকে। সমুদ্রগর্জন চতুর্গুণ হয়ে ফেটে পড়ছে। ধীমান হাত বাড়াল না, পাংশু মুখে জিজ্ঞাসা করল, —কী ওগুলো?

—তোমারই জিনিস। এই রিসর্টের বিল। অক্টোবরের আছে, ডিসেম্বরের আছে, মার্চের আছে... লাস্ট এপ্রিলেরও।

চাঁদ স্পটলাইট হয়ে আলো ফেলেছে ধীমানের মুখে। ধীমান চাঁদটাকে সহ্য করতে পারছিল না। মুখ নামিয়ে নিল,—কোথায় পেলে?

শ্রাবণীর চোখে চাঁদের কিরণ,—তুমি বড় অসাবধান। প্যান্টের পকেটে রেখে প্যান্ট কাচতে দাও, শার্টের বুকপকেটে অবহেলায় ফেলে রাখো, ব্রিফকেসে রেখে সেখান থেকে টাকা বার করতে বলো আমাকে। ভুল তো তোমার একবার নয়—বার বার!

পূর্ণিমার ঢেউ বোল্ডারে মাথা কুটছে। উৎক্ষিপ্ত জলকণায় ভরে গেল ধীমানের মুখ।

শ্রাবণী উঠে দাঁড়াল,—কাকে তুমি ঠকাতে চাও ধীমান? আমাকে? দোলনকে? না নিজেকেই?

দু'ধারে দুই খাটের মাঝে হাতকয়েকের ব্যবধান। ও পাশের খাটে শ্রাবণীর গায়ে হাত রেখেছে মধ্যরাতের জ্যোৎস্না। দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে আছে শ্রাবণী। তাতারকে বুকে জড়িয়ে। শুয়েই আছে শুধু, ঘুমোয়নি। চোরের মতো শ্রাবণীর দিকে এগিয়ে গেল একটা হাত। হাতটা শ্রাবণীকে ছুঁতে চাইছে—পারল না। দু'খাটের মধ্যিখানে দূরত্ব বেড়ে গেছে কয়েকশ' যোজন। এত বেড়েছে যেন ওই খাটে আর কখনও পৌঁছতে পারবে না ধীমান।

আজ যদি কোনও চৌকিদার থাকত! বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে যেত ঘরটাকে। হায় রে!

ধীমান নিঃশব্দে বাইরে এসে সিগারেট ধরাল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ বড় প্রকট এখন। অশালীন জ্যোৎস্না ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে অন্ধকারের সমস্ত মুখোশ। সমুদ্র আকাশ মাঠ ঝাউবন কারও আজ রেহাই নেই চাঁদের হাত থেকে। ধীমানেরও না।

ভিখিরির মতো ধীমান তেরো নম্বর কটেজটার দিকে তাকাল।

শুনশান মাঠে খেলে বেড়াচ্ছে নীল চাঁদ।

কুটিরটা নেই।

কোথায় যে এখন মুখ লুকোয় ধীমান।

•

উপসংহার

আলো ফুটছিল। সমুদ্র দূরে এখন। তরঙ্গহীন। দূর দিয়ে একদম একা একটা লোক হাঁটুজল ভেঙে হেঁটে চলেছে। তীরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। আবার এ-প্রান্তে। অবিরাম। লোকটার কাঁধে একটা ভারী কালো জাল। অস্ফুট আলোয় প্রায়নগ্ন মানুষটা এক চলন্ত সিল্যুট।

নিঃস্ব চোখে চলমান লোকটাকে দেখছিল ধীমান। মরা কোটালে মাছ আসে না, তবু কী নির্বোধের মতো হাঁটে লোকটা!

এ কী নির্বুদ্ধিতা? নাকি নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা?

ধীমান জানে না। তার সামনে এখন শুধুই বিবর্ণ সমুদ্র।

এই মায়া

এলোমেলো ঘরটাকে গুছিয়ে নিচ্ছিল অপর্ণা। এত কিছু পড়ে আছে চারদিকে। ঝুমঝুমি থেকে খসে পড়া ঘন্টি, ফিডিং বটলের চ্যাপ্টা ক্যাপ, বেবি পাউডারের খালি একখানা কৌটো, বোতল পরিষ্কার করার ঝিরিঝিরি ব্রাশ, আরও কত কি যে! শেষ মুহূর্তে দোনামোনা করে কিছু জিনিস রেখেও গেছে মিমি। গোটাকয়েক তোয়ালে ন্যাপি, ফোম লাগানো মোটা প্লাস্টিক বেশ কিছু কাঁথা। পরে আবার এলে কাজে লাগবে।

খাটের বাক্স থেকে কাঁথাগুলো তুলে ভাঁজ করল অপর্ণা, আলমারি খুলে তুলে রাখল তাকে। মেঝেতে পড়ে থাকা তুচ্ছ জিনিসগুলো কুড়োল একটা একটা করে, ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলতে গিয়েও কি ভেবে রেখে দিল ওয়ার্ড্রোবের মাথায়। আড়চোখে একবার দেখে নিল আর্যকে।

চোখে হাত চাপা দিয়ে আর্য ইজিচেয়ারে আধশোওয়া। কী যেন চিন্তা করছে।

অপর্ণা গলাটাকে খানিক তরল করে বলল,—হল কি তোমার? একেবারে ধন্দ মেরে গেলে যে!

আর্য চোখ থেকে হাত সরাল না। শরীরটা সামান্য নড়ল শুধু।

—কী ভাবছ তখন থেকে?

—কিছু না।

—মন খারাপ?

—মন খারাপ হবে কেন! এমনিই...

অপর্ণা মুচকি হাসল। আর্য চিরকাল বড় চাপা, সহজে কারুর কাছে হৃদয় খোলে না। নার্সিংহোম থেকে সদ্যোজাত নাতনি নিয়ে সোজা বাপের বাড়ি এসেছিল মেয়ে, ছিল প্রায় চার মাস। একটুক্ষণ আগে ফিরে গেছে শ্বশুরবাড়ি। এ সময়ে মন খারাপ হতেই পারে, তবু সেটা মুখ ফুটে স্বীকার করবে না আর্য। আঠাশ বছরের পুরনো স্ত্রীর কাছেও না।

অপর্ণা অল্প খোঁচাল,—যা ধরে রাখা যায় না, তার জন্যে কষ্ট পেয়ে কী লাভ?

এতক্ষণে চোখ খুলেছে আর্য। ইজিচেয়ারের হাতল থেকে চশমা খুলে পরে নিল। বসেছে টান-টান,—কষ্ট পাব কেন? আমি শুধু ওদের আক্কেলটার কথা ভাবছিলাম!

—কী রকম?

—পৌঁছে এখনও একটা ফোন করল না।

—করবে। এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে? এত দিন পর গেল—হয়তো কত লোক এসেছে, কত হৈচৈ...

—বাহ, চিন্তা হয় না! ওইটুকু একটা বাচ্চা নিয়ে এতটা পথ গেল... চারদিকে ভিড়... জ্যাম...

—যাদবপুর থেকে সল্টলেক এমন কিছু দূর নয়। অপর্ণা খাটে বসল। হাসিটাকে ধরে রেখেছে মুখে জোর করেই। বলল,—ভিড়-জ্যাম কিছুই পড়বে না। বাইপাস দিয়ে হু-হু করে ট্যাক্সি চলে যাবে।

—সেই কথাই তো ভাবছি। আর্যর চোখ সিলিং-এ ঘুরল,—এখান থেকে সওয়া পাঁচটায় বেরোল, এখন বাজে সাতটা। পইপই করে বলে দিলাম পৌঁছেই একটা টেলিফোন করিস...। মিমিটার নয় সেন্স নেই, শ্যামলও তো একটা ফোন করতে পারত! দিস ইজ ব্যাড—অফুলি ব্যাড!

—করবে গো করবে, অত ছটফট করছ কেন? তোমার আবার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি!

—মেয়ে জামাই নাতনির জন্য দুশ্চিন্তা করা বাড়াবাড়ি! এ কথা বলতে পারলে।

অপর্ণার হাসি নিবে গেল। চার মাস ধবে ভরভরন্ত বাড়িটার শূন্য দশা পলকে যেন আরও ভারী হয়ে গেল। কার্তিকের শেষ এখন. বাতাসে আলগা হিমের ছোঁয়া। অপর্ণার বুকেও একটা হিম-হিম ভাব চারিয়ে যাচ্ছিল। একটা শিশু, একটা নবীন প্রাণ —কতটা যে উত্তাপ এনে দিয়েছিল ঘরে!

অপর্ণা বিড়বিড় করে উঠল,—ওরা আমাদের ধার কবা সুখ-দুঃখ। সুদে-আসলে ফেরত দিয়ে দিয়েছি। দুশ্চিন্তা করে কী হবে?

—মিমিও আমাদের নয় বলছ?

—নয়ই তো। মেয়ে কবে আপন হয়! কথাটা বলেই অপর্ণা সংশোধন করে নিল নিজেকে,—ছেলে থাকলেও অবশ্য এমন কিছু আপন হত না। তার সংসারও পরের সংসারই হত। ছেলেই বলো, মেয়েই বলো—বড় হয়ে গেলে সব্বাই পব।

আর্য মলিন হাসল,—তুমি বড় নিষ্ঠুর অপর্ণা। তোমার মেয়েও তাই এত নিষ্ঠুর হয়েছে। বাবার মন বোঝে না।

—বুঝেই বা কী করত? বিয়ে-থা না করে সারা জীবন বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত? তাতে কি তুমি খুব পুলকিত হতে? মেয়ের বিয়ের জন্য তুমিই তো বেশি হাঁচোড়-পাচোড় করেছিলে!

—মেয়ের বিয়ে না হোক, সে কথা তো বলিনি। তবু...

তবুটা যে কী অপর্ণাও বুঝতে পারছিল। স্বামীর মুখ দেখে ভারী মায়াও হচ্ছিল তার। তবু এই মুহূর্তে একটু ঠাট্টা ছোঁড়ার লোভও সামলাতে পারল না। মাথা নেড়ে বলল,— আজ খুব বাবা, নিষ্ঠুর,—এসব কথা মনে পড়ছে. নিজে কী করেছিলে ভুলে গেছ?

আর্য ভুরু কুঁচকোল,—কী কবেছিলাম?

—আমাকেও তো তুমি বাবা-মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছিলে স্যার!

আর্য ঘুরে তাকাল।

—মিমি যখন হল, আমি যখন হাসপাতাল থেকে সোজা বাপেরবাড়ি গেলাম, কদিন তুমি আমাকে থাকতে দিয়েছিলে সেখানে? এক মাস যেতে না যেতেই কানের কাছে প্যানপ্যান—বাড়ি চলো, বাড়ি চলো—মনে আছে? মিমি তো তাও চার মাস রইল, আমাকে দু মাস থেকেই চলে আসতে হয়েছিল। মেয়ে নিয়ে যখন শ্বশুরবাড়ি ফিরলাম, তখন আমাদের নিরাপদে পৌঁছনোর সংবাদ কদ্দিন পরে বাবাকে দিয়েছিলে

মশাই? খবর না পেয়ে বাবাই তিন দিন পরে ছুটে এসেছিল, মনে পড়ে? তখন তো খুব বলেছিলে—ওটা আমার বাবার বাড়াবাড়ি।

আর্য অসহায় মুখে হেসে ফেলল,—সত্যি, মেমারি বটে। দাও, সিগারেটের প্যাকেটটা এনে দাও।

সিগারেট দেশলাই এখন এ ঘরে আর থাকে না। থাকে ড্রয়িংরুমে, টিভির মাথায়। চার মাস ধরে ফ্ল্যাটে অদৃশ্য নো স্মোকিং বোর্ড ঝুলছে। পাছে নিজেই আর্য অন্যমনস্ক ভাবে স্বেচ্ছা-আরোপিত নিষেধটা ভুলে যায়, তাই এই স্থান বদল।

অপর্ণা সিগারেট আনতে উঠল না, বলল, না, এখন সিগারেট খেতে হবে না। কদিন ধরেই খকখক কাশছ।

—সিজন চেঞ্জের সময়, এখন তো একটু সর্দিকাশি হবেই। তাবলে সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে হবে নাকি?

—বন্ধ না করো, অন্তত কমাও। মেঘে মেঘে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল, সে খেয়াল আছে?

—সবই খেয়াল আছে ভাই। কথায় কথায় আর্য অনেকটা সমে ফিরেছে। হাসিমুখে বলল, বাড়িতে এখন দিনেরাতে কটা সিগারেট খাই?

—সে কি স্বাস্থ্যের কথা ভেবে, না আমার কথা শুনে। অপর্ণাও হাসছে ফিকফিক, —ফুটফুট্টি খুব জব্দ করেছিল দাদুকে। নেশা চাপলেই দাদু প্যাকেট দেশলাই নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ছুটছে ব্যালকনিতে। নয়তো বাথরুমে ঢুকে ফুকফুক।

—সে তো তোমার নেশাও ছুটে গেছিল!

—আমার আবার কী নেশা? অপর্ণা চোখ ছোট করল।

—টিভি। বোকা বাক্স। সকাল-সন্ধে সিরিয়াল গেলা নেই, সিনেমা দেখা নেই, অন্তাকশরি নেই... নাতনি একেবারে কান ধরে বসিয়ে রেখেছিল সামনে।

—আর তুমি? তুমি কী করতে? এমনি তো রাত এগারোটার মধ্যে বাবুর বিছানা চাই, নাতনি পেয়ে ঘুম-ফুম সব ভ্যানিশ। মাঝরাত অব্দি রায়চৌধুরী-সাহেব নাতনির হাত-পা ছোড়া দেখছেন। নাতনি আউ-ওউ শব্দ করছে মুখে, তাই বেহাগ মালকোষ ভেবে শুনে চলেছেন মুগ্ধ হয়ে।

—সেকি আমি একা শুনতাম? আর্যর হাসিতে একটা ছায়া পড়ল,—মেয়েটার চিৎকার এখনও কানে বাজছে। কী অদ্ভুত একটা উল্লাসধ্বনি বার করত মুখ দিয়ে, তাই না?

—আর ওই ভুবন-ভোলানো হাসি! দিব্যি কেমন চোখে চোখ রেখে খিলখিল হাসত!

—শুধু জেগে কেন, ঘুমিয়ে হাসত না? মাঝেমাঝেই ছোট্ট ছোট্ট ঠোঁট ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে...

—কেমন তিন মাসের মাথায় উপুড় হতে শিখে গেল বলো? মিমিও অত তাড়াতাড়ি উল্টোয়নি!

—দেখে নিও, ও মেয়ে হামাও টানবে তাড়াতাড়ি। বড়জোর আর দু মাস।

ঝনঝন ফোন বাজছে ড্রয়িংরুমে। কেঁপে গেল স্বামী-স্ত্রী। ছিঁড়ে গেল কথার মায়াজাল।

হনহনিয়ে ড্রয়িংরুমে চলে এল আর্য। উচ্ছ্বসিত মুখে রিসিভার তুলেই মিইয়ে গেছে। নিতান্তই -কেজো ফোন একটা, অফিস কলিগের।

দরকারি কথা শেষ করে সোফায় বসে সিগারেট ধরাল আর্য. সেন্টার টেবিলে পা তুলে দিল। অনেকদিন পব মুক্ত ভাবে সিগারেট খেতে পারছে ফ্ল্যাটে, তবু যেন ঠিক তৃপ্তি হচ্ছে না। কেমন বিস্বাদ লাগছে ধোঁয়াটা। একটা ছোট্ট শিশু থাকা আর না থাকাতে এত তফাত!

এতক্ষণ টেলিফোনের সামনে স্থির দাঁড়িয়েছিল অপর্ণা. এবার রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। দরজায় দাঁড়াল। উদাস গলায় বলল.—চা খাবে?

—করো।

—সঙ্গে টোস্ট-ফোস্ট দেব?

—না, তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব। বলেই একটু গলা ওঠাল আর্য.—তুমি ঠিকই বলেছ। ওসব মায়াটায়া কোনও কাজের কথা নয়। অল ভেগ থিংস! হাতে অনেক কাজ জমেছে. এবাব শেষ করে ফেলতে হবে। কালই রাজমিস্ত্রির সঙ্গে কথা বলছি. তাড়াতাড়ি চুনকাম করে দিয়ে যাক। আর তুমি ফার্নিচারগুলো পালিশ করার কথা বলছিলে, সেগুলো এই শীতেই...

অপর্ণা স্বামীকে দেখছিল। নিচু গলায় বলল,—আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম।

—কী?

—চলো না, দুজনে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি। অন্তত দিন সাতেকের জন্য।

—চলো। কোথায় যাবে? দীঘা পুরী গোপালপুর? বলেই উঠে টিভিটা চালিয়ে দিল আর্য, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা খেলার চ্যানেল বার করল। বাইশটা সাহেব লাথি মারছে ফুটবলে. একদৃষ্টে দেখছে আর্য—শূন্য চোখে।

রান্নাঘরে গ্যাসে জল চড়িয়েছে অপর্ণা। দুটো কাপে মেপে মেপে দুধ দিল, চিনি দিল। শূন্য চোখে।

সাড়ে নটার মধ্যে আজ রাত্রেব খাওয়া শেষ। তখনও পর্যন্ত ফোনটা এল না। গুনে গুনে দুটো রুটি খুঁটছে আর্য, অপর্ণাও তথৈবচ। চার মাস ধরে ঘরের প্রতিটি বায়ুকণায় ছড়িয়ে ছিল শিশুটা, বড় বেশি ঘ্রাণ রয়ে গেছে তার—তীব্র, মায়াময়।

রান্নাঘরের বাসনকোসন গুছিয়ে ড্রয়িংরুমে এসে অবাক হল অপর্ণা। আর্য নেই! এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল নাকি মানুষটা? শোওয়ার ঘরের দরজায় এসে বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। আলমারি থেকে পুরনো অ্যালবাম বার করেছে আর্য। উল্টোচ্ছে পাতা। ধীরে, অতি ধীরে।

—কী দেখছ?

—মিমির ছবি।

—হঠাৎ মিমির ছবি দেখতে বসলে!

—দেখছি। আর্য ছোট্ট শ্বাস ফেলল,—দেখছি সময় কি তাড়াতাড়ি চলে যায়! এই তো সেদিন জন্মাল... দ্যাখো দ্যাখো, কেমন গামলায় চান করছে!

উত্তরেব জানলা দুটো বন্ধ করে সামনে এসে দাঁড়াল অপর্ণা। দেখল ছবিটাকে। তিন মাসেব মিমিকে স্নান করাচ্ছে মাসি। ড্যাব ড্যাব কবে তাকিযে আছে মিমি। খালি গা, গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারা, মাথায পাতলা পাতলা কযেকগাছি চুল।

আর্য পাতা উল্টোল,—এই ছবিটা দ্যাখো, অন্নপ্রাশনেব।

—হুঁ। অপর্ণা আনমনে বলে ফেলল,—বড়দা খাওয়াচ্ছে। তখন খুব ঘুম পেয়েছিল মিমিব। খুব কাঁদছিল সেদিন।

—চোখ দেখেছ মেয়ের? তখনই কেমন টেরিযে তাকাত।

—ফুটফুট্টির চোখ আরও ঘোবে। মিমিকে এক হাটে কিনে এক হাটে বেচে আসবে।

উঁহু, আব নাতনিব কথা নয়। আর্য আলগা ধমক দিল,—ছবি দেখছ ছবি দ্যাখো—যা আমাদেব নয়, তাই নিয়ে আর নো মোর মায়া!

অপর্ণা হাসি চাপল। যাকে এখন দেখছে আর্য, সেই বা কার! দু বছবের মিমি! পাঁচ বছরেব মিমি! বাবা-মাব সঙ্গে কাশ্মীবে বেড়াতে গিয়ে দশ বছরের মিমি! সালোযাব-কামিজ-পরা মিমি! জিনস-টিশার্ট-পরা মিমি। পেযাজরঙা বেনারসি পরা মিমি, মাথায় রেশমি ওড়না, কপালে চন্দন, সিঁথি ভরা জ্বলজ্বলে সিঁদুর! শ্যামলের সঙ্গে কুলু মানালিতে হানিমুনে যাওয়া মিমি! এত মিমির মিছিলে কোন মিমিটাই বা আর্যর!

কথা বলতে গিযে অপর্ণাব গলা দুলে গেল,—মিমি প্রথম শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর বাড়িটা এরকমই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, তাই না গো?

—হুঁ। আর্যও উদাস আচমকা,—সব সময়ে মনে হত বাড়িটা যেন গিলে খেতে আসছে!

—তুমি বাপু বড্ড বেশি মেয়ে-মেয়ে করতে। তার জন্য কষ্টও পেয়েছ বেশি।

—কষ্ট তো সহ্যও হযে গেল। চার মাস পর খাটে বসে সিগারেট ধরিয়েছে আর্য। আঙুল যেন তার কাঁপছে অল্প অল্প।

অপর্ণা একদম নিচু গলায় বলল,—সময় সব কিছুই সহ্য করতে শিখিয়ে দেয় গো।

আর্য হাসার চেষ্টা করল,—নাতনির বিরহও ভুলে যাব বলছ!

—এই দ্যাখো, তুমিই কিন্তু আবার নাতনির কথা তুললে!

—সরি। এসো, পুরনো ছবিগুলোই দেখি।

অপর্ণার আব ছবির দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছিল না। কেমন যেন মনে হচ্ছে ছবিতে মোটেই মেয়েকে দেখছে না আর্য, মেয়ের মধ্যে দিয়ে নাতনিকেই ছুঁতে চাইছে তার স্বামী। অথবা মেয়ে নাতনি কাউকেই নয়, প্রিয়জনদের মাঝে নিজেকেই খোঁজে মানুষ। নাতনিকে দেখতে দেখতে কি মেয়েকে খুঁজত আর্য? তবে কি মিমিই

আবার সেই ছোট্টটি হয়ে ফিরে এসেছিল? অপর্ণার মনেও মাঝে মাঝে এরকম এক ধন্দ জাগত বটে, পাশেই হাস্যমুখী গিন্নিবান্নি মেয়েকে সশরীরে দেখে ভেঙেও যেত বিভ্রম।

আর্যর ভ্রান্তিটাও বুঝি কাটাতে চাইল অপর্ণা। অথবা পরখ করতে চাইল আর্যকে। বেশ জোরেই বলে উঠল—মিমির মেয়েও দেখতে দেখতে এরকম বড় হয়ে যাবে!

ঝপ করে অ্যালবাম বন্ধ করল আর্য। শব্দ করে আলমারি খুলে রেখে দিল সব কটা অ্যালবাম। পাঞ্জাবি খুলে খাটের বাজুতে রাখল। বিছানায় সটান শুয়ে বলল. —তা হলে কাল অফিসে গিয়ে টিকিটটা করতে দিয়ে দিই?

—কিসের টিকিট?

—বারে, কথা হল না আমরা বেড়াতে যাব! পুরী-ফুরি নয়. আরও দূরে কোথাও যাব—ধরো কন্যাকুমারিকা!

—সে তো লম্বা ট্যুর হয়ে যাবে।

—হবে। অফিসে আমার অনেক ছুটি পাওনা আছে। কতদিন আমরা দুজন এক সঙ্গে ঘুরিনি বলো তো? লাস্ট বোধহয় সেই হানিমুন...

—আবেক বারও গিয়েছিলাম, স্যার। আমাদের বিয়েব এক যুগ সেলিব্রেট করতে —দীঘা। মিমি তখন সামারে মামার বাড়ি গিয়েছিল।

আর্য হাসল,—তখন তো পিছুটান ছিল। এবার একেবারে খোলা হাত-পায়ে যাব। প্রায় সেই হানিমুনের মতো। যেখানে সেখানে ঘুরব. যেখানে খুশি থাকব...। আফটাব অল আমাদের দুজনের জন্য তো শুধু আমরাই আছি, নয় কি?

উচ্ছ্বাসের আড়ালে আর্য নিজেকে গোপন করতে চাইছে। অপর্ণা বুঝতে পারছিল। সাদাসিধে সরল মানুষটাকে এই জন্যই যেন ভাল লাগে বেশি। যত নিজেকে লুকোতে চায়. ততই যেন ধরা পড়ে যায়।

আর্যর কষ্টের স্থানটায় হাত বোলাতে চাইল অপর্ণা। বলল,—সে হবে'খন। এখন কাজের কাজটা আগে সেরে ফ্যালো তো দেখি!

—কী কাজ?

—এখনো দশটা বাজেনি, সন্ট লেকে একটা ফোন কবো।

—কেন করব? আর্য ফুঁসে উঠল,—ফোন করাটা ওদের ডিউটি।

—ডিউটি সবই বাবা-মার, এটা বোঝ না?

—না, বুঝি না। বুঝতে চাইও না। বিছানা হাতড়ে আবার একটা সিগারেট ধরাল আর্য। জোরে জোরে টানছে। কাশছে ঘঙঘঙ।

হাত থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল অপর্ণা। চোখ পাকিয়ে বলল,—বোঝ না বলেই তো এত ছটফট করছ! ঠিক আছে, আমিই ফোন করছি।

—নো। নেভার। তুমিও করবে না। আই ওয়ার্ন ইউ। ওদের কথা আর একটাও নয়।

আর্যর চিৎকারটাকে হাহাকার বলে মনে হল অপর্ণার। চোখের পাতা ভিজে এল। মেয়ে বোঝে না, জামাই বোঝে না, কেউ কিচ্ছুটি বোঝে না।

অপর্ণা মনে মনে মৃদু অভিশাপ দিল মেয়েকে,—তোদের মেয়ে বড় হোক মিমি, তোরাও টের পাবি!

ফোন শেষ পর্যন্ত এল না। শুয়ে পড়েছে স্বামী-স্ত্রী।

রাত্রে শোওয়ার সময়ে এক জগ জল চাই অপর্ণার। সঙ্গে দুটো গ্লাস। দুটো গ্লাসই জলে ভর্তি থাকবে. রাত্রে ঘুম ভাঙলে দুটো গ্লাস থেকেই এক চুমুক করে জল খাবে, আবার ঢাকা দিয়ে রাখবে জল, এটাই অপর্ণার অভ্যাস। শুধু জল খাওয়ার জন্যই বার বার তার ঘুম ভেঙে যায় রাত্রে। গত চার মাসে তো ঘুম গাঢ়ই হতে পারেনি. কতবার করে যে উঠেছে নাতনি। দুধ খায়. হিসি করে. পটি পরে. কখনও বা জেগে উঠে শুধু অপার্থিব খেলা করে যায়. হেসে ওঠে খলখল।

আজ সম্পূর্ণ অন্য কারণে অপর্ণার ঘুম ভেঙে গেল। শীত করছে বেশ। মিমির খুব গরমের ধাত. নাতনিরও শীতবোধ নেই, পাখা তাই ফুল স্পিডে চলেছে এতদিন। কালও। একটু একটু ঠান্ডা লাগত বটে, কই এত শীত তো অপর্ণার করেনি কোনওদিন!

অপর্ণা শুয়ে শুয়েই মশারির চালে রাখা বেডসুইচ টিপল। আলো জ্বলতেই চমকেছে সামান্য। পাশে আর্য. চার মাস পর, ঈষৎ কুঁকড়ে শুয়ে আছে।

বিছানা থেকে নেমে পাখা দু পয়েন্ট কমিয়ে দিল অপর্ণা। দুটো পাতলা চাদরও নিয়ে নিল বিছানায়। মুখে জল পুরে আবার শুতেই আরও চমকেছে অপর্ণা। জেগে আছে আর্য!

অপর্ণা কোঁত করে গিলে নিল জলটা,—কী হল, ঘুমোওনি?

—ঘুম আসার উপায় আছে? তোমার আক্কেলটা দেখছিলাম!

—আমি আবার কী করলাম?

—এত জোরে ফ্যান চালিয়ে শুতে রোজ? বাচ্চাটার যে নিউমোনিয়া হয়ে যায়নি, এটাই আশ্চর্য!

অপর্ণা আলো নিবিয়ে দিল,—ভুলে যেও না, ওটা মিমির মেয়ে। তোমার মেয়ের কোনওদিন ঠান্ডা লাগতে দেখেছ?

—ফুটফুট্টি যদি মায়ের ধাত না পায়! শ্যামল তো বারো মাসই নাক টানে আর ফ্যাচোর ফ্যাচোর হাঁচে।

—ও মেয়ে মিমিরই কার্বনকপি হবে, বলে রাখছি। থুতনিটা দ্যাখোনি? ছুঁচোল। মিমির মতো। নাকটা তো পুরো মিমি।

—তাই কি? আমার তো অন্যরকম লাগে। চিবুক কপাল চোখ সবই তো শ্যামলের।

—দূর, তোমার চোখ নেই! ওর হাঁ-মুখ একেবারে বসানো মিমি।

—মনে হয় না। মাথারও কত চুল। কোঁকড়া কোঁকড়া। শ্যামলের মতো।

—চুলটুকুই যা শ্যামলের পাবে। হাত-পায়ের আঙুলগুলো লক্ষ করোনি? লম্বা লম্বা। সরু সরু। মিমি হওয়ার পর সকলে বলত, আঙুল না কলাবতীর কুঁড়ি! ফুটফুট্টি হওয়ার পরেও সবাই এক কথা বলেছে!

না চাইতেও এক অনুপস্থিত শিশুর কুহকে জড়িয়ে যাচ্ছে স্বামী-স্ত্রী। অর্থহীন

কূজনে বাঙ্ময় হয়ে উঠছে অন্ধকার। কালো ঘর ভরে উঠছে নীলাভ দ্যুতিতে। স্বামী স্ত্রী ফিবতে চাইছে, থামতে চাইছে, নিজেদেরকে মুড়তে চাইছে ঘুমের আবরণে। সল্ট লেকে এক শিশু শুয়ে শুয়ে হেসে চলে খলখল, কোমল দুটি পায়ের অস্থির নড়াচড়া তার ঝনঝন শব্দ তোলে যাদবপুরের ফ্ল্যাটে।

মায়া, বড় মায়া। এ মায়া কাটে না কিছুতেই। প্রাণপণে চাইলেও না।

———